আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

আবু সয়ীদ আইয়ুব

ভারবি
২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬০, এপ্রিল ১৯৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল ১৯৫৬

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস, দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ ॥ প্রচ্ছদ মুদ্রক : নিউ প্রাইমা প্রেস, কলকাতা ১৩

সূচিপত্র

পূর্বভাষ ৫

অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা ১৩

অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ

১. উপক্রমণিকা ৪৩

২. প্রাক্-মানসী রচনা ৫১

৩. মানসী ও সোনার তরী ৫৫

৪. চিত্রা ও কল্পনা ৬৫

৫. ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য ৭৪

৬. গীতাঞ্জলি পর্ব ৮৩

সংযোজনা : গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা ৮৮

৭. বলাকা ১১২

৮. শেষ পর্বের কবিতা ১ ১২৮

৯. শেষ পর্বের কবিতা ২ ১৫৬

শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি ১৮৩

কবিতার ভাষা ২০৭

অন্তিম পর্বের দুটি কবিতা ২৩৫

পূর্বভাষ

বইখানা প'ড়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যরসিক হয়তো ভাববেন— এত তত্ত্বকথা কেন? নিছক নন্দনতাত্ত্বিক তত্ত্বের দিক থেকে অপূর্ণতা লক্ষ্য ক'রে অসন্তুষ্ট হতেই পারেন। তাঁদের দোষ দেব না। দুই বিদ্যাক্ষেত্রের মাঝখানকার আল ধ'রে যে-কৃষ্টিজীবী হাঁটতে চায় তাকে উভয় ক্ষেত্রাধিকারীর বিরাগভাজন হতে হবে বই-কি। উপায় নেই। একেবারে যে নেই তা নয়। মন স্থির ক'রে এক দিকে নেমে প'ড়ে একটিমাত্র ক্ষেতের চাষ করলেই তো সেদিক রক্ষা পেত, অন্য দিককার কোনো দায়-দায়িত্ব থাকতো না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে দ্বিচারী তার মুশকিল-আসান অত সহজে হয় না। এ-ব্যাপারে দ্বৈতা-দ্বৈতচারীও বলতে পারি নিজেকে, কারণ আমার চোখে দর্শন আর কাব্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা সর্বত্র খুব স্পষ্ট নয়। দার্শনিক যদিও যুক্তির দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না, তবু তাঁর চিন্তাধারা মাঝে মাঝে এমন চড়ায় ঠেকে যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় সমগ্র জীবন ও জগৎ বিষয়ে মৌল উপলব্ধির উপর। এবং এ-কথাও দার্শনিক মাত্রের জানা আছে যে, চরমমূল্য-নিরীক্ষায় শেষ কথা বলতে পারে বুদ্ধি নয়, বোধি। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে ভিত্তি ক'রে কোনো দর্শনই খাড়া করা যায় না; যতটুকু যায় সেটা বিজ্ঞান বিনা বাক্যব্যয়ে কুক্ষিগত ক'রে ফেলে। পক্ষান্তরে, কাব্যরচনা নিছক শব্দের আলিম্পন— এ-কথা আজ সাহিত্যের অভিজাত মহল থেকে শোনা গেলেও আমার কাছে অশ্রদ্ধেয় ঠেকে। কবিকে সংস্কৃত অর্থেও কবি হতে হয়, অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা। সেই কথাটা ভেবে বোধ করি কোল্‌রিজ বলেছিলেন— 'No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher.'

সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের কিংবা সমগ্র রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন এ-ক্ষুদ্রকায় মিতাভিলাষ গ্রন্থে খুঁজতে গেলে পাঠক অবশ্যই হতাশ হবেন, আমার প্রতিও কিঞ্চিৎ অবিচার করবেন। আমার আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। আধুনিক সাহিত্যের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবল দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলেছি এখানে— স্বভাবতই এই কারণে যে, আমার মনে হয়েছে

এ-দুটি আজকের দিনে (বা আজকের দিনেও) প্রণিধানযোগ্য। এক— কাব্যদেহের প্রতি একাগ্র মনোনিবেশ, যার পরিণাম কাব্যরচনায় ও সমালোচনায় দেহাত্মবাদ, ভাষাকে আধার বা প্রতীক জ্ঞান না ক'রে আপনারই দুর্ভেদ্য মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা জ্ঞান করা। সার্ত্র-এর উক্তি হয়তো অতিরঞ্জিত, তবু আধুনিক কাব্যপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে: কবিতার ভাষা স্বচ্ছ কাচের মতো মোটেই নয়, নিজেরই অনবদ্য ধ্বনিরূপ ফুটিয়ে তোলা তার কাজ।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য— আমাকে অধিকতর পীড়িত করে। একজন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, এ-যুগের (বোঁদলেয়র-পরবর্তী যুগের) সাহিত্যের চারিত্র্য হচ্ছে 'an overwhelming consciousness of evil'; অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যিকরা চারিদিককার দুঃখ ও পাপ সম্বন্ধে শুধু সচেতন নন, এই অমঙ্গলবোধ তাঁদের চেতনাকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোর্‌ডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা।

এতৎসত্ত্বেও আধুনিক কালে সৎসাহিত্য রচিত হয়েছে, মহৎ সাহিত্যেরও একান্ত অভাব ঘটে নি। প্রথমত, আধুনিক সাহিত্যমাত্রই ঘৃণার, প্রত্যাখ্যানের বা তিরিক্ষি মেজাজের সাহিত্য নয়; দ্বিতীয়ত, প্রত্যাখ্যান-বাদীদের মধ্যেও অনেকে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে। রিল্‌কের ডুইনো এলেজিস, এলিয়টের ফোর কোয়ার্টেট্‌স্‌, মান্‌-এর ম্যাজিক মাউণ্টেন, কামুর আউটসাইডার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি, বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণী সর্বদেশকালের সৎসাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। হালের বাঙালী কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী যদিও আমার প্রিয়তম কবি, তবু বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধ আমাকে বাধা দেয় নি তাঁদের কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক হতে; তেমনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সম্প্রতিকার বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাহিত্যিক মতভেদ সত্ত্বেও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি তাঁদের সৃজনী প্রোৎকর্ষ, তাঁদের সাহিত্য-

কর্মের স্থায়ী ঐতিহাসিক মূল্য ; যেমন স্বীকার করি আরো একটু উঁচু স্তরে বোদলেয়র, ভালেরী, ফক্‌নার এবং কাফ্‌কার সৃষ্টিপ্রতিভা। এঁরা সবাই আধুনিক (এক বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে যে তিনি কালের বিচারে আধুনিক হলেও মেজাজের দিক দিয়ে পূর্বযুগের)। কাজেই আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমি যে-কেস্‌টি দাঁড় করাতে প্রয়াস পেয়েছি, সেটি উপরের কথাগুলির পটভূমিতে বিচার্য। আমার নালিশ সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নয়, আধুনিক সাহিত্যের পূর্বোল্লিখিত দুই ধারার বিরুদ্ধেই। নালিশে বিতর্কের সুর লেগেছে হয়তো, আশা করি তিক্ততার আমেজ ঘটে নি কোথাও। বিরূপ মন্তব্য যা করেছি, সঞ্চিত বেদনা থেকে করেছি, সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান অশ্রদ্ধা থেকে নয়।

অন্যদিকে, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যও আমার আলোচ্য নয়। রবীন্দ্রকাব্যের কথাই এখানে বলতে চেয়েছি, এবং তা থেকেও অনেক কিছু বাদ পড়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ পড়েছে কাব্যদেহের অ্যানাটমির দিকটা। তার প্রধান কারণ, কাব্যের আঙ্গিক বিষয়ে আমার ব্যুৎপত্তির অভাব। কবিতা সম্পর্কে চলতি মত দেহাত্মবাদ—সে-কথা আগেই বলেছি। দেহ না থাকলে আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, এবং নারীদেহের লাবণ্যে যেমন, কাব্যদেহের লাবণ্যেও আমি তদ্রূপ মুগ্ধ। এসব কথা মেনে নিয়েও বলব, নারী ও কবিতা সম্পর্কে শেষ অবধি আমি ভাববাদী। রবীন্দ্রনাথও তাই ছিলেন ; বলেছেন, 'কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে-পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎ-পরিচয়ের সামান্য একাংশমাত্র—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্য-রচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য।' য়েট্‌স্‌ও কি অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন নি একটি কবিতায় :

The rhetorician would decieve his neighbours,
The sentimentalist himself ; while art
Is but a vision of reality.

ভাবের দিক থেকেও বর্তমান পুস্তকের রবীন্দ্র-কাব্যালোচনা সীমিত; একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এখানে দেখতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। অমঙ্গলের চেতনা রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে কখনো সংকুচিত, কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্বের কাব্যরচনায় কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে— সেটা স্পষ্ট ক'রে তোলা আমার রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার একটা পক্ষ। অন্য পক্ষে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, প্রধানত এরই পরিণামে কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিশ্বনিরীক্ষা ও জীবনবোধ কেমন ক'রে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে, রোম্যাণ্টিক উদ্বেলতা ও বিষাদ থেকে ঈশ্বরপ্রেমের সমাহিত প্রশান্তি, সেখান থেকে দুই ভিন্ন পথে একই কালে এগিয়ে চলেছে পাশ্চাত্ত্য হিউম্যানিজম্-এর দিকে এবং এমন এক ট্র্যাজিক চেতনার দিকে যাতে নক্ষত্রের ভাঙাগড়া, সভ্যতার উত্থান-পতন, মানুষের সেই দুঃখ 'কোনো কালে যার অন্ত নাই'— সব-কিছুর মধ্যে 'ভীষণের প্রসন্ন মূর্তি' দেখতে পাওয়া সম্ভব।

এ-কথা কারও অজানা নেই যে, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে য়োরোপে এবং তৃতীয় পাদে এদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যমহিমা প্রতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। একাধিক আধুনিক কবি ও কাব্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কয়েকটি আপত্তি তুলেছেন— কখনো স্পষ্ট ভাষায়, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে, কখনো-বা মৌন অভিব্যঞ্জনায়। আপত্তিগুলি মোটামুটি দুই শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণীটি ভাষাগত। রবীন্দ্রনাথ যা বলেন— বিশেষত শেষ দশকের কবিতায়— বড়ো সোজাসুজি বলেন, ভাষা প্রায় গদ্যের মতো স্বচ্ছ ও ঋজু, সব-ক'টি শব্দ তার অভিধাযুক্ত, সব-ক'টি বাক্যের মানে বোঝা যায় অনায়াসে বা অল্পায়াসে। সব বোঝার পরেও বোঝার অতীত কিছু, সব কথার শেষেও 'দূর পারে সেই চুপ-কথা'র ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাঁর শেষ পর্বের কবিতায়, সে-প্রশ্ন তোলেন না এঁরা। যেন ভাষা অতিমাত্রায় দুর্ভেদ্য এবং ভঙ্গি ১৮০ ডিগ্রি তির্যক না হলে কবিতা কবিতাই হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর আপত্তি ভাবগত। শোনা যায়, জগতে অশুভ, কদর্য, বীভৎস রূপটা রবীন্দ্রনাথের চোখে ঠিকমতো ধরা দেয় নি, রোম্যাণ্টিক ভাবালুতায় রাঙা গোলাপী কাচের বেশ পুরু চশমা প'রে তিনি

সব-কিছুকে— মানুষকে, প্রকৃতিকে, সমগ্র বিশ্বচরাচরকে— অত্যন্ত শুভ ও সুন্দর ক'রে দেখেছেন ; স্বভাবতই তাঁর মনে হয়েছে 'ধন্য এই মানবজীবন, ধন্য বিশ্বজগৎ'।

আমার বইখানা প্রধানত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং গৌণত প্রথম শ্রেণীর আপত্তির কথা মনে রেখে লেখা।

অবশেষে একটি কৈফিয়ত। বর্তমান পুস্তকের কয়েক জায়গায় কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে অল্পবিস্তর মতান্তর প্রকাশ করেছি। তার মানে এই নয় যে, তাঁদের লেখা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করি নি। শ্রদ্ধা না থাকলে ভিন্ন মতের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হ'ত। তবে আমি চিন্তার ডায়ালেকটিকে আস্থাবান, বিশ্বাস করি যে, মতসংঘাতের পথেই সত্যের দিকে এগুনো যায়। এই 'বারে বারে পাওয়া, হারানো নিরন্তর ফিরে ফিরে'-পথ কবির পথ নয় ; কবি নির্ভর করেন আপন ঋজু অপরোক্ষ অনুভূতির উপর, হঠাৎ-জ্ব'লে-ওঠা অন্তরের দীপ্তির উপর। যাদের অন্তরে দীপ্তি নেই, কেবল আন্তরিক অনুসন্ধিৎসাই আছে, তাদের কিন্তু অনেক ঘুর-পথে পায়ের কাঁটা তুলতে তুলতে এগোতে হয়। নিজের সঙ্গে সর্বদাই তর্ক করতে হয়, পরের সঙ্গেও মাঝে-মধ্যে। নিজের উপর উৎপাত করা যায় খুশিমতো ; প্রয়োজনমতো পরের মতামত নিয়ে প্রশ্ন তুললে কি তাঁরা ক্ষুব্ধ হবেন ? তবে পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে রাখি।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজীনের হীরক জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, "সাহিত্যনীতি ও শ্রেয়োনীতি" অমৃত-এর শারদীয়া ১৩৭৩ সংখ্যায়, "গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা", "বলাকা", "শেষ পর্বের কবিতা" ও "কবিতার ভাষা" দেশ-এ শ্রাবণ ১৩৭৩ থেকে শ্রাবণ ১৩৭৪-এর মধ্যে। প্রত্যেকটি পূর্বপ্রকাশিত রচনা অল্পবিস্তর সংশোধিত হয়েছে ; অনেকখানি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে "সাহিত্যনীতি ও শ্রেয়োনীতি" শীর্ষক অধ্যায়। বইখানির বেশির

ভাগ খণ্ড খণ্ড ভাবে লিখিত এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ব'লে দু-চার জায়গায় পুনরাবৃত্তি অনিবার্য ছিল। সংশোধনকালে তার সবটুকু বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শেষ অধ্যায়টি বিশেষ উপলক্ষে রচিত। কবিতা-পরিচয়-এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার ব্যাখ্যা এবং প্রসঙ্গক্রমে শেষ পর্বের কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য আমি সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারি নি। ভিন্ন মত ব্যক্ত করি কবিতা-পরিচয় ও দেশ-এ, এবং সেই সূত্রে জানাতে হ'ল উক্ত কবিতাদ্বয় আমার মনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিমনের উপলব্ধি ও দৃষ্টি-ভঙ্গির বিশ্লেষণই এ-বইতে প্রাসঙ্গিক, কবিতা-বিশেষের ব্যাখ্যা আকস্মিক।

গৌরী, আরতি ও স্বপন নানা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাদটীকায় 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সর্বত্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ বোঝাবে। অন্যান্য পুস্তকের নামের পর সংস্করণের উল্লেখ না থাকলে প্রথম সংস্করণ ধ'রে নিতে হবে।

গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের মুদ্রণে দীর্ঘ কালভেদের জন্য রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থের নামের সম্বন্ধপদের বানানে সর্বত্র সমতারক্ষা হয় নি। আশা করি পাঠক এই অসংগতিটুকু মার্জনা করবেন। দুটো-চারটে অন্যপ্রকার ছাপার ভুলও চোখে পড়বে; অর্থবোধে অসুবিধা ঘটায় না ব'লে শুদ্ধিপত্র দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি।

বুদ্ধদেব বসু

বন্ধুবরেষু

অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা

কাব্যের ইতিহাসে প্রগতির লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায় কিনা এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। যাঁরা বলেন ঋগ্বেদ-সংহিতা, কঠোপনিষদ্, কিংবা সং অব্ সলোমনের তুল্য কবিতা পরবর্তীকালে আর রচিত হয় নি, তাঁদের কাব্যরসাস্বাদনে ভক্তিরসের আমেজ লেগেছে এমন সন্দেহের অবকাশ যদি-বা থাকে, বিশুদ্ধ কাব্যরসবিচারের উপর নির্ভর ক'রেই বহু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সমালোচক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, সফোক্লিস প্রভৃতি আড়াই-তিন হাজার বছর পূর্বে কবিকর্মকে সার্থকতার যে-স্তরে তুলে দিয়ে গেছেন, তার চেয়ে উচ্চতর শিখর-আরোহণ পরবর্তী কোনো কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি আজও। কিন্তু কাব্যের প্রগতি তর্কাধীন হলেও তার গতি অনস্বীকার্য। নদীর মতো কবিতাও চলে এবং সিধে চলে না, কখনো হঠাৎ কখনো ধীরে-ধীরে বাঁক নেয়, কখনো-বা এমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় আপন আধারে, আধেয়তে, বা উভয়ত, যাকে ইতিহাসে যুগান্তব ব'লেই অভিহিত করতে হয়।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব তেমনি এক যুগান্তর। খুব বেশি দিনের কথা নয় সে, মানসীর কবিতাগুলি (যাতে সর্বপ্রথম নতুন যুগপ্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়) রচিত হয়েছিল ১৮৮৭-১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, আজ থেকে মাত্র আশি বৎসর পূর্বে। ইতিহাস-দেবতা কিন্তু এর মধ্যেই অধীর হয়ে উঠলেন। মানসী প্রকাশের পর অর্ধ শতাব্দী গত না হতেই রবীন্দ্রকাব্য-বিচারে খুব বড় রকমের পটপরিবর্তন দেখা গেল; কাব্যের মানদণ্ডই গেল পালটে। যদিও রোম্যান্টিসিজ্‌মের সব

লক্ষণ এবং সন-তারিখ মিলিয়ে দেখতে গেলে খটকা লাগে একটু, তবু রবীন্দ্রনাথকে রোম্যান্টিক কবি বলতেই হয়, রোম্যান্টিকতার পরাকাষ্ঠা বললেও ভুল হয় না। (অথচ ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর রোম্যান্টিক মনন ও সংবেদনা, বিচার ও রচনা-শৈলী খুব দ্রুতগতিতে অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়ে। ফলে যে-য়েট্‌স্‌ ১৯১২ সালে গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখেছিলেন 'these lyrics display in their thought a world I have dreamed of all my life,' সেই য়েট্‌স্‌ জীবনের শেষ দশ-পনেরো বছর কাটালেন নিজের কবিকর্মকে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস থেকে (অর্থাৎ যে-রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন) যতটা পারেন দূরে, যতখানি সম্ভব বিপরীতে সংস্থাপিত করতে। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে যে-মেজাজ ও রুচি ইংরেজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল (ফ্রান্সে আরো আগে হয়েছিল) তার কাছে রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলেন, অন্যান্য রোম্যান্টিক কবিরা যতটা হয়েছিলেন তার চেয়েও যেন কিছুটা বেশি।

এই নব মূল্যায়নের ধাক্কা বাংলা দেশে এসে পৌঁছেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। কল্লোল এবং পরিচয় গোষ্ঠীর কবিরাও এক হিসাবে রবীন্দ্র-বিদ্রোহী ছিলেন, কিন্তু সে-বিদ্রোহ অন্য জাতের। তাতে রবীন্দ্রনাথের গগনচুম্বী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে কুণ্ঠা ছিল না। বরঞ্চ তার মর্মস্থলে এই কথাটাই নিহিত ছিল যে বাংলা কাব্যে এক নতুন মেজাজ ও আঙ্গিকের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যকে তাঁর একক সাধনায় এমন পরোৎকর্ষে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন যার নাগাল পাওয়া অনুজ কবিদের পক্ষে অভাবনীয়। অনুজ কবিরা রাজপথ বেয়ে কিছুদূর এগুতে-না-এগুতেই বুঝতে পারলেন ঐ পথে তাঁরা আর যা-ই পান, একান্ত নিজের গলার সুরটি খুঁজে পাবেন না।

কল্লোল ও পরিচয় যুগের কবিরা শিক্ষা পেয়েছিলেন ঐ কবি-গুরুর পাঠশালাতেই, তাঁদের চোখ, কান, কণ্ঠ ও মন তৈরি হয়েছিল তাঁরই সুরের ঝরনাতলায়। স্নাতকোত্তর কালে তাঁরা অবশ্য অনুভব করলেন রবিতন্ত্র থেকে মুক্তিলাভের প্রবল তাগিদ, একাধারে স্ব-তন্ত্রের প্রেরণা এবং (এ-কথাটা বিশেষরূপে পরিচয়-গোষ্ঠীর কবিদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য) 'আধুনিক' অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আকর্ষণ। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবিজন্ম ঠিক রবীন্দ্র-বিদ্রোহী তাঁদের বলা যায় না, কারণ তাঁরা আদৌ ঐ কাব্যসাম্রাজ্যের রাজানুগত নাগরিক ছিলেন না। সাহিত্যের অন্য জগতে তাঁরা ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, অন্য ভাবধারায় পুষ্ট ; যে-কাব্যানুশীলনে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তাঁদের রুচি ও রচনাশৈলী তা রবীন্দ্রকাব্যের অনুশীলন নয়। বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভালেরি, গটফ্রিড বেন, আঁদ্রে ব্রেতঁ, স্যামুয়েল বেকেট, জাঁ জেনে, অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ—কাব্যের এই জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। অবশ্য এঁরা পুষ্ট হয়েছেন কেবল বিদেশী সাহিত্যের কোলে এমন কথা আমি বলতে চাই না। বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যও এঁদের লেখাকে স্পষ্টতই প্রভাবিত করেছে। তবে সে-ঐতিহ্য রবীন্দ্র-কাব্যবাহিত নয়; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ এবং বোদলেয়র-অনুবাদক কিংবা 'যে-আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বুদ্ধদেব বসুর উত্তরাধিকারী এঁরা। উত্তমর্ণদের মধ্যে যে-লক্ষণগুলি পরিমাণ ও সংযম রক্ষা ক'রে প্রকাশ পেয়েছিল সেই লক্ষণগুলিকে এই নবীন কবিরা উগ্র এবং বল্‌গাহীন ক'রে তুলেছেন তাঁদের পদ্যে ও গদ্যে। অমিয় চক্রবর্তী কিংবা বিষ্ণু দে-র প্রভাবও যথেষ্ট পড়েছে পঞ্চাশের কবিদের উপর, কিন্তু যাঁরা ঐ প্রভাব গ্রহণ করেছেন তাঁরা আমার এ-আলোচনার

অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁদের সাহিত্যচেতনায় অমঙ্গলবোধ এবং এই অমঙ্গলময় জগতের প্রতি ঘৃণার ভাব তেমন সর্বব্যাপী নয়।

এতে আপত্তি করবার কিছু নেই; সর্বত্র যেমন সাহিত্যেও তেমনি ভাব ও ভঙ্গি যুগে-যুগে বদলায়, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই প্রাণের লক্ষণ। কিন্তু সব পরিবর্তনেরই একটা সীমা আছে; ঐ সীমাটুকু ছাড়িয়ে গেলে মূল বস্তু আর সে-বস্তুই থাকে না। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যবিচারের ইতিহাস পরিবর্তনের যতই সাক্ষ্য দিক, সর্বদেশকালের কবিমানসের পরিচয়ে এমন কয়েকটি মূলসূত্র কি আজও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি যার উপলব্ধি আমাদের সাহিত্যচর্চাকে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন করতে পারে, অর্থাৎ কবির সঙ্গে অকবির, রসস্রষ্টার সঙ্গে কারুকর্মীর পার্থক্যনির্ণয়ের সহজ শক্তিটি জাগিয়ে দিতে পারে? কারণ আমার সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে যে রোম্যান্টিকতার মোহ থেকে মুক্তি-লাভের ঐকান্তিক সাধনায় আধুনিক কবিরা এমন-কিছু থেকে নিজের মনকে বিমুক্ত করেছেন যাতে কবির চিরন্তন এবং অব্যর্থ পরিচয়। সব আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না, সম্মানিত ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছেন— বিদেশে এবং এদেশেও। আমি বলছি আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণের কথা।

সেই সাধারণ লক্ষণাবলীর মধ্যে একটি বড় লক্ষণ হ'ল কবিচিত্তে বিস্ময়বোধের অসাড়তা। গ্রীকরা বলতেন বিস্ময়ে দর্শনের সূত্রপাত; কবিতারও শুরু সেইখানে। তবে বিস্ময় মানে উচ্ছ্বাস নয়, এবং শুরু যেখানে সেইখানে কবিতার পরিণতি দেখা যাবে এমন কোনো কথা নেই। পরিণত কাব্যের লক্ষ্য হয়তো শেক্‌স্‌পীয়র-কথিত সেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশান্তি যা জীবনমরণের সারাৎসার, অথবা এমন এক ট্র্যাজিক চেতনা যাতে বাহাত্তুরে বুড়োর মৃত্যুও হয়ে ওঠে মহান এবং কর্ডেলিয়ার নিহত দেহের

সম্মুখে দাঁড়িয়েও মনে হয় না যে সমস্ত শুভশক্তির বিনাশ ঘটেছে; অথবা এমন শ্রেয়োবোধ যার কাছে শ্যামার প্রাণঘাতী কাম ক্ষমার্হ ঠেকে এবং বজ্রসেনের নীতিবিশুদ্ধ ক্ষমাহীনতা ক্ষমার অযোগ্য, অথবা অন্য কিছু। অবশ্য চামেলির গন্ধ, ঝরনার গান, ময়ূরের নৃত্য বা যুবতীর লাস্য নিয়ে হাজার হাজার বছর ধ'রে বিস্ময় বোধ করা কবির পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে; কিন্তু পৃথিবীটা তো খুব ছোটো নয়, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চেয়ে একটু বড়ো। এবং আইনস্টাইন যদি-বা ব'লে থাকেন জড়জগৎ সসীম, মনোলোকের সীমানার কথা বলতে সাহস পান নি কোনো ফ্রয়েড বা পাব্‌লব। মানুষ যে কেবল জৈব জগতের অধিবাসী নয়, অধ্যাত্মলোকেরও পরিব্রাজক, তারই অভিজ্ঞান রয়েছে এই শাশ্বত বিস্ময়বোধে। বিস্ময়বোধের অবলুপ্তিকে তাই আমি কাব্যের প্রগতি ব'লে মেনে নিতে কুণ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে / তুমি বিচিত্ররূপিণী'। আধুনিকরা সংক্ষেপের পক্ষপাতী, তাই তাঁদের উপলব্ধিও একটু সংক্ষিপ্ত—জগতের মাঝে দ্বিচিত্র তুমি হে / তুমি দ্বিচিত্ররূপিণী। চিত্রদুটির একটি চিত্র দুঃখের, অন্যটি পাপের। দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে ইংরেজিতে evil ব'লে অভিহিত করা হয়, তারই বাংলা করেছি অমঙ্গল। দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে প্রবলেম্ অব্ ইভিল এক বহু প্রাচীন এবং আজো পর্যন্ত নাছোড়বান্দা সমস্যা। ইদানীংকালে তা সাহিত্যকেও পেয়ে বসেছে—ঠিক দার্শনিক সমস্যাটি নয়, জগতের মধ্যে অমঙ্গলের একচ্ছত্র আধিপত্য। দুঃখ ও পাপের মাত্রা আধুনিক কালে আগের চেয়ে বেড়েছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের উপর তার ছায়া যে অতি বৃহৎ আকার ধারণ করেছে তাতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

প্রতিবিম্ব বিম্বকে আয়তনে এবং বর্ণের কালিমায় বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে ব'লে আমার বিশ্বাস।

ফ্রান্সে ভিক্তর উগোর নেতৃত্বাধীন কবিদের মধ্যে এবং ইংলণ্ডে লেক স্কুলের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে রোম্যান্টিকতা ষোলো কলায় পূর্ণ বিকশিত ছিল, তার অবসান ঘটল অমঙ্গলেরই প্রবল অভিঘাতে। ঘটালেন বোদলেয়র। বোদলেয়রকে বলা হয় প্রথম কাউণ্টর-রোম্যান্টিক এবং কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ। ঐ সময়ে এবং পরবর্তী কালে কাব্যের আঙ্গিকেও এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অনেকে বলতে লাগলেন, কবিতায় যে-ভাব প্রকাশ পায় তা' যতই অকিঞ্চিৎকর, উদ্‌ভ্রান্ত বা উদ্ভট হোক্ তাতে কিছু আসে যায় না, এমন কি ভাবের অংশটা 'পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে গেলে, ঝিম হয়ে গেলে, ভোঁ হয়ে গেলে, তার মানে না হয়ে গেলে'ও ক্ষতি নেই, কারণ কবিতার ভঙ্গিটাই আসল, ভঙ্গিটাই পথ এবং লক্ষ্য, সাধনা এবং সিদ্ধি। এর বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তিম ছুটি অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। আপাতত ভাবের দিক থেকে যে-বিপ্লব ঘটালেন বোদলেয়র, তার বিষয়েই কিছু বলতে চাই। পোল্ ভালেরীর মতে বোদলেয়র ফরাসী সাহিত্যের উপর সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি, তাঁর কবিতা আধুনিকতার প্রতিভূ। এই বাংলা দেশেও একজন কৃতী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ এবং পরীক্ষানিরত বহু নবীন কবির পক্ষে 'এ কথাটা (কথাটা র‍্যাবোর) মেনে নেওয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হয়ে গেছে যে তিনি (অর্থাৎ বোদলেয়র) "প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা"।'

রবীন্দ্রনাথ ছুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন— 'এক-একটি জড়-প্রকৃতির লোক আছে জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের

ঔৎসুক্য, তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প ও বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।' এমনি এক প্রবাসী— আজকালকার ভাষায় alienated— কবি বোদলেয়র। বোদলেয়র আপন হৃদয়ের গবাক্ষগুলিকে সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে অধিকাংশ নয় সমস্ত জগৎ থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বর্ষার ধারা তাঁর কাছে নেমে আসে জেলখানার গরাদ হয়ে :

When the rain spreading its immense trails
Imitates a prison of bars.

আর আকাশ সেখানে নীল নয়, চটচটে কালো :

Can you illuminate a grimy, black sky? Can we pierce shadows denser than pitch, with no morning or evening, with no stars, without even gloomy flashes of lightning? Can you illuminate a grimy black sky?... The devil has snuffed the light at the windows of the Inn.

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার জেলখানায় তাঁর কবিসত্তা বাস করত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। এলিয়ট বলছেন, 'যদিচ বোদলেয়রের পদ্যরীতি ও শব্দবিন্যাস বৈপ্লবিকভাবে নূতন, জীবনবোধে যে-নূতনত্ব তিনি এনেছিলেন তা আরো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ।' এই যুগান্তকারী জীবনবোধের মূলকথা হ'ল প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি রোম্যান্টিক বিস্ময় ও উৎসাহের স্থলে এক সর্বগ্রাসী বিতৃষ্ণা ও নির্বেদের অভিষেক। বোদলেয়রীয় বিতৃষ্ণার চারটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে, অন্তত এই চারটি কারণের কথা আমি এখানে তুলতে চাই :

১. প্রথম কারণটি মোটের উপর ঐতিহাসিক। বোদলেয়র যখন কবিতা লেখা আরম্ভ করেন তখন ফ্রান্সে রোম্যান্টিকতার সর্বত্র জয়জয়কার এবং রোম্যান্টিকদের রাজা ভিক্‌তর উগো গৌরবের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। রোম্যান্টিসিজ্‌মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বোদলেয়র স্বয়ং বলেছেন তা মূলত 'একপ্রকার অনুভূতি' এবং বিশেষত 'অন্তরঙ্গতা, আধ্যাত্মিকতা, বর্ণবৈভব, অসীমের উৎকাজ্ক্ষা'। এ-সব ব্যাপারে রোম্যান্টিকদের কৃতিত্ব অস্বীকার করার তাঁর কোনো ইচ্ছা ছিল না; বরঞ্চ সৃজনী কল্পনার ক্ষেত্রে মহৎ পূর্বসূরিদের সমকক্ষ হতে পারবেন কিনা সে-বিষয়ে তাঁর নিজের মনে বেশ একটু সন্দেহ ছিল— লিখছেন আঁরি পের। ফ্ল্যর দ্যু মালের ভূমিকার খশড়ায় বোদলেয়র স্বয়ং ঘোষণা করছেন: 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরা কাব্যরাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছেন বহুকাল পূর্বেই; সুতরাং আমাকে হতে হবে অন্য কিছু।' তাঁর একটি মৌলিক প্রত্যয় ছিল যে মানুষের, এমন-কি শিশুরও, হৃদয়াবেগ-সমষ্টি দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কক্ষে বিভক্ত— এক্‌স্‌টেসি অব লাইফ ও হরর্‌ অব লাইফ। যেহেতু রোম্যান্টিকরা ছিলেন মাধুর্য ও প্রেমের কবি, তাই বোদলেয়রকে হতে হবে তিক্ততার ও ঘৃণার কবি। এককথায় তাঁর বিশ্ববিতৃষ্ণা ছিল তাঁর কাউণ্টার-রোম্যান্টি-সিজ্‌মের অঙ্গবিশেষ। সাধারণত বলা হয় যে এই কবির রচনায় রোম্যান্টিক ও ক্লাসিকের সমন্বয় ঘটেছে। আমার অবশ্য মনে হয় এলিয়টের উক্তিই অধিকতর সত্য: যদিও পরিবেশগুণে তিনি ছিলেন রোম্যান্টিসিজ্‌মের সন্তান, কিন্তু স্বভাবগুণে তাঁকে হতে হ'ল রোম্যান্টিসিজ্‌মের শত্রু।

২. দ্বিতীয় কারণটিকে বলা যাক বিষয়ীগত (সাবজেক্‌টিভ), অর্থাৎ কবির দেহমনের মধ্যেই তাঁর জাগতিক বিতৃষ্ণার উপাদান-

গুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। বোদলেয়র তরুণ বয়স থেকে, হয়তো-বা জন্মাবধি, এক অতিশয় পীড়াদায়ক, গ্লানিকর ও দুরারোগ্য রোগে ভুগতেন— সিফিলিস রোগে। উপরন্তু তাঁর মানসিক কষ্টেরও অবধি ছিল না। শৈশবকাল কেটেছিল মাতা ও মাতার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে নানারূপ সংঘর্ষের মধ্যে। স্কুলজীবন সম্পর্কে লিখেছেন: 'হাতাহাতি, শিক্ষক এবং সহপাঠকদের সঙ্গে অনবরত বিরোধ ও সংগ্রাম, মাঝে-মাঝেই অবসন্ন বিষাদের ছায়া পড়ত মনের উপর।' যদিও লেখাপড়ায় তিনি এগিয়েই ছিলেন তবু উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বৈরাচারের জন্য তাঁকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রণয়পর্বের ইতিহাস— একাধিক যুবতীর প্রতি প্রবল কিন্তু সাময়িক আসক্তি এবং এক নীচস্বভাবা গণিকার অকাট্য মোহ-বন্ধন, ইত্যাদি— মোটেই সুখপাঠ্য নয়। তাঁর চরিত্র-প্রসঙ্গে এলিয়ট লিখছেন: সমাজের চোখে এবং ব্যক্তিগত যাবতীয় ব্যাপারে বোদলেয়র ছিলেন অত্যন্ত বিকৃতস্বভাব, অসামাজিকতা ও অকৃতজ্ঞতার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন; তাঁর মেজাজ যেমন তিরিক্ষি ছিল তেমনি যে-কোনো পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের পক্ষে অসহনীয় ক'রে তোলার জেদ ছিল অভ্রভেদী।

এহেন ব্যক্তির মন সুস্থ থাকার কথা নয়। বোদলেয়রের একাধিক গুণগ্রাহী সমালোচক যে-বিশেষণটি তাঁর সম্বন্ধে বার-বার প্রয়োগ না ক'রে পারেন নি সেটি হচ্ছে 'আধিগ্রস্ত'। এলিয়ট তো তাঁকে 'সিম্বল অব মর্বিডিটি' আখ্যা দিয়েছেন; প্রতি-তুলনা করেছেন পূর্ণস্বাস্থ্যের প্রতীক গ্যেটের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও করলে পারতেন, কারণ এই বাঙালী কবিও অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, বিশেষত অধিকারী ছিলেন সেই স্বাস্থ্যের যাকে বোদলেয়র স্বয়ং বলেছেন 'পোয়েটিক হেল্‌থ'।

অত্যন্ত কঠিন শারীরিক পীড়ার মধ্যেও তাঁর কাব্যিক স্বাস্থ্য অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম যেমন ছিল তাঁর নিটোল মানসিক ও কাব্যিক স্বাস্থ্যের প্রকাশবিশেষ, তেমনি বোদলেয়রের বিশ্ব-বিতৃষ্ণাকে তাঁর ব্যাধিগ্রস্ত মনের অভিব্যক্তি জ্ঞান করা যেতে পারে। দুঃখের কথা এই যে বোদলেয়রের মন ব্যাধিগ্রস্ত ছিল কিনা এ নিয়ে তর্ক ওঠে না, গুণমুগ্ধ সমালোচকরা অসংকোচে মেনে নেন, তাঁদের প্রিয় কবি ছিলেন রীতিমতো একটি মেণ্টাল কেস। মানসিক স্বাস্থ্যের চেয়ে মানসিক ব্যাধিকেই মূল্যবান মনে করা হয় ইদানীং— তার কারণ কি এই যে আধুনিকেরা বিশ্বাস করেন লৌকিক ব্যাপারে চেতনা ও চরিত্র ওলট-পালট হয়ে গেলে লোকোত্তর জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন খুলে যায়? কথাটা একটু পরেই আলোচিত হবে।

জীবন ও জগৎ বিষয়ে বোদলেয়রের এই নূতন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যপ্রসূত জ্ঞান করলেও তাঁর সৃজনী প্রতিভার মূল্য এবং সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সর্বসম্মত গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। শুধু 'আঙ্গিকের অপূর্ব সৌষ্ঠব আর শব্দচয়নের অনবদ্যতা' নয়, আরো দৃঢ়ভূমির উপর এই কবির বিরাট খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। মানুষ স্বার্থান্বেষণে নির্বোধ এবং পরার্থহরণে নির্দয়, জাতি বর্ণ ও ধর্ম-বিদ্বেষে বিমূঢ়, মনস্তত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞানের বর্ণমালাও আয়ত্ত ক'রে ওঠে নি, ফলত নানাপ্রকার আধিব্যাধির দাস— ইত্যাদি বিবিধ কারণ যতদিন বর্তমান আছে ততদিন জীবনের দৈন্য আমাদের সকলকে মাঝে মাঝে পীড়া দেবেই। বিশেষত সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল মনের যাঁরা অধিকারী তাঁরা যখন মনুষ্যজীবনের এই অসহায় দশা কল্পনার চক্ষে দেখেন তখন এক অপার নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া পড়ে তাঁদের মনের গভীরতলে। সেই ছায়াকে কায়া দিয়েছেন

বোদলেয়র, তার অভূতপূর্ব প্রকাশ, প্রকাশের পরোৎকর্ষ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। এ-সবই স্বীকার্য। তবু বলবো বিশেষ একটি মুডের, বিশেষ একটি রসের অনন্য এবং অনবদ্য কবি বোদলেয়র —তার বেশি কিছু নয়।

অবশ্য এইটুকু বলাও তো কম বলা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি করা হয়ে থাকে এবং সে-দাবি সাহিত্যের রাজধানীগুলি থেকে উত্থিত হয়ে বহুদূর প্রান্তে অবস্থিত কলকাতা নগরীতেও ব্যাপক, অন্তত জোরালো স্বীকৃতি লাভ করেছে ইদানীং। নইলে রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বোদলেয়র সম্বন্ধে এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। দাবি করা হয় যে ঐ বিশিষ্ট বোদলেয়রীয় রসটি সাময়িক কোনো চিত্তদৌর্বল্যের বা স্থায়ী একধরনের অস্বভাবী হৃদয়াবেগের প্রকাশ-মাত্র নয়, তার মধ্যে সেই শাশ্বত গুণটি রয়েছে যাকে বাস্তবানুগ, যথার্থ, সত্য, ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া যায়। কোনো হৃদয়ানুভূতিকে 'সত্য' তখনই বলা সংগত যখন তা অনুভব-মাত্র নয়, যখন আমরা তাকে একটি পূর্ণ অভিজ্ঞতা বা সামগ্রিক উপলব্ধিরূপে অবাধে গ্রহণ করতে পারি। তার মানে, দাবি করা হয় যে বোদলেয়র শুধু আলংকারিক অর্থে কবি নন, বৈদিক অর্থে কবি, অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা ; রোম্যান্টিক কল্পনার রঙিন আবরণ ছিঁড়ে ফেলে নির্ভীক চোখে বাস্তবের নগ্নরূপ দেখেছেন— দেখেছেন কী বীভৎস তার সেই সত্যিকার চেহারা।

৩. মোটকথা দাবি করা হয় যে বোদলেয়রের বিশ্ববিতৃষ্ণা কেবল সাবজেক্টিভ নয়, অবজেক্টিভও বটে। কবি স্বয়ং এই দাবি করেছেন, অবশ্য মাঝে মাঝে কবিসুলভ আত্মখণ্ডনপ্রবণতায় আবার উলটো কথাও বলেছেন। গুণী সমালোচকদের লেখনীতেই এমনতর দাবি সুসংবদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। 'পরিণত বয়সেও,'

বোদলেয়র বলেছেন, 'এমন শৈশবের দিন মাঝে মাঝে ফিরে আসে যখন প্রকৃতি রঙে ও রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং নানা প্রতিকূল শক্তির আঘাত-সংঘাতময় মনুষ্যলোকে দেখতে পাওয়া যায় দিগন্তের পর দিগন্তের বিস্তার, নিত্যনব মহিমায় ভাস্বর।' এই বিরল দিন ও মুহূর্তগুলি কিন্তু বোদলেয়রের মতে কবির পক্ষে শুভদিন নয়, কারণ তা মিথ্যাশ্রয়ী ; কবিকে নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, বাস করতে হবে 'সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘন কালিমার মধ্যে'।

৪. কিন্তু বোদলেয়র কি সত্যিই বাস্তব জগৎকে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছিলেন, কিংবা দেখতে চেয়েছিলেন? ছেলে-বেলা থেকে তিনি খ্রীস্টধর্মাগত এই প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত ছিলেন যে মানুষের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে, তার একটি গেছে ভগবানের দিকে, অন্যটি শয়তানের দিকে। মনে মনে তিনি বরণ করলেন প্রথম পথটি, কিন্তু পা বাড়ালেন দ্বিতীয় পথে ; রীতিমতো সাধনা করলেন পাপের, পঙ্কের। কারণ তাঁর আর-একটি মৌল প্রত্যয় ছিল যে, পাপের পথেই তিনি বুঝবেন বিশ্বজগৎ কত ন্যক্কারজনক এবং সে-ন্যক্কারবোধ যত দৃঢ় ও ব্যাপ্ত হবে ততই ভগবানকে কাছে পাবেন তিনি। পঙ্কের সাধনায় বোদলেয়র ভগবানকে পেলেন কিনা তা ভগবানই জানেন, আমরা অবশ্য পেলাম কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর পঙ্কজাত পুষ্প—*Fleurs du Mal*। সে যা-ই হোক, আমার বক্তব্য এই যে জগতের কালিমা তাঁর সংকল্প ও সাধনার দ্বারা লব্ধ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পাওয়া নয়। অর্থাৎ তাঁর বিখ্যাত 'স্প্লীন' সাব-জেক্‌টিভ অনুভূতিরূপে যতই সত্য হোক, অবজেক্‌টিভ উপলব্ধি-রূপে সত্যতার কোনো দাবি রাখতে পারে না। বোদলেয়র জগতের কালিমাই দেখলেন কারণ শুধু তাই দেখবেন ব'লে

মনস্থির করেছিলেন। যা-কিছু শুভ্র সমুজ্জ্বল শুভ ও আনন্দময় তা তাঁর ক্যাথলিক বিশ্বাসমতে তাঁকে পথভ্রষ্ট করবে এই ভয়ে সে-দিক থেকে তিনি মুখ ফেরালেন জন্মের মতো, যেন ডান চোখটি নিজের হাতেই কানা ক'রে ফেললেন। আশ্চর্য কৃচ্ছ্র-সাধন, কিন্তু প্রত্যাশিত ফল ফলল। বাঁ চোখ দিয়ে বোদলেয়র দেখতে পেলেন প্রকৃতি ও নারী— কাব্যের দুই চিরন্তন অফুরন্ত বিস্ময় ও রহস্য— উভয়ই ঘৃণ্য ('abominable'); মানুষ, অধিকাংশ মানুষ, কশাঘাতের যোগ্য ('most of humanity was created for the whip')। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, তলস্তয় যে-সব নারী ও পুরুষের কথা লিখেছেন তারা কেউ কোনোদিন বোদলেয়রের দৃষ্টিগোচর হয় নি। দেশ-দেশান্তর ঘুরে এই কবি সর্বত্র শুধু দেখতে পেলেন :

Everywhere, without even looking for it, from top to bottom of the deadly scale, we saw the tedious sight of immortal sin ; woman, that vile slave, proud and stupid, seriously adoring herself and loving herself without disgust ; and man, that greedy tyrant, lewd, merciless, and grasping, the slave of a slave, the tributary of a sewer ; the torturer enjoying himself, the martyr sobbing ; the banquet seasoned and perfumed with blood ; the poison of power exasperating the despot ; the people enamoured of the stupefying lash ; several religions like our own, so many ladders to heaven ; saintliness finding a thrill in nails and hair-shirts, like an invalid snug in his feather-bed ; chattering mankind drunk with its own wit, as crazy today as it was in the past, shrieking to God in its insane agony, "O Thou, my likeness, my master, I curse Thee !"—and,

least stupid of all, the dauntless lovers of madness, fleeing the Fate-guarded herd and taking refuge in the infinity of opium...Such is the eternal balance-sheet of the entire globe. [১] — *Le Voyage.*

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসা···এও একটা মোহ, এর মধ্যে শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করার গভীরতা নেই'।[২] মোহের ভিত্তি চারিত্র্যনীতির উপর স্থাপিত হোক ('শুভাশুভের অত্যন্ত কঠিন বাস্তব সমস্যা নিয়ে বোদলেয়র সর্বদাই ব্যাপৃত ছিলেন'— বলছেন এলিয়ট), কিংবা ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রের উপর, তা মোহ-ই।

বিশ্বজগতের রঙটা ফুটফুটে গোলাপীও নয়, চটচটে কালোও নয়। যাঁরা সব-কিছুকে গোলাপ ফুলের মতো রূপবর্ণগন্ধের সুষমাযুক্ত দেখেন বা সৃষ্টিকে পরম করুণাময় ভগবানের অপার অবিমিশ্র কল্যাণশক্তির প্রকাশ ভাবেন তাঁরা নিজেকে ভোলান, তাঁদের আমরা ভাববিলাসী ব'লে জানি। কিন্তু যাঁরা সমস্ত জগৎটাকে নেকড়ে বাঘ বা পূতিগন্ধময় নর্দমা রূপে উপলব্ধি করেন তাঁরাও ভাববিলাসী ; 'পচা মাংসের বিলাসও বিলাস'। বিলাসিতার ফ্যাশন বদলেছে, এই পর্যন্ত। পূর্বযুগের ভাব-বিলাসীরা তবু সংযম রক্ষা ক'রে চলতেন তাঁদের লেখায় ; কীট্‌স্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, রিল্‌কে, ডিকেন্‌স্‌, জর্জ এলিয়ট, তলস্তয় —এঁরা কেউ সৃষ্টির কালো দিকটার বিষয়ে অনবহিত বা নীরব ছিলেন না। নব্য ভাববিলাসীরা— বোদলেয়র, কাফ্‌কা, ফকনার, নর্মান মেলার[৩], জঁা জেনে (সার্ত্র্‌ যাঁকে Saint Genet উপাধিদ্বারা বিভূষিত করেছেন) এবং স্বয়ং সার্ত্র্‌— বিতৃষ্ণা বা বিবমিষার প্রকাশে এঁরা কেউ সংযমের ধার ধারেন

না, কালোকে যত বেশি কালো এবং সাদাকে যত অদৃশ্য ক'রে দিতে পারেন তাঁদের সাহিত্যে ততই তাঁরা সত্যদ্রষ্টা ব'লে খ্যাতি লাভ করেন।)

প্রাচীন পারস্য মতে এ-জগৎ শুভাশুভ শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বক্ষেত্র, মানুষকে তাঁরা আহ্বান করেছিলেন শুভদেবতার পক্ষে এই সৃষ্টিযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—ব্রহ্মের কঠোর তপস্যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড় থেকে প্রাণ ও মনের দিকে, অশুভ থেকে শুভের দিকে, অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে এই কঠিন বেদনাময় সৃষ্টিকার্য চলেছে ও চলবে, তার দিকে পিঠ না ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়— সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারি না।···—হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়,···কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না'[৪]; বলছেন :

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

চশমাটা কি খুব বেশি রঙিন ব'লে ঠাহর হচ্ছে? এর চেয়ে অনেক বেশি রঙিন নয় কি সেই চশমা যার ভিতর দিয়ে বোদলেয়র

মনুষ্যলোক ও জড়-প্রকৃতিকে দেখেছেন 'an oasis of horror in a desert of ennui' রূপে ?

যাঁরা বলেন বোদলেয়রের মনে লোকোত্তর পরোৎকর্ষের অথবা পরোৎকৃষ্ট সত্তার অর্থাৎ ভগবানের প্রতি নিবিড় ভক্তি ও প্রেম অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল ব'লে তিনি এই দোষপাপপূর্ণ বিশ্ব-জগৎকে সইতে পারতেন না, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। বোদলেয়রের কবিতায় কোনো সদর্থক ভাব বা ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে গেলে কষ্টকল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়; নঙর্থক ভাবে তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টি এতই ভরপুর যে সেখানে অন্য-কিছুর স্থান আছে ব'লে ঠাহর হয় না। হাসপাতাল-বিষয়ক গদ্য কবিতাটিতে (হাসপাতাল সেখানে স্পষ্টতই সমস্ত পৃথিবীর প্রতীক) কবি তাঁর আত্মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, এই হাসপাতালের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে কোথায় যেতে চায় ? নানা লোভনীয় জায়গা ও অবস্থার বর্ণনা ক'রে প্রশ্ন করছেন— সেখানে কি ? আত্মা নীরব। অবশেষে ত্যক্ত হয়ে আত্মা চিৎকার ক'রে ওঠে, 'Any-where ! anywhere ! As long as it be out of the world'। *The Voyage*-এর উপান্ত্য স্তবকে বোদলেয়র মৃত্যুকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, 'This country bores, O Death ! Let us set sail'। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি জীবনকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ? কোনো পারত্রিক পরম শুভ বা সুন্দর ভূখণ্ড কি তাঁকে আহ্বান করছে ? না, তেমন কিছু নেই সংসারে বা সংসারের পরপারে ; কী এসে যায় তাতে ? গন্তব্য নয়, গতি অর্থাৎ পলায়নটাই শেষ কথা— যে-নতুন স্থানে পৌঁছোবেন সেটা আগের মতোই ন্যক্কারজনক হবে এ-কথা জেনেই তিনি নতুনের সন্ধানী :

To drive into the gulf, Hell or Heaven—
What matter ? Into the Unknown in search
of the New !

পারলৌকিক কোনো-কিছুর তৃষ্ণা নয়, জাগতিক সর্ববিষয়ে বিতৃষ্ণাই বোদলেয়রীয় কাব্যের মূল এবং পরিব্যাপ্ত অনুভূতি।[৫]

বোদলেয়রের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে তিনি প্রতিভাবান কবি অথচ তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা ক্ষয় করেছেন নিজের এবং আমাদের সকলের সর্বনাশ ঘটাতে। বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, এমন-কি ধর্মপ্রচারক— এঁদের সকলের অপেক্ষা শিল্পীর ভাবনা ও বেদনা অনেক বেশি সংক্রামক। রোম্যান্টিকদের বলা হয় যৌবনের কবি ; বোদলেয়র হলেন জরার কবি। আমাদের মনের যৌবন ততদিনই যতদিন 'মনোবৃক্ষের ছড়িয়ে-পড়া রসলোলুপ পাতাগুলি' জীবন্ত থাকে। সত্তর, কারো-বা আশি বছর বয়স পার হয়ে গেলে ঐ পাতাগুলির ঝ'রে পড়ার দিন অবশ্যই আসে ; মন তখন আকুঞ্চিত, অসংবেদনশীল ও অসাড় হয়ে পড়ে, কাউকেই, কোনো-কিছুকেই, ভালোবাসতে পারে না, কিছুই ভালো লাগে না, কিছুই দেখতে ছুঁতে জানতে ইচ্ছে হয় না, মানবিক বা প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপারই আর আশ্চর্য ঠেকে না, সবই তখন পুরোনো, পানসে, বিস্বাদ, একঘেয়ে। আঠারো বছর বয়স থেকেই যদি কারো মনের ঐ পাতা-ঝরা অবস্থা ঘ'টে যায় তবে একে তার সর্বনাশ ছাড়া আর কী বলব ? এই অবস্থা কি ঘটবে না যদি আমাদের নিত্যসঙ্গী হন সেই শক্তিমান কবি যিনি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা ক'রে কিছুই দেখতে পেলেন না যাতে তাঁর মন সাড়া দিতে পারে, স্পন্দিত হতে পারে, বিস্ময়, আগ্রহ বা কৌতূহল বোধ করতে পারে ; দেখলেন কেবল বীভৎস এক মরূদ্যানের চারিদিকে একঘেয়ে

বিরক্তিকর মরুভূমির অনন্ত বিস্তার। জগতে নিছক ভালো কিছু আছে হয়তো, নিছক মন্দও কিছু থাকতে পারে, শতকরা নিরানব্বই ভাগ বস্তু ভালোয়-মন্দে সুন্দরে-কুৎসিতে সত্যানৃতে মিথুনীকৃত। কিন্তু যার মন সপ্রাণ ও সংবেদনশীল তাকে তৃণখণ্ড থেকে নীহারিকাপুঞ্জ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু ও ব্যাপার ডেকে বলছে : আমার দিকে চেয়ে দেখো, আমাকে স্পর্শ করো, বুদ্ধি দিয়ে বোঝো, হৃদয় দিয়ে বোধ করো— দেখবে আমার কোথাও শেষ নেই, তল নেই, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং তদতিরিক্ত যদি কিছু থাকে তবে তারও অনন্ত রহস্যের আভাস আছে আমার মধ্যে। এই পরমাশ্চর্য জগৎকে বোদলেয়র কেমন ক'রে বললেন —"মনোতোন এ পেতি"! এত বড়ো অনৃতবাক্য কি সাহিত্যে আর কোথাও উচ্চারিত হয়েছে? যদি বলেন এটা নৈর্ব্যক্তিক সত্য বা মিথ্যার প্রশ্ন নয়,[৬] একঘেয়ে আর অকিঞ্চিৎকর জগৎটা কবিরই মনের প্রতিবিম্ব, তবে আমি তা মেনে নিয়ে শুধু একটি প্রশ্ন যোগ করব— যে-রসনায় সবই বিস্বাদ ঠেকে সে-রসনার আস্বাদনশক্তি কি অবশিষ্ট আছে, যে-মনের কাছে সবই একঘেয়ে সে-মন কি বুড়িয়ে যায় নি? বীভৎসকে দেখবার মতো নির্ভীক চোখ বোদলেয়রের ছিল, কিন্তু জগতের ও জীবনের পরম বিস্ময় বোধ করবার মতো মনের সজীবতা কোন্ ভূয়োদর্শনের বা আপ্তবাক্যের আওতায় প'ড়ে হারালেন তিনি? সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ এই যে বোদলেয়রীয় 'আঁনুই'-এর তন্নিষ্ঠ চর্চা আমাদের যুবকদের মনকেও যৌবনের প্রারম্ভেই জরাগ্রস্ত ক'রে দিচ্ছে।

বোদলেয়রের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রভাব পাশ্চাত্য সাহিত্য-কর্মের উপর ও সাহিত্যিকদের জীবনবোধের উপর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে চলল। সে-প্রভাব ফরাশি কাব্যে তাঁর মৃত্যুর

অব্যবহিত পরেই পরিলক্ষ্য, যদিও চ্যানেল পার হতে তার দু-চার দশক সময় লেগেছিল। ফ্রান্সে বোদলেয়রের পরে যে-কাব্যশৈলী সবচেয়ে শক্তিমান কবিদের আনুগত্য লাভ করল তাকে 'প্রতীকবাদ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রতীকী কবিদের কাছে এটা মোরসীসূত্রে পাওয়া, সুতরাং অবধারিত সত্য, যে জগৎ-ব্যাপারটা অতিশয় কদর্য এবং তার প্রতি একমাত্র সংগত ভাব বিতৃষ্ণা, একমাত্র উচিত কৃত্য মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। র‍্যাঁবো ইন্দ্রিয়জ্ঞানের শক্তিটাকে শুদ্ধ বিপর্যস্ত করতে উপদেশ দিলেন কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্র তাঁর কাছে অবজ্ঞেয়; কবিতার ভাষায় যে-স্বাভাবিক পার্থিব সমাজবোধ্য অর্থব্যঞ্জনা থাকে তাকে প্রায় অবলুপ্ত করতে তৎপর হলেন এই ভরসায় যে তাতে ক'রে কবিতার অপার্থিব অর্থদ্যোতনা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আবিষ্কার করতে চাইলেন এক অভিনব ভাষা যা 'পরব্রহ্মের রূপায়ণে সক্ষম'।

এই পরব্রহ্ম বিষয়ে যোগী, মুনি, ঋষি প্রভৃতি আখ্যাবিশিষ্ট সিদ্ধপুরুষেরা বহুদীর্ঘ গুহ্য তপস্যার ফলে যদি-বা কোনো অতীন্দ্রিয় অনির্বচনীয় প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভে সক্ষম হয়ে থাকেন. কবি লোকোত্তর রহস্য উপলব্ধি করেন বিশ্বলোকের মাঝখানেই, দৃশ্যরূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন অপরূপকে, দর্শনাতীতকে। এই কথাটা সুন্দর ক'রে বলেছেন জাক্ মারিতাঁ্যা, আধুনিক কাব্য ও শিল্পকলার বোধকরি সবচেয়ে জ্ঞানী ও সহৃদয় অধিবক্তা: 'কবির উপলব্ধি উপলব্ধ বস্তুগুলিকে প্রাণস্পন্দিত ও স্বচ্ছ ক'রে তোলে; সেই স্বচ্ছ আবরণের ওপারে আমরা দেখতে পাই দিগন্তের পর দিগন্তের বিস্তার।...কবি এক অসীম রহস্য অনুভব করেন বাস্তব জগতের রহস্যের মধ্যেই।' এইসঙ্গে তিনি আরো একটি মত প্রকাশ করেছেন যা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

মারিতঁ্যা মনে করেন কবিতার ভাষা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের অর্থ বহন করে। ক্ল্যাসিক্যাল কাব্য (তাঁর লেখায় এর মানে প্রাক্‌-বোদলেয়রীয় কাব্য) পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে গড়া যে-শিল্পরূপটি, তার প্রথম ইঙ্গিত অবশ্য কতগুলি সুনির্দিষ্ট চিত্তগ্রাহ্য বস্তুর দিকে। কিন্তু এটি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য পরমসত্তার সেই ঝলকটুকু দেখিয়ে দেওয়া যা চিত্তের অগম্য, কনসেপ্টের সঙ্গে কনসেপ্ট যোগ ক'রে যার নাগাল পাওয়া যায় না, অর্থাৎ ভাষার সাধারণ এবং যুক্তি-বিত্তানুমোদিত প্রয়োগ যেখানে ব্যর্থ। এ-পর্যন্ত যদি-বা মেনে নেওয়া যায়, মুশকিল বাধে যখন মারিতঁ্যা ঘোষণা করেন যে, কবিতার ভাষার দুইপ্রকার অর্থ কেবল ভিন্ন নয়, একেবারে পরস্পর-অনপেক্ষ— এতই অনপেক্ষ যে প্রথম অর্থ (প্রত্যক্ষ পার্থিব বস্তুসমূহের নির্দেশ) বর্জন ক'রেও কবিতার পক্ষে সম্ভব অর্থ (অতীন্দ্রিয় পরম রহস্যময় সত্তার ইঙ্গিত) বহন করা। উপরন্তু মারিতঁ্যা বলতে চান প্রতীকী কবিরা এহেন পূর্ণ-বিচ্ছেদ ঘটাতেই বদ্ধপরিকর। কবিকৃত শব্দপরম্পরার এই যে মধ্যবর্তী অর্থ, যা আমাদের মনকে নিয়ে যায় প্রাকৃতিক বা মানবিক বাস্তবজগতে— এই বাড়িগুলির জটিল বোবা রেখা, ঐ জম্বুপুঞ্জে শ্যামবনান্ত, সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েটির ব্যক্তিরূপ যে-মেয়ে তাগায় তাবিজে ভয়ে উদ্বেগে বেঁধে রেখেছে নিজে এবং আপন জনকে— আধুনিক কবিতা চায় এই বাস্তব অভিধেয়টিকে আবছা ক'রে দিতে, সম্ভব হলে একেবারেই মু ফেলতে। তার কারণ আধুনিক কবিরা বিশ্বাস করেন যে (এবং মারিতঁ্যা সে-বিশ্বাস সমর্থন করেন) বাস্তব জগতের অংশবিশেষ যদিও ভাষার স্বাভাবিক অভিধা, তবু তা আড়াল ক'রে রাখে সেই পরম সত্তাকে যার আভাটুকু প্রতিবিম্বিত করা কবিতার

চরম লক্ষ্য। তাই চলিত কাব্যের দুই অর্থের মধ্যে প্রথমটিকে ছেঁটে ফেলতেই আধুনিক কবিরা কৃতসংকল্প।[৭]

কিন্তু কবি কেমন ক'রে এই অসাধ্যসাধন করবেন তা আমার ধারণার অতীত। তিনি নিজে যখন সেই পরম রহস্যঘন সত্তার আভাস পেয়েছেন প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরঙ্গ হয়েই, তখন কোন্ জাদুকাঠির স্পর্শে পাঠককে এক লাফে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ পার করিয়ে দিয়ে পরমের একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করাবেন? যে-পথে তিনি দৃশ্যলোক থেকে দৃশ্যাতীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন, মর্ত্য ও অমর্ত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, পাঠক সেই পথে তাঁর অনুগামী হতে পারেন, সহযাত্রী হতে পারেন, কিন্তু পথিকৃৎকে একেবারে টপকে যাবেন কোন্ মায়াবলে? এমনি এক আজগুবি কাণ্ড ঘটাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন র‍্যাঁবো, উপলব্ধি করলেন তাঁর সাধ কবিমাত্রের সাধ্যাতীত; চোখের সামনে দেখতে পেলেন, কবিতাকে যে-পথে তিনি হাঁটাতে চান তা কোনো রাজপথ নয়, একটি অন্ধগলি। সেই প্রবীণ উপলব্ধির তরুণ বেদনা জানিয়ে গেলেন তাঁর *A Season in Hell* কাব্যগ্রন্থে। আমরা পাঠকরা বঞ্চিত হলাম না, তবে এই ভেবে প্রবঞ্চিত যেন না হই যে র‍্যাঁবো কবিতার সামনে নতুন কোনো পথ খুলে দিয়ে গেছেন। কোনো পথ খোলা নেই জেনেই কুড়িতে পা দিতে-না-দিতে এই ব্যর্থকাম কবি কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন; বাকি জীবনটা তাঁর শুধু বন্ধ্যা নয়, বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া, শোচনীয়।

দেবদত্ত শক্তিতে মালার্মে র‍্যাঁবোর সমকক্ষ ছিলেন না হয়তো, কিন্তু সাধনা তাঁর অতুলনীয়—অন্তত কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারে। বোদলেয়রের মতো তিনিও দৃঢ়প্রত্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন যে কবির পক্ষে বহির্জগৎটা পরিহার্য। বরঞ্চ তাঁর পরিহরণ আরো চরমে পৌঁছেছিল, জগতের প্রতি কোনোরূপ বিক্ষোভ বা বিতৃষ্ণাও

তাঁর মনে, অন্তত মনের অভিব্যক্তিতে স্থান পায় নি। আদৌ বহির্মুখী ছিল না ব'লে তাঁর কাব্য বোদলেয়রের মতো অন্তর্মুখী হবে, এ-প্রত্যাশাও কিন্তু ভ্রান্ত। মালার্মের কবিতা ছিল জ্ঞানত, নিকামত, সংকল্পত শূন্যমুখী। গোড়া থেকে অবশ্য তা ছিল না; প্রথম জীবনে তিনি পরোৎকর্ষের, সুন্দরের, শুভের— অথবা এ-সবের প্রতীক, নীলাকাশের— প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। পরম সুন্দরের আকর্ষণ কিন্তু তাঁকে শুধু বিক্ষুব্ধই করল; সেই আকর্ষণকে সমূলে বিনষ্ট করতে চাইলেন একটি স্মরণীয় কবিতায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে যার শিরোনাম 'নীলিমা'। নীলাকাশকে ঢেকে দিতে ব্যাকুল হলেন প্রভাতের কুয়াশায়, প্যারিসের চিমনির ধোঁয়ায়; সোল্লাসে ঘোষণা করলেন— 'মরে গেছে মহাকাশ'। কিন্তু নীলিমা থেকে অব্যাহতি পাওয়া এত সহজ নয়, দীর্ঘতর তপস্যা-সাপেক্ষ। কাজেই 'বৃথা অব্যাহতি ভিক্ষা। নীলিমাই আবার বিজয়ী'। কিন্তু শেষ অবধি নীলিমাও হার মানল এ-কবির একান্ত সাধনার কাছে, 'সমুদ্রসমীর'ও স্তব্ধ হ'ল; নাবিকের গান আর মধুর শোনাল না, কোনো গানেই মাধুরীর লেশটুকু রইল না। 'রিক্ত কাগজের শুক্ল স্বগত সংযম' রইল কেবল তাঁর সম্মুখে প্রসারিত, কারণ তিনি সংকল্পবদ্ধ যে, তাঁর কবিতার খাতার শুভ্র পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করবেন না বাস্তব কোনো-কিছুর উল্লেখে। লিখতে না পারার বিক্ষোভ নিয়ে অবশ্য কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখলেন তিনি। বস্তুতপক্ষে তাঁর অর্ধেক রচনার (প্রথম পর্বের সব-কটি কবিতার) একমাত্র বিষয় তাঁর উষরতার বেদনা।

এই বেদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'ল শেষ জীবনে, মালার্মে আবিষ্কার করলেন অপর একটি কাব্যবিষয়, সত্যি কথা বলতে কি একটি নতুন কাব্যকৌশল, যার পরাকাষ্ঠা দেখা গেল তাঁর

সবচেয়ে পরিচিত ঈষৎ দীর্ঘ রচনায়—'ফনের দিবাস্বপ্নে'। কবিতাটি আরম্ভই হয় বাস্তবের ক্ষীণতম পটভূমিতে, একটি পৌরাণিক কাহিনীতে, কাহিনী-বর্ণিত স্বপ্নে। চার লাইন পরেই কিন্তু সেই-টুকু বাস্তবের ছোঁয়াও আর থাকে না, স্বপ্নটা ভেঙে-ভেঙে যায়, ধরাছোঁয়ার বাইরে চ'লে যায় স্বপ্নের বস্তুগুলি, যেন তারা একেবারেই কিছু না। শার্ল মোরঁ তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, মালার্মে গদ্যেপদ্যে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন কবিকর্ম হচ্ছে যে-কোনো-কিছু থেকে একেবারে কিছু-না-এর দিকে ডানা মেলে উড়ে চ'লে যাওয়ার কৌশলবিশেষ। মারিতাঁর অভিমত, মালার্মের কবিতা হচ্ছে 'an elaboration of pure artefact mirroring only the void'। এই অত্যাশ্চর্য কর্ম কিন্তু কেবল কাব্যরচনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয় না; মালার্মেও তা করতে পারেন নি। টীকা ভাষ্য গৌরচন্দ্রিকা ইত্যাদি দ্বারা সংবলিত না হলে দু-চারটি বাদে এই অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী কবির প্রায় সমস্ত রচনাই প্রহেলিকা থেকে যায়—গবেষণামূলক নিবন্ধ লেখার পক্ষে যতটা উপযুক্ত, রসাস্বাদনের পক্ষে তার সিকিভাগও নয়। শুনেছি মালার্মের এক-একটি ক্ষীণাঙ্গী কবিতার উপর মোটা-মোটা থিসিস রচনা ক'রে মার্কিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরেরা ডক্টরেট উপাধি পেয়ে থাকেন। 'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস, ওরে আমার গান?'

এলিয়ট বলেছিলেন আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় মামুলি অর্থটিকে ব্যবহার করেন পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য, যাতে বুদ্ধির পাহারা এড়িয়ে কবিতা সোজা হৃদয়ের গোপন কক্ষে প্রবেশ করতে পারে। ঘুম পাড়াবার শক্তি ছিল ভের্লেনের, য়েট্সের, পাস্তেরনাকের কবিতায়। কিন্তু স্বয়ং এলিয়ট, মালার্মে কিংবা ভালেরির কবিতা বুদ্ধির কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত হয়, অত্যন্ত সজাগ বুদ্ধিকে দুরূহ ও শ্রম-

সাধ্য গবেষণার কাজে ঠেলে দেয়; ততক্ষণ বরং হৃদয়বৃত্তিকেই ঘুমিয়ে থাকতে হয় বা একপাশে থমকে দাঁড়াতে হয়। বহুবিধ শাস্ত্র ঘেঁটে, অনেকদিন মগজ খাটিয়ে, শেষে যখন অর্থোদ্ধার হয় তখন ক্লান্ত কবিতার কি আর চলৎশক্তি অবশিষ্ট থাকে? কবিতা যদি প্রথম অভিঘাতেই পাঠকের হৃদয়ের সন্ধান না পায় তবে বুদ্ধি ও বিদ্যার অলিগলি ঘুরে শেষেও পাবে না।)

(কাব্যে আধুনিকতার পরবর্তী অধ্যায়টি আরো বিচিত্র। প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি অবজ্ঞা নিবিড়তর হ'ল, সর্বপ্রকার অভিধা পরিত্যাগ ক'রে কবিতার ভাষা আর ভাষাই রইল না, হয়ে উঠল বস্তুপুঞ্জ। এই বস্তুধর্মী অনচ্ছ ভাষা হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; বুদ্ধিগ্রাহ্য বা অবাঙ্মনসোগোচর কোনো-কিছুর দিকে রসিক চিত্তকে ধাবিত হতে দেবে না, বন্দী ক'রে রাখবে আপন রূপের বৈভবে, অভিভূত করবে কবির অভূতপূর্ব রূপদক্ষতায়। বাহিকা-শক্তি কবিতা একেবারে হারাবে না অবশ্য, তবে বহন করবে একটি-মাত্র অভিজ্ঞতা— কবিকৃত পরমাশ্চর্য শব্দবিন্যাসকে সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করবার অভিজ্ঞতা। ঐ অভিজ্ঞতাই পেতে চেয়েছিলেন কবি তাঁর সৃষ্টিকার্যে, সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতাই তিনি পাঠককে উপহার দিতে চান তাঁর প্রকাশিত রচনার মাধ্যমে।[৮] আধুনিক কাব্যের এই আত্মবিলোপকারী প্রবণতার আলোচনা পাওয়া যাবে বইয়ের উপান্ত্য অধ্যায়ে।

আর-একটি প্রবণতা হ'ল সুর্‌রেয়ালিজ্‌ম, বাংলায় নাম দেওয়া যাক পরাবস্তুবাদ। এর প্রভাবও পড়েছে হালের বাঙালি কবিদের উপর, ফরাশি পরাবস্তুবাদীদের সাক্ষাৎ পরিচয়ে ততটা নয় যতটা মার্কিন বীটনিকদের মধ্যস্থতায়। এঁরা বুদ্ধির তথা চৈতন্যের সীমানা অতিক্রম ক'রে ভাঙ, হশীশ, মেস্কালিন, ইথরাদির সাহায্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন অবচেতনার গহন আদিম অরণ্যে;

ভাবলেন সে-অরণ্য থেকে কবিতা বেরিয়ে আসবে বন্য হস্তীর মতো সামনে যা পাবে তাই ভেঙেচুরে— শুধু বুদ্ধি নয়, নীতি নয়, রীতি রুচি শালীনতা সব-কিছু তছনছ ক'রে। সন্দেহ করলেন না যে সবচেয়ে তলার যা, তার মূল্য সকলের উপরে হতে পারে না ; জেনেও জানলেন না যে তুচ্ছই সহজ, মহতের জন্য দীর্ঘ কঠিন সাধনার প্রয়োজন। বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার শক্তি যদি কারো থাকে তবে তিনি কোনো অজানা রহস্যালোকের সন্ধান পেতেও পারেন, কিন্তু বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধিপ্রভব বিনয়কে (ডিসিপ্লিনকে) এড়িয়ে গেলে যা পাওয়া যাবে তা কবিতা নয়, কাকলি, অটোম্যাটিক রাইটিং— মনোরোগীর রোগনির্ণয়ার্থে তার মূল্য থাকতে পারে, রসের বিচারে তা অপাঙ্‌ক্তেয়।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন কোনো যুগের সমাদৃত সাহিত্যে যে-মিথ্যা ধারণাগুলি শিকড় গেড়ে থাকে তার মিথ্যাত্ব বিষয়ে অবহিত হওয়া সে-যুগের মানুষের পক্ষে বেশ একটু কঠিন। বর্তমান যুগের হৃদয়মন-গ্রাস-করা মিথ্যাটি হ'ল অমঙ্গলের এবং কদর্যতার সর্বব্যাপ্তি। বোদলেয়র-পরবর্তী অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় কবি, গল্প-কার ও ঔপন্যাসিকের রচনায় যা-কিছু ন্যক্কারজনক তার প্রতি অখণ্ড মনোনিবেশ দেখে মনে হয় এঁরা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন—'"কদর্যেণ" বাস্যম্ ইদম্ সর্বম্ জগত্যাম্ জগৎ'। রোম্যান্টিকদের প্রমাদ সম্পর্কে আমরা এতই সচেতন যে, বেচারি কীট্‌সের বহু-উদ্ধৃতি-জীর্ণ সত্য ও সুন্দরের সমীকরণ মন্ত্রটিকে সংশোধিত করতে চাই তাকে উলটে দিয়ে (মার্কস্ যেমন হেগেল-দর্শনকে চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন তাকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে) ; বলি, যা কদর্য তাই সত্য, যা সত্য তাই কদর্য।

বর্তমানকালের চলতি মিথ্যা যেমন আমাদের চোখে সহজে ধরা দেয় না, তেমনি অতীত যুগের সাহিত্যসাধনা যে-সত্য থেকে

শক্তি সঞ্চয় করত সে-বিষয়েও সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মনকে অনেকখানি অসাড় ক'রে রাখে। সে-যুগটি যদি হয় দূর অতীতের তবে বাধা তত দুস্তর ঠেকে না, বরং দূরের বাত্তি একটু মিষ্টি শোনায় বইকি। মনের ব্যবধানকে আমরা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করি ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির উপর ভর ক'রে, পরিশীলন করি এমন রুচির যার সাহায্যে দু-এক শতাব্দী এমনকি দু-এক সহস্রাব্দী পূর্বের ভাব ও রস গ্রহণ করতে বাধা থাকে না। রবীন্দ্রনাথের যুগ অতীত, কিন্তু মাত্র তিন-চার দশক পূর্বে তা খুবই বর্তমান ছিল। এই নিকট-অতীতকে নিয়ে বিপদ ঘটে সাহিত্যে। সাহিত্যভোগী খোঁজেন আধুনিকতম শৈলী ও মেজাজ; সাহিত্যকর্মীও চান একেবারে নতুন কিছু ক'রে দেখাতে, নইলে তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের হাতে-হাতে প্রমাণ দেওয়া হয় না। আর সদ্য-নতুনকে চালু করতে গেলে প্রয়োজন দেখা দেয় যা চ'লে আসছে, যা হৃদয়-মন-নয়নকে হরণ ক'রে রেখেছে এতদিন, তাকে সরিয়ে ফেলার, অন্ততপক্ষে তার সম্মানের উচ্চাসনটাকে নামিয়ে দেবার (প্রাকৃত ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিবাঙ্কিং')। এটাকে কালের ধর্ম ব'লে মেনে নেওয়া যেত, বিশেষত এই ভরসায় যে রবীন্দ্রকাব্যের সত্য মূল্য বেশিদিন চাপা থাকবে না। কিন্তু আমার মন তাতে সায় দেয় না কারণ আমার বিশ্বাস, যদিও সর্বম্ ক্ষণিকম্ ক্ষণিকম্. তবু সৎসাহিত্যের মূল্যায়ন আর জড়োয়া গয়নার ফ্যাশানের অনিত্যতায় যে-জাতিভেদ আছে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখাই ভালো। বাজারী সাহিত্য তো রয়েছে, তার ফ্যাশান বদলাক, দাম উঠুক নামুক বছরে-বছরে। কিন্তু মহৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন আরো তন্নিষ্ঠ এবং দূরপ্রসারিত স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

১ বোদলেয়রের কবিতার আরো ভালো অনুবাদ রয়েছে। বাংলা ভাষাতেই বুদ্ধদেব বসুর অতি সুন্দর অনুবাদ হাতের কাছে ছিল। কিন্তু অনুবাদ সুন্দর হলে নিছক অনুবাদ থাকে না ; হয়ে ওঠে অনুসৃষ্টি (trans-creation)। অথচ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য একান্তরূপে বোদলেয়রেরই হার্দিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া। তাই মূলের নিকটতম অনুবাদ খুঁজতে হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদক ফ্রান্সিস স্কার্ফ।

২ সাহিত্যের পথে—'আধুনিক কাব্য', পৃ ১৪৪

৩ 'In effect, Hipster as Mailer describes him in *The White Negro* is a man who follows out the logic of the situation in which we are all presumably caught ; a man who, faced with the threat of imminent extinction and unwilling to be a party to the forces pushing toward collective death, has the courage to make a life for himself *in the only way that conditions permit* by pursuing the immediate gratification of his strongest desires at every moment and by any means.' (Norman Podhoretz in *Partisan Review,* Summer 1959.) আশ্চর্য মন্তব্য ! সম্ভাব্য সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেনিন, গান্ধী, শোয়াইৎসর অন্য এক জীবনের সন্ধান দিয়ে গেছেন। মেলারের গুণমুগ্ধ সমালোচকের দৃষ্টিতে এ-সব জীবনমার্গ বিবেচনার অযোগ্য ব'লে ঠাহর হ'ল কেন—পথিকৃৎরা বাস্তব-জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না, অথবা তাঁদের চরিত্রে সৎসাহসের অভাব ছিল ? মেলারের প্রিয়পাত্র হিপ্‌স্টররা কি এঁদের তুলনায় অনেক বেশি সত্যদর্শী এবং বীরবাহু ?

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৬৬

৫ 'Baudelaire invokes forces of faith or transcendence only in so far as they could be used as weapons against life or as symbols of escape.' (Auerbach—The Aesthetic Dignity of *Fleurs du Mal*)

৬ কবিতায় সত্যাসত্যের অর্থ ও স্থান বিষয়ে পরবর্তী কোনো কোনো অধ্যায়ে ('গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা' এবং 'সাহিত্যনীতি ও শ্রেয়োনীতি') কিছু আলোচনা পাওয়া যাবে।

৭ 'Modern poetry has undertaken completely to set free the poetic sense. In the double signification of the poem, it endeavours to extenuate, if possible, to abolish the intermediary signification, the *definite set of things* whose presence is due to the sovereignty of the logical requirements, of the social signs of language, and which is, as it were, a kind of wall of separation between the poetic intuition and the unconceptualizable flash of reality to which it points. The poem is intended to have, not a double, but a single signification—only this flash of reality captured in things.' (Jacque Maritain—*Creative Intuition in Art and Poetry,* Meridian paperback, p. 214)

৮ 'Stephane Mallarmé was without the personal mysticism of Baudelaire and Rimbaud and concentrated on the word as something which has symbolic value and evocative power in itself. Whatever assessment the critics accord to his poetic creation, it was undoubtedly responsible for an important development in poetic theory. For the poem came to be regarded no longer simply as an instrument by which the poet communicated to other men an experience of mystical revelation, but was itself the source of the mystical experience and the revelation to poet and reader alike.' (H. Osborne—*Aesthetics and Criticism*, Kegan Paul, p. 195)

অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ

১ উপক্রমণিকা

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে রচিত সমস্ত কবিতা যে একটি জীবন্ত বাড়ন্ত কাব্যশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ— টি. এস. এলিয়ট-এর এই উক্তি যেমন তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির তেমনি তাঁর কবিসুলভ অতিরঞ্জনপ্রিয়তারও পরিচায়ক। তৃতীয় শতকের তামিল কবিতার সঙ্গে ষোড়শ শতকের বাংলা কবিতার যদি-বা অতি সূক্ষ্ম কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, মঙ্গলকাব্য ও ক্যান্টারবারি টেল্‌সের মধ্যে, অথবা কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে নাড়ির যোগ খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু কোনো-একজন মহাকবির খণ্ডকবিতাসমূহকে একটি মহাকাব্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাবাই সংগত। নিজের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে য়েট্‌স্‌ এই ধারণা পোষণ করতেন এবং এরই বশবর্তী হয়ে তাঁর সমগ্র রচনাকে বার-বার নতুন ক'রে সাজান, কালক্রম অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য ক'রে সুষ্ঠুতর পাঠক্রম তৈরি করতে প্রয়াস পান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও অভিপ্রায়ও অনুরূপ ছিল, যদিও সেই অভিপ্রায়কে তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর ক্রমবিন্যাসে বাস্তব রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি তিনি। 'সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই— সেই তাৎপর্যটি কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপ পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজন করিয়া আসিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে-ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি সে-অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।' রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রমবিকাশে যে-অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিহিত সেদিকে লক্ষ্য

না রাখলে রবীন্দ্রনাথের কোনো-একটি কাব্যগ্রন্থের বা একটি বিশেষ পর্বের কবিতার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস।

কত বিচিত্র বিপরীত উপাদান দিয়ে ষাট বছরের অক্লান্ত সাধনায় গ'ড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রকাব্যের রাজপ্রাসাদ। অথবা বলা উচিত সৌধরচনা অসমাপ্তই রয়ে গেল কবির মৃত্যুকালে। উদাহরণত, মধুর রসের চর্চা তিনি করলেন সন্ধ্যাসংগীত থেকে মহুয়া পর্যন্ত, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে—যদিও এ-পর্বের সীমার মধ্যেও বিষাদের, বৈরাগ্যের বা তিক্ততার আমেজ কোথাও লাগে নি বললে ভুল বলা হবে। তবে যে-ভাবান্তরকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা', সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিশেষ-এ, কবির বয়স তখন সত্তর পেরিয়েছে। এবং মাত্র দশ বছর পর যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন 'শেষ লেখা'তেও সেই দীক্ষাগ্রহণের পালাই চলছিল। এই কবি-স্থপতির আরও অন্তত দশ বছর বেঁচে থাকা দরকার ছিল তাঁর কাব্যস্থাপত্যেরই অত্যন্ত প্রয়োজনে। কিন্তু তার পরে আবারও যে তিনি কোনো নতুনতর রাগিণীতে দীক্ষাগ্রহণ করতেন না, তা কি আমরা বলতে পারি? কবির সমগ্র সৃষ্টির বনভূমিসদৃশ পূর্ণতাকে খণ্ড রচনার পুষ্পতুল্য পূর্ণতার আদর্শে বিচার করা যায় না, তার একটা দিক মৃত্যুদিন পর্যন্ত খোলাই থাকবে। অসমাপ্তির মধ্যেও যে-পরিপূর্ণতা ব্যক্ত হয়েছে সেটাতেই আমাদের চোখকে অভ্যস্ত ও রসপিপাসাকে তৃপ্ত করতে না শিখলে চলবে কেন?

'জীবন ও কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একই ধারণা পোষণ ক'রে গেছেন আর তাঁর পক্ষে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক ভাবা যেতে পারে'[১]—বুদ্ধদেব বসুর এ-মত আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের

সাধনা যেমন অক্লান্ত ছিল, পরিণতিও তেমনি অ-চূড়ান্ত। বিরাম-চিহ্ন দেখা যায় মাঝে-মাঝে কিন্তু গতিরোধ ঘটে নি শেষ দিন পর্যন্ত ; পদে-পদেই তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন, যদি-বা কখনো ফিরে এসেছেন পূর্বপদে, সে-প্রত্যাবর্তনটাও ঘোরানো সিঁড়ির মতন উপরের দিকে উঠে গেছে, একই জায়গায় পাক খায় নি। তাঁর কাব্যের আঙ্গিকগত পরিবর্তনের বিচার করতে আমি চেষ্টা করব না, কারণ সেটা আমার পক্ষে হবে অনধিকার চর্চা। কিন্তু তাঁর 'অ্যাটিটিউড টু লাইফ'[২] বা আরও বড়ো ক'রে দেখলে তাঁর সমগ্র জগৎদর্শনের একাধিক রূপান্তর এবং ক্রম-পরিণতি আমার চোখে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে সে-বিষয়ে কিছু বলব পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিবর্তন তাঁর অমঙ্গলবোধেরই প্রকারভেদ-প্রসূত না হলেও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে এই 'সুন্দর ভুবন'কে ভালো-বেসেছিলেন, তবে বিশ্বের সৌন্দর্য যে একটি শতদল পদ্মের মতো নিখুঁত নিটোল নিষ্কলুষ সৌন্দর্য নয়— এ-উপলব্ধি তাঁর ক্রমশ গভীর হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর ভালোবাসাও প্রাজ্ঞ এবং কঠিন হয়েছে। তবু তা কখনও শিথিল হয়ে যায় নি, তাতে এমন কোনো ফাটল ধরে নি যা বিশ্বকবিকে[৩] মুহূর্তের জন্যেও বিশ্ববিমুখ ক'রে দিতে পারত। যে-ভাষায়, যে-ভাষাবৈচিত্র্যে, এই অক্ষয় ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘজীবন ভ'রে প্রকাশ করেছিলেন তা হয়তো আজ কোনো-কোনো সমালোচকের অত্যাধুনিক দৃষ্টিতে তার পূর্ব দীপ্তি হারিয়েছে 'অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে'— কবি স্বয়ং যেমন অনুমান করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে-ভরসা মনে পোষণ করতেন তাও সত্যি— 'আমার সে ভালবাসা / সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে।'

আজ বাংলাদেশে আমরা সেই ক্ষয়ক্ষতির যুগে বাস করছি যে-যুগ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুরাগকে— এক কথায় তাঁর (এবং প্রাক্‌-বোদলেয়র য়োরোপীয় কবিদেরও) যাবতীয় ধনাত্মক বর্ণাঢ্য মনঃপ্রতিন্যাসকে বেশ খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখে। তবু সে-অনুরাগ টিঁকে থাকবে ; না যদি টেঁকে তা হলে কবিতা বাঁচবে কী নিয়ে ?

জগতের মধ্যে যা-কিছু শুভ, সুন্দর ও প্রাণস্ফূর্ত, রবীন্দ্রকাব্যে তার প্রকাশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত ও অনবচ্ছিন্ন। পরিবর্তন ঘটেছে ভাষায়, ভঙ্গিতে, অনুষঙ্গে, অনুপুঙ্খে ; কিন্তু তাঁর কাব্যের এই মূল উৎস কখনও শুকিয়ে যায় নি। এ নিয়ে কোনো তর্কের অবকাশ আছে ব'লে আমার মনে হয় না। কিন্তু অবকাশ না থাকলেও তর্ক উঠেছিল। কবি স্বয়ং চিত্রার ভূমিকায় লিখেছেন, 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা ক'রে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার ক'রে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ-কেউ আমায় দিয়েছেন।' য়েট্‌স্‌ও দিয়েছিলেন, গীতাঞ্জলি-আবিষ্কারের প্রথম উচ্ছ্বাস উপশমিত হলে। এ-অপবাদকে রবীন্দ্রনাথ 'আমার প্রতি অবিচার' বলেছেন ; অপ-ব্যাখ্যাও বলতে পারতেন। কারণ উপনিষদের প্রভাব তাঁর কাব্যে গভীর হলেও, উপনিষদের ব্রহ্মই বলুন, ভক্তের ভগবানই বলুন আর তাঁর স্বকীয় জীবনদেবতাই বলুন, কাউকেই তিনি মানুষ ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক বিমূর্ত জগতোত্তীর্ণ সত্তারূপে দেখেন নি। দেখেন নি ব'লে নিঃসংকোচে দাবি করতে পেরেছেন : 'আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার গদ্য ও পদ্য রচনাকে চালনা করতে পেরেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।'

উপরের অপব্যাখ্যা সহজেই অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য একটি অপবাদ আজকের দিনে আরও নিঃসংশয়ে উচ্চারিত হচ্ছে, এবং রবীন্দ্রকাব্যের বহু অনুরাগী পাঠকের চিত্তে সংশয় জাগিয়েছে। জগতের 'বিচিত্র রূপ' কি আপন সম্যক বৈচিত্র্যে ধরা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখে, না কি তিনি কেবল তার শুভ ও সুন্দর দিকটাই দেখেছেন, কদর্য ও বীভৎসের সঙ্গে হয় তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নি অথবা ঐ ধরনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে অপাঙ্‌ক্তেয় বিবেচনা ক'রে সজ্ঞানে সযত্নে পরিহার করলেন তাঁর কবিকর্ম থেকে? এ-আপত্তি সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না, দু-কথায় তার উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়; তাই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি। সে-আলোচনাকে একটি বিতর্কের প্রত্যুত্তর জ্ঞান না ক'রে রবীন্দ্রকাব্যের এই দিকটাকে বুঝে দেখবার চেষ্টা মনে করলে আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না।

প্রশ্নটা হচ্ছে—রবীন্দ্রকাব্যে sense of evil (যার বাংলা করেছি অমঙ্গলবোধ) কি সত্যিই অনুপস্থিত বা অত্যন্ত ক্ষীণ? আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় যে মাত্রায় অল্প এবং গুণে স্বতন্ত্র তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। আগের অধ্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি আধুনিক সাহিত্যে অমঙ্গলবোধ স্বাভাবিক বা যথাযথ নয়, সযত্নচর্চিত, মাত্রাজ্ঞানরহিত। কদর্যের দিকে, দুঃখ ও পাপের দিকে, আধুনিকেরা মোহমুক্ত চোখে তাকাতে পারেন নি; কোমর বেঁধে রোম্যান্টিকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে তাঁরা কেবল বিরুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় রোম্যান্টিক হয়ে উঠলেন।

মুশকিল হয়েছে এই যে গীতাঞ্জলি-পর্বের কবিতায় (অর্থাৎ

নৈবেদ্য থেকে গীতালি পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলিতে) যে-বিশেষ ধরনের হৃদয়ানুভূতি ও মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনদর্শন ব'লে ধ'রে নিতে অভ্যস্ত। নৈবেদ্যের প্রথম কবিতার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি ('প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী / দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে') উদ্ধৃত ক'রে প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন: 'রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রদর্শন রবীন্দ্রজীবনের মূলকথা এই অহেতুকী ঈশ্বর-নির্ভরতা।'[৪] প্রমথ-নাথ বিশীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও শিল্প নিয়ত পরিবর্তনশীল, নানাবিধ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা গিয়াছে— কিন্তু একটি বিষয়ে কখনো তাহাদের পরিবর্তন ঘটে নাই··· বিশ্ববিধানের পরিণাম মঙ্গলময়, বাহ্য দুঃখ-কষ্ট ও অমঙ্গল উদারতর দৃষ্টিতে শুভেরই ছদ্মবেশ, বিশ্বব্যাপারে যিনি কর্তা তিনি আনন্দ ও কল্যাণস্বরূপ এবং তিনি একম্।'[৫] শুধু প্রাচীনপন্থীরা নন, আধুনিক সাহিত্যের মেজাজ ও রীতির শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি বুদ্ধদেব বসুও লিখেছেন যে গ্যেটের মতো রবীন্দ্রনাথও জীবনের শুভত্ব বিষয়ে সর্বদা নিঃসংশয় ছিলেন, উপরন্তু গ্যেটে অপেক্ষা 'রবীন্দ্রনাথে বিশ্বাসের ঘোষণা অধিকাংশ স্থলেই নির্দ্বন্দ্ব'[৬] (আগের উদ্ধৃতিতে আমরা জানতে পেরেছি যে বুদ্ধদেবের মতে জীবন ও কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আজীবন একই ধারণা পোষণ করতেন)। অতি আধুনিক সমালোচকরাও পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং সেইখানে তাঁদের নালিশ— রবীন্দ্রনাথ জগৎকে বড়ো বেশি সুন্দর এবং শুভ, অর্থাৎ কল্যাণস্বরূপ ঈশ্বরের সুব্যবস্থিত রাজ্যরূপে দেখেছেন, তার পাপপঙ্কিল, বেদনাদগ্ধ, বিশৃঙ্খল ও বীভৎস চেহারাটা তাঁর চোখে ধরা দেয় নি।

ধরা দিয়েছিল ঠিকই, তবে চোখে যতটা ধরা দিয়েছিল কাব্যে

ঠিক ততটা স্থান জোড়ে নি। কেন জোড়ে নি তা "শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি" শীর্ষক পরবর্তী একটি অধ্যায়ে স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা করব। কিন্তু জীবনের কঠোর ও কদর্য দিকটা রবীন্দ্রকাব্যে একেবারে অপ্রকাশিত কিংবা প্রকাশ তার এতই সংকুচিত যে রবীন্দ্রনাথকে কেবল মধুর রসের বা ভক্তিরসের কবি ভাবা যায়, এ-ধারণা খুবই বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি-বিষয়ে কিছু বলা দরকার, কারণ এটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যেমন অবিচার তেমনি আধুনিক পাঠককে অকারণে বঞ্চিত করছে রবীন্দ্রকাব্যের সম্যক রস-সম্ভোগ থেকে, শাশ্বতকে বিগত ভাববার মতো সংকীর্ণ মন তৈরি ক'রে দিচ্ছে।

১ বুদ্ধদেব বসু— প্রবন্ধ-সংকলন (ভারবি), পৃ ৬

২ 'His verse changed externally, as it had many times before, but neither in his attitude to life nor in the use of language did he outgrow himself.'—Buddhadeva Bose—*Tagore, Portrait of a poet*, (University of Bombay, 1962) p. 25

৩ পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁকে মহৎ কবি ব'লে শ্রদ্ধা করে—এই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা অতিশয়োক্তি এবং তাঁর স্বদেশবাসীর মুখে শোভা পায় না। তবে সমগ্র বিশ্ব বিষয়ে চেতনা ও অনুভূতির গভীরতা তাঁকে প্রকৃত অর্থে এবং সম্ভবত অতুলনীয় রূপে 'বিশ্বকবি' করেছিল।

৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ ১৮

৫ প্রমথনাথ বিশী— রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ ৫৪

৬ বুদ্ধদেব বসু— প্রবন্ধ-সংকলন (ভারবি), পৃ ৭

২ প্রাক্‌-মানসী রচনা

কড়ি ও কোমল-এর মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কেন বললেন যে 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে', তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। যে-বিপুল উদ্বেল অভিজ্ঞতার কথা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" ব্যক্ত হয়েছে এবং গদ্যেও যার বর্ণনা একাধিক জায়গায় পেয়েছি আমরা, সেই স্বপ্নভঙ্গের সময় থেকেই জগৎচরাচরের বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রভাতসংগীত এবং ছবি ও গান-এর চেয়ে বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা কড়ি ও কোমলে অধিকতর পরিস্ফুট ব'লে তো মনে হয় না। সন্ধ্যাসংগীতে অবশ্য তিনি বড়ো বেশি আত্ম-নিমজ্জিত ছিলেন, একটি সাময়িক বিচ্ছেদের ব্যথাকে সযত্নে লালন ক'রে যেন সেই দুঃখবিলাসেই ডুবে ছিলেন। অথচ একই সময়ে লেখা "অকারণ কষ্ট" নামক প্রবন্ধে দেখা যায় যে তিনি অহেতুকী দুঃখভোগীদের প্রতি কটাক্ষ করছেন। অবশ্য কাদম্বরী দেবী কবির জীবনে বাল্যকাল থেকে এত নিবিড় ও পরিব্যাপ্ত স্থান অধিকার ক'রে ছিলেন যে তাঁর সাময়িক বিচ্ছেদের দুঃখকেও তিনি অহেতুকী না মনে করতে পারেন। তবে এ-কথাও ঠিক যে উনিশ শতকী বাইরনিক বিষাদ এবং জার্মান রোম্যান্টিকদের জাগতিক বেদনা তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনের উপরেও ছায়া ফেলেছিল। এই কালোচিত প্রগাঢ় বিষাদ এবং বিষণ্ণ আত্ম-নিমগ্নতা থেকে নিষ্ক্রমণের কাব্য প্রভাতসংগীত। সন্ধ্যাসংগীতে দুঃখের আসন ঢালাও ক'রেই পাতা হয়েছিল, নইলে মাস দুয়েকের জন্য বউঠাকরুন (তা তিনি যত গভীর অন্তরবাসিনী মানসী-প্রতিমাই হোন না কেন) কোথাও বেড়াতে গেলে কি

সে দুঃখের প্রকাশ এমন উদ্বেল ভাষায় সম্ভব :

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার, শুধু বলিতেছে,
'চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দ'লে গেল গো।'

বছর তিনেকের মধ্যে কিন্তু সে চিরতরেই চ'লে গেল। প্রিয়জনের স্বাভাবিক, অল্প বা দীর্ঘকালের কঠিন পীড়ার পর প্রত্যাশিত মৃত্যুর জন্য আমরা কতকটা প্রস্তুত থাকি, তার আঘাত সহ্য করবার শক্তি আগে থেকেই কিছুটা সঞ্চয় করা থাকে। আপতিক মৃত্যু অনেক বেশি মর্মান্তিক। ছাব্বিশ বছর বয়সে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা চব্বিশ বছরের রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে কত বড়ো বজ্রাঘাত তা কোনো সাহিত্যানুরাগী বাঙালীর অজানা নেই। এই বুকভাঙা শোকের ছায়া পড়েছে কড়ি ও কোমলে। তারই গভীর থেকে গভীরতর, কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ, কখনো বা অনভিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারে এমনই সূক্ষ্ম প্রকাশ কড়ি ও কোমল থেকে একেবারে শেষ পর্বের কাব্য পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে। চিত্রার "সন্ধ্যা", উৎসর্গের "আলো নাই, দিন শেষ হল," পূরবীর "শেষ অর্ঘ্য", বীথিকার "কৈশোরিকা", শ্যামলীর "মিল ভাঙা", সানাই-এর "আসা-যাওয়া"— এমনি কত অবিস্মরণীয় কবিতাই এই শোককে এবং শোকমাত্রকে শাশ্বত মহিমায় উজ্জ্বল ক'রে এঁকে দিয়েছে আমাদের চিত্তে।

কড়ি ও কোমলে এই বেদনা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে অন্য একটি সুরও বেজে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

ক'রে বলেছেন, এখানে 'প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে-অন্তরে বার-বার প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

কড়ি ও কোমলে দুটি বিপরীত ঠাটের রাগিণী একই সঙ্গে বেজে উঠেছে— জীবনের জয়গান এবং 'মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি' —সে-কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলীর সূচনায় বিশেষরূপে জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দুটি সুরই আমরা রবীন্দ্রকাব্যের গোড়া থেকে শুনতে পাচ্ছি, কড়ি ও কোমলে কোনোটাই প্রথম বেজে ওঠে নি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে কালানুক্রমে প্রথম শোনা গেল দুঃখের সুর, তাঁর সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ সন্ধ্যাসংগীতে। সুন্দর ভুবনকে সানন্দ উচ্ছ্বাসে গ্রহণ করার বার্তা ঘোষিত হ'ল দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন প্রভাতসংগীতে, অর্থাৎ সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার এল আগে, তার পরে প্রভাত হ'ল, গুহার আঁধারে দেখা দিল 'পথহারা রবির কর'। এই দুটি কড়ি ও কোমল সুর কড়ি ও কোমল নামক একই কাব্যগ্রন্থে মিলিত হয়েছে— এই পর্যন্ত। দুঃখ ও মৃত্যুর উপলব্ধি কী ভাবে কবির মনে জীবনের প্রতি উচ্ছ্বাস এবং প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগকে প্রভাবিত করেছে, কেমন ক'রে তাঁর জীবনদর্শনকে স্বপ্নালুতা ও ভাবাবেগপ্রবণতা থেকে মুক্ত ক'রে ক্রমশ গভীর, কঠিন, আত্মসচেতন ও আত্মকৌতুকময় করেছে— সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যকে তার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত ভাবা যেতে পারে।

কড়ি ও কোমল কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত বই, এবং মাত্র দু-বছর পরে প্রকাশিত। এত বড়ো শোকের অভিঘাতে মন যদি তিক্ত হয়ে থাকত তবে এই কাব্যগ্রন্থেই তা

সবচেয়ে দুর্নিবাররূপে দেখা দিত। অথচ তিক্ততা এখানে লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত— শোকের কবিতা থেকেও অনুপস্থিত। বরঞ্চ সুন্দর ভুবন এবং ভুবনবাসীদের প্রতি ভালোবাসার সুস্পষ্ট প্রকাশ এ-বইখানিকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে আমাদের কাছে। তবু দু-এক জায়গায় একটু খটকা লাগে। ইন্দিরা দেবীকে একটি ছন্দে লেখা চিঠিতে কবি বলেছেন :

জেনো মা এ সুখে-দুঃখে আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না, কোরো না অবিশ্বাস।

বারো-তেরো বছরের মেয়ের মনে যতই অভিমান জাগুক, তার ফলে সে নাস্তিক হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনার কথা ভাবা একটু বাড়াবাড়ি। শোকবিহ্বল তরুণ রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে নিজেকেই বোঝাচ্ছেন না তো যে জগতের উপর যতই অভিমান হোক, 'অনন্ত তাঁহারে' যেন অবিশ্বাস না করেন? অবিশ্বাসের অঙ্কুর কি মনের নিভৃত কোনো কোণে ছোটো দুটি পাতা মেলেছিল? যে-বিশ্বাস হারাবার আশঙ্কা এখানে অনুমান করা যায় তা কিন্তু তখনও আপ্ত; একান্ত স্বকীয় উপলব্ধিজাত ঈশ্বরচেতনা ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মনে পরিস্ফুট হয় নি। কড়ি ও কোমল-এর কবি নিশীথের অন্ধকারে সর্বশঙ্কাহরা উষার অরুণালোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন :

হায় হায় কোথা সে অখিলের জ্যোতি
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি।

হৃদয় ডেকে ওঠে কিন্তু সাড়া নেই ত্রিভুবনে :

কে শুনেছে শতকোটি হৃদয়ের ডাক
নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অবাক।

মানসীই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ যাতে 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'। ভাবের কুয়াশা কেটে গেছে, ভাষার পেশী শক্ত হয়েছে, হৃদয়াবেগ ঈষৎ সংযত, প্রকাশে অতি-বিস্তার নেই— যদিও পরিণত বয়সের সংহতি এখনও অনায়ত্ত। তিন বছর ধ'রে লেখা কবিতা এ-বইখানিতে স্থান পেয়েছে, তাই ভাববৈচিত্র্য এখানে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের চেয়ে বেশি। মোটামুটি বলা যায় তিন প্রকার ভাবধারা বয়ে চলেছে তিন রকমের বিষয়কে অবলম্বন ক'রে— প্রকৃতি, নারী ও স্বদেশ। প্রেমের কবিতাই মানসীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়বস্তুটিকে উপলক্ষ্য ক'রে রচিত কবিতাগুচ্ছ— "নিষ্ঠুর সৃষ্টি", "প্রকৃতির প্রতি", "সিন্ধুতরঙ্গ", "শূন্য গৃহে", "জীবন-মধ্যাহ্ন" প্রভৃতি— এই বইকে অন্য দিক থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এগুলি রবীন্দ্রকাব্যের ব্যতিক্রম[১] নয়, একটি স্বতন্ত্র ধারা। প্রভাতসংগীত থেকে, অর্থাৎ বলতে গেলে কাব্যরচনার সূত্রপাত থেকেই, এ-ধারার শুরু। এবং শেষ পর্বের কবিতায় তো এই 'ব্যতিক্রম' নিয়মকে সংখ্যায় না হলেও অনুভূতির প্রবলতায় ছাড়িয়ে গেছে প্রায়।

"নিষ্ঠুর সৃষ্টি" এবং "শূন্য গৃহে" একই ভাবের কবিতা, প্রকাশের রীতি ভিন্ন। প্রথম কবিতাটিতে সৃষ্টিকে বলেছেন খামখেয়ালী, উৎশৃঙ্খল :

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা

আর দ্বিতীয় কবিতার নালিশ বিশ্বের লৌহকঠিন নির্মম নিয়মের

বিরুদ্ধেই :

জীবন নির্ভরহারা   ধুলায় লুটায়ে সারা
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম।
...   .
সমস্ত মানবপ্রাণ   বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা!

কিন্তু দুটি কবিতার মূল বক্তব্য একই— সৃষ্টি নিষ্ঠুর, অসহায় মানুষের পক্ষে যন্ত্রণাই সার, প্রকৃতি বা প্রকৃতির স্রষ্টার বুকে দয়ামায়া সমবেদনার লেশমাত্র নেই। প্রথম কবিতাটির সবচেয়ে জোরালো উক্তি— 'আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করিছে বধির'— দ্বিতীয় কবিতাটিতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা ?

"সিন্ধুতরঙ্গে"র নাস্তিকতা আরও বেদনা-বিক্ষুব্ধ। কবিতাটি এক নিদারুণ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে লেখা। বঙ্গোপসাগরে দুইখানি পুরী-তীর্থযাত্রী স্টীমার প্রবল ঝড়ে প'ড়ে ডুবে যাওয়াতে নারীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মন যদি 'তিক্ত' হয়েই থাকে তবে সাড়ে-সাত শ' তীর্থযাত্রীর অসহায় মৃত্যু কি তার যথোপযুক্ত কারণ নয়? তাঁর সংবেদনশীল মনে এই দুর্ঘটনার অভিঘাত অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল, সমস্ত ঐশী বিধিবিধানের বিরুদ্ধে তিনি যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। এমন স্পষ্ট ঈশ্বর-বিদ্রোহের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে কখনো লেখেন নি :

নাই তুমি, ভগবান,   নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস।

শেষ স্তবকে শুধরে নিয়ে বলছেন, দয়া যে একেবারে নেই তা নয়,

যদি না থাকত তবে 'এমন জড়ের কোলে' নির্ভয়ে নিখিল মানব কেমন ক'রে বাঁচত? দয়ামায়া অবশ্যই আছে, কিন্তু তার মাঝখানে ক্ষণে-ক্ষণে দৈবের দারুণ আঘাতও এসে পড়ে:

পাশাপাশি একঠাঁই   দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
…   …   …
জড় দৈত্য শক্তি হানে,   মিনতি নাহিক মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
একি দুই দেবতার   দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয়?

কল্পিত শুভ ও অশুভ দুই দেবতার নিত্য সংগ্রামের উপমার দ্বারা যে-ট্র্যাজিক উপলব্ধিটি ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যে আরো লক্ষণীয়, যেমন লক্ষণীয় মধ্যবর্তী ভক্তিপর্বের কাব্যে তার তিরোভাব।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন মানসীর প্রেমের কবিতার মধ্যে ঈশ্বরের জন্ম-কথা লেখা আছে— 'মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে— সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে শেষ হবে কি?' শেষ হবার ইতিহাস আমরা পাব নৈবেদ্য, উৎসর্গ ও খেয়ায়। অসম্পূর্ণ প্রতিমাটিও ধীরে-ধীরে পর্যায়ক্রমে তৈরি হয়েছিল মানসীতে। ঐ বইখানির প্রেমের কবিতাগুলিতে অতৃপ্তি বিষাদ ও নৈরাশ্যের ঘন ছায়া পড়েছে এটা কারও দৃষ্টি এড়াতে পারে না; সে-ছায়া সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন বিশ বছরের প্রমথ চৌধুরী, মানসী প্রকাশের অব্যবহিত পরেই। অতৃপ্তি ও বিষাদের 'মূলটা কোনখানে' প্রমথ চৌধুরীর পত্রোত্তরে এ-প্রশ্ন কবি নিজেই তুলে তার উত্তর

দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরটা এইরূপ : 'এক-একবার আমার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে টানছে, আর-একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে··· একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর-একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাসীন্য।' ভাবুক-সত্তা ও কর্মী-সত্তার অন্তর্বিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অবশ্যই ছিল, কখনো এক পক্ষের সাময়িক বা আপেক্ষিক প্রাধান্য দেখা যায়, কখনো অন্য পক্ষের ; কোনো পক্ষই চূড়ান্ত পরাভব স্বীকার করে নি শেষ পর্যন্ত। এ দুই পরস্পরস্পর্ধী সত্তার স্বাক্ষর রবীন্দ্রকাব্যে ছড়ানো রয়েছে, তার পরিচয় আমরা পাবো "শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি" শীর্ষক অধ্যায়ে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বই যে মানসীর প্রেমের কবিতাগুলির নৈরাশ্য ও বিষাদের মূল কারণ তা আমার মনে হয় না। অন্য পথে সে-কারণের সন্ধান করতে হবে আমাদের।

কবি-প্রেমিক তাঁর প্রেয়সীতে দুটি গভীরতর সত্যের সন্ধান করছেন। প্রথমত, তিনি খুঁজছেন সমগ্র মানুষটিকে, অথবা আরো একটু বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায়, শারীরিক রূপলাবণ্যে অতৃপ্ত হয়ে[২] তিনি খুঁজছেন শরীরের অন্তরালে যে-আধ্যাত্মিক সত্তা লুকানো আছে, যে-'আত্মার রহস্য-শিখা' কাঁপছে, তাকে। এ-সন্ধান, এ-ক্রন্দন, বৃথাই হবে তা তিনি জানেন। কিন্তু এই ব্যর্থতা কি কোনো নিরুদ্দেশ যাত্রার অনন্ত পথ খুলে দিতে পারবে ? হয়তো পারবে। তার ক্ষীণ আভাস পাই আমরা "নিষ্ফল কামনা" নামক সুপরিচিত কবিতাটিতে—যদিও যে-ব্যর্থ সন্ধানের বেদনা কবি সেখানে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা কতকটা

চাপা প'ড়ে গেছে উপদেশ-বাণীর অযথা ভারে। দ্বিতীয়ত, কবি-প্রেমিক সন্ধান করছেন তাঁর প্রেয়সীর মধ্যে এমন এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য যা তার মানবিক সত্তাকে ছাপিয়ে বহুদূরপ্রসারিত, দেশ-কালের সীমানাকেও যেন ছাড়িয়ে। বাস্তব প্রিয়া যেন মানসী প্রিয়ার অর্ধস্ফুট রেখাচিত্র। একটি সুন্দর শরীরের মধ্যে আত্মার কম্পমান দীপশিখা শুধু নয়, প্রেমিক খোঁজে একটি মূর্ত ব্যক্তি-স্বরূপের যবনিকার অন্তরালে যে-বিমূর্ত অখণ্ড অনন্ত সুন্দরের আভাস মাঝে-মাঝে তার চোখে ঝলকে ওঠে, তাকেই। এ-খোঁজার কোনো শেষ নেই, এ-যাত্রার কোনো পথ জানা নেই তার, তবু—

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন-তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস।

প্রেমিক তার মানুষী প্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গভীর ব্যথা ও অসম্ভব আশা বুকে ধারণ ক'রে বেরিয়ে পড়ছে তার মানসীর সন্ধানে। 'সংসারের খেলাঘরে' যে-খণ্ডিতাকে ছেড়ে এল আর 'সর্বপ্রান্ত দেশের'ও পরপারের যে-পূর্ণার দিকে সে 'নিরুদ্দেশ-মাঝে' ভেসে চলেছে, এ-দুজনের বিপরীতমুখী টানে তার বক্ষ বিদীর্ণ। মানসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "বিদায়ে" এই ব্যথার প্রকাশ আশ্চর্য সুন্দর। কবিতাটি অবশ্য মানুষী প্রিয়াকেই সম্বোধন ক'রে লেখা, এবং আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, কবির মনে মানসীকে পাওয়ার ব্যাকুলতা যতখানি তার চেয়ে এই গৃহকর্মরতা রক্তমাংসের মানুষটিকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনা অনেক বেশি গভীর :

অবশেষে যবে একদিন,
বহুদিন পরে, তোমার জগৎ-মাঝে

সন্ধ্যা দেখা দিবে— দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপনসমান
চিররৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেই দিন এইখানে আসিয়ো আবার।
এই তটপ্রান্তে ব'সে শ্রান্ত দু নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যা-তারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে; সারা রাত্রি ধ'রে
তোমার সে জনহীন বিশ্রামশিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।
এক ধারে সাগরের চির চঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুট ধ্বনি— রহস্য অপার—
অন্য ধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

মানসীর বিষাদ ও নৈরাশ্য সোনার তরীতে আরও ঘন হয়েছে। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের বিষয়গুলির এখানে পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তবে মানুষের—সাধারণ মানুষের—আরও কাছা-কাছি এসেছেন কবি। সেই সঙ্গে কিন্তু নিরুদ্দেশের জন্য মন আরও চঞ্চল ও ব্যাকুল। অবিরাম তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতোই 'অলক্ষ্য সুদূর-তরে' অজানা বেদনা ও প্রত্যাশা কবির হৃদয়কে

এবং সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়কে অশান্ত ক'রে রেখেছে :

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা। জানো কি, তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে।

("সমুদ্রের প্রতি")

আদি জননী সিন্ধুর কাছ থেকে যখন ব্যথিতা কন্যা বসুন্ধরা 'সান্ত্বনার বাক্য অভিনব' শুনতে চাইল, তখন কবি ভাবতে পারলেন না চিরপুরাতন বাক্য 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা' ছাড়া আর কী বলা সিন্ধুর পক্ষে সম্ভব—নিরুপায় মাতা যেমন অত্যন্ত পীড়িত সন্তানকে কেবল ঘুম পাড়িয়েই শান্ত করতে চায়। এটি কবিতার দুর্বল উপসংহার নয়[৩], কবি তখনও জানেন না দুঃখিনী বসুন্ধরাকে কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা দেওয়া যায়। গীতাঞ্জলির ভগবান তখনও অনুপলব্ধ।

'পীড়ায় পীড়িত··· বিকারের মরীচিকা-জালে' দিশাহারা ধরাভূমি থেকে পলায়নী-ভাবানুপ্রাণিত কবিতা "মানস-সুন্দরী"। খুব উঁচুদরের কবিতা না হলেও রবীন্দ্রমানসে ঈশ্বরচেতনার বিকাশ বুঝতে হলে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যাঁকে সম্বোধন ক'রে লেখা তিনি স্বয়ং কাব্যলক্ষ্মী, 'আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার কবিতা', কিন্তু 'কবিতা' অনিবার্যত, প্রায় অলক্ষ্যত, ইহলোকের এবং লোকোত্তর সৌন্দর্যের ও সুরসংগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। মানস-সুন্দরী যদিও নারীরূপে, 'প্রণয়-বিধুরা সীমন্তিনী'রূপে কল্পিত, তবু প্রকৃতপক্ষে তা নিরাকার এবং নিঃসীম। তবে একে পরোৎকর্ষের (ইংরেজি পার্ফেকশান-এর) কল্পরূপ বললে ঠিক বলা হবে না,

কারণ শ্রেয়ের আদর্শ এখানে স্পষ্টরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কবি এখানে সেই সৌন্দর্যের পূর্ণতাকেই খুঁজছেন নারীর দেহমনের লীলায়, প্রকৃতির বর্ণগন্ধের বৈভবে যা অর্ধস্ফুট; মহত্ত্বের সে-পরমতার কথা ভাবছেন না বীরের কঠিন তপস্যায় ও মৃত্যুবরণে যা আংশিক অভিব্যক্ত।

সোনার তরীর সবচেয়ে প্রখ্যাত ও আলোচিত কবিতা যদিচ প্রথম কবিতাটিই, সবচেয়ে স্মরণীয় এবং আমার মতে সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ কবিতা—"নিরুদ্দেশ যাত্রা"—স্থান পেয়েছে একেবারে শেষে। পরবর্তী মরমিয়া পর্বের—খেয়া-গীতাঞ্জলি পর্বের—ছোঁয়া লেগেছে এই কবিতায়, তবু ভক্তিরস এখনো অনুৎসারিত, ঈশ্বরের পদধ্বনি এখনো স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। যিনি এসেছেন তিনি মানস-সুন্দরীই, তবে তিনি খুব কাছে এসে পৌঁছেছেন এবং কবির সোনার তরীর হাল ধ'রে বসেছেন। "মানস-সুন্দরী" নামক কবিতাটিতে যদিও তাঁকে অতি মধুর অন্তরঙ্গ সম্বোধনে ডাকা হয়েছিল ('প্রথম প্রেয়সী' 'সীমন্তিনী' ইত্যাদি) তবু তিনি ছিলেন অনেক দূরে, অধরা, অমর্ত্যবাসিনী। আর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় তিনি মুখোমুখি সমাসীনা, তবু তিনি 'অপরিচিতা', 'বিদেশিনী', কোনো কথা না ব'লে শুধু হাসেন, শুধু অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দেন যে-দিকে 'অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি'। রাত্রির ছায়ায় রহস্যের বাতাবরণ আরও নিবিড় হয়ে উঠছে, মনে হয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমুদ্রের মাঝখানে মস্ত কিছু ঘটবে, হয়তো সেই অপরিচিতা হাত বাড়িয়ে 'পরশ' করবেন; অবশ্য এমনও হতে পারে যে ঘনান্ধকারে তাঁর নীরব হাসিটুকুও অদৃশ্য হয়ে যাবে। যখন কিছুই দেখা যাবে না তখন অকূল সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে সোনার তরী ডুবে যেতেও তো পারে? সে-আশঙ্কা কিন্তু কবিকে বিচলিত করছে না। যাত্রা নিরুদ্দেশ, কর্ণধার অপরিচয়ের

রহস্যে ঢাকা, তবু তাঁর নৌকা সাগর পাড়ি দেবে, অনেক ঝড়-তুফান আলো-অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে কোনো-এক অজানা তীরে গিয়ে ভিড়বে। সেই তীরে কি মহত্তর কোনো সত্তার সুস্পষ্ট পথচিহ্ন দেখিয়ে দেবেন মানস-সুন্দরী? আশা আছে বুকভরা, কিন্তু চারিদিকে

সংশয়ময় ঘন নীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।

জগৎজোড়া কান্না এখনও তাঁর কানে বাজছে। এ-কান্নার কি কোনো শেষ আছে? অন্য একটি সনেটে সে-প্রশ্ন তুলেছেন কবি, উত্তর খুঁজে পান নি:

জানি না, কী হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে— নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা।

("গতি")

বিশ্বব্যাপারের কল্যাণস্বরূপ কর্তায় যাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, যিনি জীবনের শুভত্ব বিষয়ে সর্বদা নিঃসংশয়, এই সনেটের রচয়িতা সে-রবীন্দ্রনাথ নন।

১ 'এ মনোভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে আগেও নাই, পরেও নাই। মানসী রচনাকালে ইহাই তাঁহার মানসিক অবস্থা। আসল কথা, কয়েক বৎসর পূর্বেকার একটি মৃত্যুশোক তাঁহার মনে যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল এসব তাহারই প্রতিক্রিয়া।' (প্রমথনাথ বিশী— রবীন্দ্র-সরণী, পৃ ৯৫-৯৬)

২ নাই, নাই, কিছু নাই শুধু অন্বেষণ—
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছানিয়া,
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।

("হৃদয়ের ধন")

৩ প্রমথনাথ বিশী— রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ ৭১

৪. চিত্রা ও কল্পনা

মানসসুন্দরীর সন্ধানে আমরা বেরিয়েছিলাম মানুষী প্রেমের অতৃপ্তি ও নৈরাশ্য মনে নিয়ে। সোনার তরীতে নিরুদ্দেশ যাত্রা লক্ষ্যবস্তুর কাছে আমাদের নিয়ে গেল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু চিত্রায় এসে আমরা কবির একাধিক মানসপ্রবাহের সংগমাভিমুখিনতা দেখতে পাচ্ছি। তারা সংগমস্থলে, অর্থাৎ বিশ্ব-লোকের স্রষ্টা ও বিধাতা, মানুষের পরম পিতা ও সখা, সত্য-শিব-সুন্দরের পরম প্রকাশ ঈশ্বরে এখনো ঠিক পৌঁছয় নি, কিন্তু সেই দিকে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জীবনদেবতা ঈশ্বর নন, 'ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই; যিনি বিশেষরূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার ···চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে।' লক্ষণীয় এই যে জীবন-দেবতা মানসসুন্দরীর মতো কল্পলোকবিহারী নন, তাঁর উদ্ভব প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে। কবি উপলব্ধি করছেন—এটা প্রতিভাদীপ্ত কবিমাত্রের সামান্য উপলব্ধি—যে অনেক সময়ে তাঁর কবিতা এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর নিজের পরিমিত শক্তিতে এবং সচেতন চেষ্টায় সম্ভব ছিল ব'লে তিনি ভাবতে পারেন না। কোন্-এক অদৃশ্য মহাশিল্পী যেন তাঁর হাত দিয়ে অসাধ্য সাধন ক'রে চলেছেন। এই অন্তর্যামী কবি-প্রতিভাই কবির জীবনদেবতা।

আমরা ঈশ্বরের আরও এক ধাপ কাছে পৌঁছই যখন রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার সংজ্ঞাকে প্রশস্ততর ক'রে বলেন, কবির অন্তরালে যিনি কবি—'রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে

রচনাকারী'— তিনি কেবল কবিকর্মের গতিপ্রকৃতিই অন্তরাল থেকে নির্ণয় করছেন না, 'আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন।' বধূ যেমন বরের হাতে নিজেকে অর্পণ ক'রে পরম সুখ ও সার্থকতা লাভ করে, কবি তেমনি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও কর্ম, রাগিণী ও ছন্দ দিয়ে তাঁর পরম বরের জন্য বাসরশয়ন রচনা করেন। এই স্বামীসোহাগের চিত্রকল্পেই "জীবন-দেবতা"-র আরম্ভ :

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব।

"চিত্রা" নামক কবিতাটির উপলব্ধি একাধারে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ; জগতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিচিত্ররূপিণী মানস-সুন্দরীকে, অন্তরের মধ্যে জীবনদেবতাকে।[১] এই যুগল মূর্তির ধ্যানে ব'সেও রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো তাঁর জীবনে সত্য দেবতার আবির্ভাব ঘটে নি, এঁরা তাঁরি আপন মনের বাসনা ও কল্পনা দিয়ে গড়া মূর্তি :

আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি— বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।

ঈশ্বরের উপলব্ধি এখনও সত্য হয়ে ওঠে নি, নৈবেদ্য-পরবর্তী কয়েকখানি কাব্যে যেমন হয়ে উঠবে। তবে অজ্ঞাত দেবতার

জন্য তৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠা ইতিমধ্যেই তাঁর কাব্যানুভূতিকে অনুরঞ্জিত করেছে, সংরক্ত করেছে।

যে-দুই দেবতার (মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা) কথা শুনি এ-পর্বের কাব্যে, তাঁরা স্পষ্টতই আরো উপরে উঠবার সোপান। কিন্তু নিজের কাব্যরচনা ও জীবনরচনার বাইরে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন কবি, পৃথিবীর এবং পৃথিবীর মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তখন তাঁর ব্যাকুল হৃদয়ের নিরাশ্রয় শূন্যতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "সন্ধ্যা" কবিতাটি এই শূন্য ক্লান্ত হৃদয়ের সার্থক প্রকাশ। এমন স্মরণীয় কবিতা কেন যে সমালোচক ও সংকলকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকে। কবিতাটির প্রথম স্তবকের ঈষৎ করুণ সন্ধ্যার বর্ণনা করুণতর হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ শান্ত গ্রামের একটি কুটির-প্রাঙ্গণের বেড়া-ধ'রে-দাঁড়ানো কোনো গৃহবধূর রেখাচিত্রে। তার পরে একটি তুলনা :

> শিশুরা খেলে না ; শূন্য মাঠ জনহীন ;
> ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
> কুটির-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
> স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন—
> কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
> সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি
> ধূসর সন্ধ্যায়।
>
> অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে
> বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
> দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
> দিগন্তের পানে। ধীরে যেতেছে প্রবাহি
> সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে

নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো। ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীবজীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্যনীহারিকা ;
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা ;
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব— কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা— বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর,
শূন্যপানে— 'আরো কোথা ? আরো কত দূর ?'

এই কবিতার শেষ চরণ মনে করিয়ে দেয় বলাকার নাম-কবিতার শেষ চরণটিকে— 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।' দুই চরণেই গতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কত ভিন্ন ভাবে, প্রায় বিপরীত মেজাজ থেকে। প্রথমটিতে গতি এনেছে শুধু দুঃখ ও হতাশা। ধরণী লক্ষ লক্ষ বৎসর ধ'রে আপন কক্ষপথে চলতে চলতে দেখেছে 'কত দুঃখ, কত ক্লেশ/ কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।' তাই আজ প্রশ্ন তার নিরাশ, সুর ব্যথিত ও ক্লান্ত, আর যেন সে পারছে না, এবার

সব শেষ হয়ে গেলেই শান্তি। আর দ্বিতীয় কবিতাটিতে 'পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে/বেগের আবেগ', নিখিলের পাখা 'অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে' উড়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল, অধীর; ক্লান্তি বা বিষাদের এতটুকু ছোঁয়া লাগে নি তাতে। গীতাঞ্জলি পর্বে যে 'দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন' কবি লাভ করেছিলেন তার দীপ্তিচ্ছটা বলাকা রচনাকালেও নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি, যদিও মহাযুদ্ধের ছায়া পড়েছে তার উপর। কিন্তু চিত্রা কাব্যে সে গুপ্তধনের জন্য আকুলতা যতই দেখা যাক, তার সন্ধান তখনো পান নি কবি। তাই সে-পর্বে গতি মানেই প্রগতি নয়, দূরে যাওয়া মানেই কোনো চরম লক্ষ্যের দিকে এগুনো নয়; গতিবোধ কোনো উচ্ছ্বাস জাগায় না, জাগায় শুধু নৈরাশ্য আর বিষাদ।

বসুন্ধরা-বিষয়ক এই কবিতার সঙ্গে আর-একটি কবিতার প্রতিতুলনা সহজেই মনে আসে— পত্রপুট-এর তিন নম্বর কবিতা ('আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী')। চিত্রায় ধরণীর ছবিটি অত্যন্ত করুণ, সে ভাগ্যপীড়িত মানবসন্তানদের সঙ্গে একীভূত, তাদেরই মতো অসহায়, ক্লান্ত, করুণার্হ। পত্রপুট-এর পৃথিবী সমগ্র জাগতিক শক্তির প্রতীক; মানবসন্তানদের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্নেহপরায়ণা জননীর সঙ্গে একান্ত নির্ভরশীল পুত্র-কন্যার নয়; সম্পর্ক আরো দূরের, অনেকটা যেন খামখেয়ালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজার সঙ্গে পদানত প্রজাবর্গের। 'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে', 'কৃপা করো না কৃপাপাত্রকে', 'ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে'; আবার কখনো 'চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে/স্বর্গীয় মদের ফেনা।' একাধারে সে সুন্দরী অন্নপূর্ণা এবং অন্নরিক্তা ভীষণা। সবসুদ্ধ সে প্রণম্যা, প্রচণ্ড সুন্দর তার মহিমা। কিন্তু যে-দৃষ্টি দিয়ে কবি দেখছেন এই উদাসীন পৃথিবীকে তা বিশুদ্ধ নান্দনিক, ভালোমন্দ বিচারের ঊর্ধ্বে,

মানুষের সুখদুঃখে সংক্ষুব্ধ নয়; বহুদূর থেকে যেন এই মহা-নাট্যকারের নাট্যলীলা দেখে কবি রূপমুগ্ধ। চিত্রার কবি মানুষের অনেক বেশি কাছাকাছি, মানুষের ভাগ্য নিয়ে অনেক বেশি দুর্ভাবিত ও পীড়িত।

"সন্ধ্যা" কবিতাটিতে অভিব্যক্ত জাগতিক বেদনা ও হতাশা রবীন্দ্রনাথকে কতখানি বিচলিত করেছিল, তা আমরা বুঝতে পারি মাত্র কয়েকদিন পরে লেখা "এবার ফিরাও মোরে" থেকে। এ-দুটি রচনা— প্রথমটি একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রায় অখ্যাত কবিতা, দ্বিতীয়টি বহুবিখ্যাত প্রায় অকবিতা— পর পর প'ড়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের একটা দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অমঙ্গলবোধ তাঁর মনে যখনি অতিশয় তীব্র হয়ে উঠেছে তখনি তিনি 'উত্তরি' ছেড়ে 'বর্ম' ধারণ করতে উদ্যত হয়েছেন। নিজের অন্তর্বাসী কবিপুরুষকে ধিক্কার দিয়েছেন, 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো/মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে' বাঁশি বাজানো অসহ্য লেগেছে; ডাক দিয়েছেন সেই কর্মী-পুরুষটিকে যিনি তাঁর সত্তায় সর্বদাই লুকানো রয়েছেন, ঘোষণা করেছেন কবিকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে:

কবি, তবে উঠে এস— যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।

তার পরে নিজের প্রতি অজস্র উপদেশবাণী:

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।

ভাষাটিও নীতি-উপদেশের, কবিতার নয়। কবি ও কর্মী এই

দ্বৈতসত্তার অন্তর্বিরোধ মাঝে মাঝে কবিকে ক'রে তুলেছে উপদেষ্টা, কিন্তু সে যৎসামান্য ও তৎসাময়িক উন্মার্গগতি তাঁর মূল কাব্যধারাকে মোটের উপর আরো বেগবান, আরো উত্তরঙ্গ করেছিল।

চিত্রার "সন্ধ্যা" যে 'ক্লান্ত ক্লিষ্ট' সুরে শেষ হ'ল সেই ক্লান্তি রূপায়িত হয়েছে আরও গভীর, পরিব্যাপ্ত ও সার্থক ভাবে সন্ধ্যা-বিষয়ক অন্য একটি কবিতায়— কল্পনার "দুঃসময়"-এ। সমস্ত পৃথিবীর বিষণ্ণ অবসাদ যেন কবি টেনে নিয়েছেন নিজের মধ্যে, নিজের দুটি ক্লান্ত ডানার মধ্যে। নীড় কোথাও নেই, ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে এমন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না, আছে শুধু নিবিড়-তিমির-আঁকা মহানভ-অঙ্গন— যে-মহানভে উষার দিশা পর্যন্ত গেছে হারিয়ে। উষার অস্তিত্ব বিষয়ে অবশ্য কবির মনে কোনো সন্দেহ নেই, নইলে কেন বারে বারে ক্লান্ত বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ না করতে উপরোধ করা হবে। সম্মুখে এখনো অবশ্য 'সুচির শর্বরী' রয়েছে এবং 'নিম্নে গভীর অধীর মরণ,' তবু নিরাশ হলে চলবে না।

বিহঙ্গকে কেন 'অন্ধ' বলা হ'ল এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু কবি এবং মানবাত্মা মাত্রই (বিহঙ্গ যার প্রতীক এই কবিতায়) তো স্বভাবগুণে অন্ধই, বহু দীর্ঘ ও কঠিন সাধনার ফলে তাকে চোখের জ্যোতি লাভ করতে হয়। মনে রাখা ভালো যে উপনিষদে কোথাও বলা হয় নি চোখের সামনেই আলো রয়েছে। আদিত্য-বর্ণ মহান্ পুরুষ আছেন অবশ্য, কিন্তু তমসার পরপারে। এই দীর্ঘ দীর্ঘ তামসী রাত্রি পার হবার বেদনা ও ক্লান্তিই অভিব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়। 'ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা'— এর অর্থ এই নয় যে একেবারেই কোনো আশা নেই,[২] কারণ সঙ্গে

সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'ওরে ভয় নাই।' অল্পেতে সংকট কেটে যাবে, সহজেই আলো দেখা দেবে—এই আশাকেই 'মিছে ছলনা' বলা হয়েছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে তারাগুলি ইঙ্গিত করছে, 'বহুদূর তীরে' কারা যেন অঞ্জলি বেঁধে ডাকছেও। তারাগুলি কি উপনিষদের বাণী, এবং 'বহুদূর তীর' কি প্রাচীন ভারতবর্ষ? কল্পনার পরবর্তী কবিতাগুলি পড়লে এই ধারণাই মনে স্থান পায়। সোনার তরী ও চৈতালি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহের পদ্মাতীরে, সমসাময়িক কাল ঘেঁষে। কল্পনা-তে তিনি চ'লে গেলেন রেবা-শিপ্রার তটে কালিদাসের কালে; আর নৈবেদ্যে তাঁকে দেখা যাবে সরস্বতী-দৃষদবতীর তীরে, উপনিষদের যুগে। অতীত যুগে অবগাহনের একাধিক বাহ্যিক ও আপতিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু একটি আভ্যন্তরীণ তাগিদও ছিল। মানসী কাব্যে যে নৈরাশ্য ও বিষাদের সুর তরুণ প্রমথ চৌধুরী লক্ষ্য করেছিলেন তা মানসীতেই কেটে যায় নি, অন্যান্য সুরের মধ্যে এই সুরের গভীর থেকে গভীরতর অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় কল্পনা পর্যন্ত।

কবি তাঁর সমসাময়িক কালকে—কালের মানুষকে, সঙ্গিনীকে, প্রকৃতিকে— ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু গভীর অতৃপ্তিও লাভ করেছিলেন। প্রেমের ক্ষণিকতা, প্রেমাস্পদের অপূর্ণতা (যে অপূর্ণতাবোধ তাঁর প্রেমকে মানবী থেকে মানসীর দিকে চালিত করেছিল) তাঁকে ব্যথা দিয়েছিল; মানুষের বহুবিধ দৈন্য দুর্দশা অক্ষমতা অসহায়তা ('মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমধ্যে চলিয়াছি ছুটি') তাঁকে পীড়া দিয়েছিল; প্রকৃতি মনোহর কিন্তু নির্মম ও নিষ্ঠুর ('হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই/নিষ্ঠুরা প্রকৃতি'), নিয়মের নিগড়ে নিজেকেও বেঁধেছে, মানুষকেও

পিষে মারছে। এই পরিব্যাপ্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের ঘনায়মান অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিলেন কবি, তাই বারে বারে তাঁর অন্তরের ক্লান্ত পাখিকে ডেকে বলছেন— 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর/এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।'

১ 'বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। …জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী, কবির কাছে এ দুই-ই সত্য।' —চিত্রা কাব্যের সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৬৪

২ তুলনীয় :

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে,
শান্তিসমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
(কল্পনা—"অসময়")

নিষ্ক্রমণের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথ; একটি পথ ক্ষণিকা; অন্য পথে কালিদাসের কাল পেরিয়ে তিনি চ'লে গেলেন বৈদিক ভারতবর্ষে, তাঁর নৈবেদ্য-রচনার ফুলগুলি সেখান থেকেই তুলে আনা।

ক্ষণিকা আমার মতে প্রাক্-গীতাঞ্জলি পর্বের সবচেয়ে সার্থক রচনা। গুরুতম ভাবের সঙ্গে লঘুতম ভঙ্গির মিতালি ঘটানো সম্ভব হয়েছে এ বইখানিতে। ছন্দ ক্ষিপ্র ও অনায়াস, ভাষা ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ, ভাবের গাম্ভীর্যকে প্রায়ই মৃদু পরিহাসের পাৎলা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সব যেন হালকা এবং সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু এই সহজকে পাওয়ার জন্য বিশ বছরের কঠিন কাব্য-তপস্যার প্রয়োজন ছিল, চল্লিশ বছর বয়সের পরিণত মনের অপেক্ষা ছিল। পূর্বের বিষাদ কেটে গেছে, তার বদলে পাই উদাস প্রফুল্লতা: নৈরাশ্যের বিক্ষোভ যেখানে তীব্র ছিল সেখানে দেখি বৈরাগ্যের মৃদু প্রশান্তি। ক্ষণিকার কবি অত্যন্ত আটপৌরে, নিকট প্রতিবেশের প্রতি একান্ত মনোযোগী, রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে, পল্লিপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জীবনদেবতার মহানুভূতি থেকে আমাদের মন স'রে এসেছে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে, মানসসুন্দরীর সন্ধান থেকে ফিরে এসেছি সেই সব রূপে-গুণে নিরতিশয় সামান্যাদের কাছে যাদের নাম রঞ্জনা কি কৃষ্ণকলি, যাদের নিয়ে কাব্য করতে গেলেও ভাষা আপনিই নিরলংকার হয়, ভাব নিরুচ্ছ্বাস। ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতার সুর চড়া নয়, আবেগকম্প্র কণ্ঠে আবৃত্তি করার উপযুক্ত নয় মোটেই। সাহস ক'রে এখানে ব'লে ফেলাই ভালো যে পূর্ববর্তী

কাব্যগুলির অতি-রোম্যান্টিকতার চড়া সুর এবং অলংকার-বাহুল্য ("উর্বশী" কবিতাটি তার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ) আমাকে ঈষৎ পীড়া দেয়। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল, কিন্তু সংখ্যায় এত কম যে চারিত্র্যলক্ষণ-বিচারে তাদের ভূমিকা প্রান্তবর্তীই। ক্ষণিকাতে প্রকাশভঙ্গির আশ্চর্য পরিমিতি মনের পূর্ণ পরিণতিরই সাক্ষ্য বহন করে। লোকেন পালিতকে লিখিত উৎসর্গপত্রটি স্মরণীয় :

আশা করি নিদেন-পক্ষে
    ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে
    সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
    স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
কতকটা কি অগ্নিকণায়
    ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে ?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
    আপনি খ'সে পড়বে ধুলোয়,
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
    বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

এই ব্যঙ্গরসিক আত্মসমালোচক দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে অনেকটা নিরাসক্ত ও সমাহিত মনের অধিকারী করেছে। সে-মন তাঁকে বলছে— শাশ্বতীর সন্ধানে ক্ষণিকাকে অবহেলা কোরো না ; আকাশ বড়ো দূরে, মাটির দিকে তাকিয়ে দেখো, সামান্যের মধ্যেই সুন্দরকে দেখতে পাবে, নিখুঁৎ নয় সে, তবু সে বহন ক'রে এনেছে পরমের আশীর্বাদ। আরো বলছে— জীবনে দুঃখ তো থাকবেই, কিন্তু তা নিয়ে জীবন ভ'রে এবং কাব্য ভ'রে বিক্ষোভ বিলাপ আর বিদ্রোহও থাকবে, এমন তো কোনো কথা নেই। দুঃখের সঙ্গে যেন নতুন একরকম বোঝাপড়া ক'রে নিতে প্রবৃত্ত

হয়েছেন কবি। ঐ "বোঝাপড়া" নামধারী কবিতাটিতেই তার চমৎকার ভাষ্য পাওয়া যায় :

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
  এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
  লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
  উঠল কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
  ঝগড়া ক'রে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পার যদি
  সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
  টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
  ঘটনা সামান্য খুবই—
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
  সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।

এই কথাগুলো নিজেকে খুব সহজে, ন্যায়সংগত ভাবেই বলা চলে। কিন্তু আর-একজনের জাহাজ-ডুবি হবার উপক্রম যখন তখন তাকে এ-হেন উপদেশ-বাণী শোনাতে গেলে একটু নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হবে না কি? অপরকেও এমন কথা বলা যায় হয়তো— দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এক—যাকে ইংরেজীতে আইরনিক মুড বলা হয় ইদানীং। বাংলায় কী বলব? এই আইরনির মোদ্দা কথাটা হচ্ছে: নিয়তি বা বিধাতার বিধানে জীবন মোটের উপর দুঃখের— আছে এবং থাকবে। দুঃখ এড়াবার জন্য হাত-পা ছুঁড়ে কোনো লাভ নেই, অন্যকেও দুঃখ থেকে

বাঁচাবার চেষ্টা বিফলই হবে— তার দিক থেকে ; তোমার দিক থেকে তাতে একটু চিত্তশুদ্ধি ঘটতেও পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই দুঃখের সঙ্গে ঘর-সংসার করতে শিখতে হবে, দুঃখকে আহার-নিদ্রার মতোই অত্যন্ত সহজ, তুচ্ছ, নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসগুলির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতে হবে। দুঃখ পাওয়াটা যেমন জীবনেরই নামান্তর, তা নিয়ে বিলাপ করাটা তেমনি বোকামির।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণটি বিশুদ্ধ নান্দনিক। শ্রেয়োনীতির বিচারে অবশ্য নিজের দুঃখকে ছোটো ক'রে দেখা এবং অবহেলার বিষয় জ্ঞান করা যদিচ প্রশংসনীয়, অপরের দুঃখের প্রতি অমনোযোগ বা তাকে ব্যঙ্গ-কৌতুকের রসায়নে হালকা ক'রে তোলাটা নিন্দার্হ। কিন্তু দার্শনিকের মতো শিল্পীও সুখদুঃখমাত্রকে— তা সে নিজেরই হোক আর অন্যেরই হোক— সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করবেন, জীবনের যাবতীয় ঘটনাকে, দারুণতম দুর্ঘটনাকেও, বেশ একটু দূর থেকে এবং রঙে রেখায় ধ্বনিতে বাণীতে প্রতিবিম্বিত ক'রে দেখবেন। শ্রেয়োনীতিতে আত্মপর ভেদ রয়েছে ; আমি নিজের শরীর পাত ক'রে, প্রাণ বিপন্ন ক'রে, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরারোহণ করতে পারি ; কিন্তু পরেব বেলা আমার সে অধিকার আদৌ নেই। আত্মবলিদান মহৎ কর্ম, অন্যকে বলিদান মহাপাপ। সমদৃষ্টি শিল্পী ও জ্ঞানীর অন্বিষ্ট, কর্মীর পক্ষে বিপদ-জনক।

অবশ্য শ্রেয়োনীতিক এবং নান্দনিক মানুষ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, একই মানবসত্তার এ-পিঠ ও-পিঠ। কিন্তু এই দুটো পিঠকে স্বতন্ত্র ক'রে বোঝবার প্রয়োজন আছে জীবনে। দুটো পিঠকে গুলিয়ে ফেলাটাই আধুনিক সাহিত্যের মৌল ভ্রান্তি। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং দুর্লভ প্রতিভাসম্পন্ন কবি। সেই রবীন্দ্রনাথ আবার অক্লান্ত কর্মীও বটে, এবং শ্রেয়োনীতিক চেতনা তাঁর অত্যন্ত

প্রখর। সুতরাং শ্রেয়োনীতির সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের যদি কোনো বিরোধ থাকে— আমার মতে এক জায়গায় বিরোধ আছেই— তবে তা রবীন্দ্রনাথ যেমন ক'রে অনুভব করবেন, আর কোনো কবির তেমন ক'রে অনুভব করার কথা নয়।[১]

মানসীর বিষাদ ও নৈরাশ্য থেকে নিষ্ক্রমণের দ্বিতীয় পথ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং উপনিষদের ব্রহ্মবাদে— শঙ্করবেদান্তের মায়াবাদে নয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা ব্যাখ্যাত ব্যক্তিস্বরূপিত ব্রহ্মের ব্রাহ্ম-সামাজিক ধারণায় ও উপাসনায়। তারি উজ্জ্বল স্বাক্ষর নৈবেদ্য। 'পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ' করা এই কাব্যগ্রন্থখানি কাব্য হিসেবে উজ্জ্বল নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্য, আস্থা, আশাবাদ এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের উপর দ্বিধাহীন নির্ভরতার প্রকাশ রূপে প্রণিধানযোগ্য। মানসী-যুগের অবসান সূচিত হয় পর-পর এবং খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত দুই কাব্যগ্রন্থে— ক্ষণিকা ও নৈবেদ্যে। অথচ কী বিপরীত তাদের ভাষা ও রচনাভঙ্গি, ভাব ও হৃদয়াবেগ, এবং কাব্যিক মূল্য। ক্ষণিকা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দু-চারখানি কাব্যগ্রন্থে গণ্য হবার যোগ্য ; নৈবেদ্য নিকৃষ্টতমের তালিকায় স্থান পাবে ব'লে আমার বিশ্বাস। প্রমথনাথ বিশী নৈবেদ্যকে বলেছেন 'আইডিয়া-প্রধান কাব্য'। বড়ো বেশি আইডিয়া-প্রধান, এত বেশি যে আইডিয়া আইডিয়াই রয়ে গেছে, সনেটের ঠাস-বুনোন শিল্পরূপ ধারণ ক'রেও (অল্প দু-চারটি ব্যতিরেকে) ঠিক কবিতা হয়ে ওঠে নি। আইডিয়া প্রধানত তিনটি। (১) স্বদেশপ্রেম— যে-স্বদেশের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছিল বৈদিক যুগে এবং সে-যুগের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছি ব'লে

আজ আমাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দৈন্যদশা। (২) ঈশ্বরে ভক্তি—যে-ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ এখনও একান্ত আপন অন্তরের উপলব্ধিতে পান নি, লাভ করেছেন উপনিষদ পাঠে, ব্রাহ্মসমাজের মানসিক আবহাওয়ায়, পূজনীয় পিতৃদেবের কাছে আবাল্য শিক্ষায়। এবং (৩) সর্বমানুষের মঙ্গলচিন্তা।

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের প্রেরণা হইতেছে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থোধৃত উপনিষদ।' এ-কথা খেয়া বা গীতাঞ্জলির ঈশ্বরবোধ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু নৈবেদ্য-এর ক্ষেত্রে খুবই সত্য। তিনি আরও বলছেন, 'নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতা আদি ব্রাহ্মসমাজীয় ধর্মমতবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন।'[২] এই কারণে নৈবেদ্যে একপ্রকার ঐতিহ্যনির্ভরতা ও স্বাজাত্যাভিমানী গণ্ডিবদ্ধতা এসে পড়েছে যা সৎকাব্যে বেমানান। অনেকে নৈবেদ্যকেও খেয়া-গীতাঞ্জলির সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসান, কারণ দুটোতেই ভক্তিরসের স্বাদ পাওয়া যায়; অথচ প্রথমোক্ত গ্রন্থের ভক্তি-কবিতার সঙ্গে পরবর্তী ভক্তি-কবিতার প্রেরণা, প্রকৃতি ও প্রকর্ষের ভেদ অপরিমেয়। নৈবেদ্যে অনেক স্মরণীয় বাণী আছে, অনেক প্রয়োজনীয় ধর্মদেশনা আছে, কিন্তু সত্যিকার কবিতা ক'টি? একটি সনেটের প্রথম স্তবকে উপনিষদের বিখ্যাত শ্লোকটি ('শৃণ্বন্তু বিশ্বে…') অনুবাদ ক'রে দিয়ে ষটকে কবি বলছেন:

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

এটা ধর্মোপদেশ, কবিতা নয়। ঈশ্বরানুভূতি যে কত সুন্দর

কবিতার উপজীব্য হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে দেখিয়ে দিলেন।

নৈবেদ্য-র ঈশ্বর কবির অন্তরতম অনুভূতিতে বিরাজমান সেই 'পরানসখা বন্ধু' নন, যিনি ঝড়ের রাতে অভিসারের জন্য গহন অন্ধকারে নদী পার হয়ে আসছেন। তিনি সর্বমানুষের ঈশ্বর, জনগণের ভাগ্য-বিধাতা, বিশ্বচরাচর যাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছার অধীন। সমাজবোধ ও সর্বজনকল্যাণ-চিন্তা নৈবেদ্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনে অতিশয় সজাগ ছিল।[৩] অথচ ঠিক ঐ সময়ে—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।

বক্সার বিদ্রোহ দমনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিষ্ঠুরতা এবং বোয়ার যুদ্ধের নৃশংসতা কবিকে খুবই বিচলিত করেছিল। বিচলিত করেছিল কিন্তু ঐশী বিধানে তাঁর নিটোল আস্থায় ফাটল ধরাতে পারে নি। তিনি ধ'রে নিলেন যে, পশ্চিমী সভ্যতার শক্তিমদমত্ততা এবং সংকীর্ণ জাতিপ্রেমরূপ পাপ এই দুঃখের কারণ। সুতরাং দুঃখকে আমাদেরই পাপের শাস্তি ব'লে গ্রহণ করতে হবে। 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' হবেই, কারণ—

একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

বিশ্বপালককে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন :

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল, ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে অনেক আঘাত-সংঘাত, যন্ত্রণা ও মৃত্যু তো আসবেই, তারি মাঝখানে 'সংশয়াতীত প্রত্যয়' স্থির রাখতে হবে মনের মধ্যে— ঈশ্বরের করুণা থেকে তো শেষ পর্যন্ত আমরা বঞ্চিত হব না। তবে মিছে কেন আমরা ত্রস্ত-চিত্ত দীন-আত্মা হয়ে 'মরিতেছি শত লক্ষ ডরে'—

যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে
অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে।

এই যুগপরম্পরাগত আপ্তবাক্যনির্ভর পরাশ্রয়ী ধর্মচিন্তা রবীন্দ্রনাথের মতো অনন্যসাধারণ সৃজনী প্রতিভাকে বেশি দিন তৃপ্তি দিতে পারে না ; দেয়ও নি। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা নাও বলতে পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্য-রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।'[৪] নৈবেদ্য ধর্মব্যাখ্যা নয়, কবিতাই। তবু তাতে কবি নিজের 'অন্তরতম কথা' বলেছেন ব'লে তো মনে হয় না। এবং 'বাইরের শোনা কথা'য় যে তাঁর ভক্তিরসপিপাসা মেটে নি তার সাক্ষ্য নৈবেদ্য-এরই শেষ দিককার দু-একটি সনেটে পাওয়া যায়। ৮৬ নম্বর সনেটে জানতে পারি :

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা—

পরবর্তী সনেটেও সেই একই বেদনা ব্যক্ত হয়েছে :

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্ব-পানে চাহি।

অপেক্ষা খুব বেশি দিন করতে হয় নি, ঊর্ধ্ব আকাশে (অথবা অন্তরের গভীর তলে) পৌঁছল কবির প্রার্থনা। চার বৎসর পরে প্রকাশিত খেয়ায় আনন্দবার্তা বিঘোষিত হ'ল :

এক রজনীর বরষনে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।

খেয়া থেকে গীতালি পর্যন্ত এই ভরা সরোবরের কবিতা।

---

১ "শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ ১২ ও ১৩

৩ করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায় ; পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।
(৪৭ সংখ্যক সনেট)

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ২০১

এই ভরা সরোবরের কাব্য রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়িয়ে দিল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে জাপান এবং আর্জেন্টিনা পর্যন্ত। অনেকে মনে করেন এই পর্বের রচনাই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল। কিন্তু বহুবিধ শস্যের ফসল ফলেছে রবীন্দ্র-মানসের বিশাল ক্ষেত্রে, সেইসব বিভিন্ন শস্যের আপেক্ষিক মূল্যবিচার সহজ নয়। তবু আমার বিশ্বাস যে, শ্রেষ্ঠতর ফসল ফলেছিল তাঁর শেষ দশকের কর্ষণে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-কাব্যেও আমার অ-ভক্ত মন মুগ্ধ; তা নিয়ে যে-সমস্যার উদয় হয় তার আলোচনা একটু পরেই করব।

গীতাঞ্জলি পর্বের রচনাতে দুঃখ ও অমঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গ্রহণ করেছেন তা এই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন বলা ভুল হবে; কিংবা জাগতিক দুঃখদুর্দশারূপ তমসার একেবারে পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখতে পাচ্ছেন, তাও ঠিক নয়। দুঃখের বেশেই দেবতা নেমে আসেন ভক্তের দ্বারে :

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।

অথবা দুঃখই মেজরাব হয়ে গভীর রাতে হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে-গান বাজিয়ে তোলে সে-গানই মিলনের সেতু রচনা করে :

লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড়ের রাতের পাখি সম
বাহির হয়ে আসো তুমি অন্ধকারে।

আর-কিছু না, গলায় যে-ছিন্ন মালাটি মিলন-রাত্রির শেষে শয্যা-তলে প'ড়ে ছিল, সেটুকু চেয়ে নিতেও পারে নি ভীরু প্রণয়িনী। দ্বিধায় লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে চুপটি ক'রে দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু যাওয়ার সময়ে এ কী দিয়ে গেল সে-নিষ্ঠুর, সে-ভয়ানক প্রেমিক? এই কি তার প্রেমের দান, মিলন-রজনীর স্মৃতিচিহ্ন?

ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
'কী পেলি তুই নারী'।
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

বুকের মাঝে তবু রাখতে হবে এ-বেদনার দানকে। বজ্রহেন ভারী তরবারি আগুনের মতো জ্ব'লে উঠে বুক পুড়িয়ে ফেলে, তবুও মনে হয় না যথেষ্ট হয়েছে আঘাত। কঠিনতর বেদনায় টনটন ক'রে উঠুক বুকের পাঁজরগুলো:

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো,
আরো কঠিন স্বরে জীবন-
তারে ঝংকারো।

আঘাতকে এড়িয়ে চলা আর নয়, ভয় করার তো সত্যি কিছু নেই, এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে নিতে হবে সব-ক'টি বাণ:

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্মে আমায়
মারবে হিয়ার কাছে?

আর-এক প্রকার দুঃখের কথা গীতাঞ্জলিতে বারে বারে বলা

হয়েছে। সে-দুঃখ জীবননাথের দেওয়া দুঃখ নয়, তাঁকে না-পাওয়ার দুঃখ। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'গীতাঞ্জলিতে দেখিতেছি এই উন্মুখর অধীর প্রতীক্ষা বিরহের ক্রন্দনে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না-পাওয়ার দুঃখ গীতাঞ্জলির গানগুলির উপর সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে।'[১] সুগভীর কিন্তু সুমধুর। বিরহ চিরন্তন হলে দুঃখ দুর্বিষহ হ'ত। কিন্তু যে-বিরহ মিলনেরই সম্ভাবনায় মদির, তা মিলনেরই পূর্বাস্বাদন, তিক্ত হলেও সুস্বাদু।

তুমি যদি না দেখা দাও
করো আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।

এ-অনুযোগ ব্যর্থ হবার নয়, ব্যর্থ হবে এমন আশঙ্কা নেই অনুযোগকারিণীর মনে। যদি থাকত তবে তার প্রকাশ হ'ত অন্য ভাষায়, এই আবদারের সুর তাতে বেমানান হ'ত।

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।

'দুরন্ত' শব্দটা লক্ষণীয়। যে-বাতাসের সঙ্গে পরান কেঁদে বেড়ায় তাকে ছোট্ট ছেলের মতো আদর ক'রে বলা হচ্ছে 'দুরন্ত'। এ-কান্না তো গুমরে-ওঠা কান্না নয়। এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় যাঁর জন্য প্রতীক্ষা তিনি আসবেনই, খুব গোপন চরণ ফেলে, 'সবার দিঠি এড়ায়ে' আসবেন। যে-পথের দুই দিকে 'দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে' সেই নির্জন পথে প্রতীক্ষমাণার ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়াবেন। তার পরে যদি বিরহিণী ব'লে ওঠেন :

হে একা সখা, হে প্রিয়তম
রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ফেলে।

তখন কি আমাদের মনে খুব সন্দেহ থাকে যে উদাসীন অতিথি একবার একটুক্ষণের জন্য ঘরেও প্রবেশ করবেন? আর যদি হেলায় ফেলে চলেই যান, দিন বৃথাই কাটে, রাত গভীর হয়, প্রহরের পর প্রহর পথ চেয়ে থাকতে হয়, তবু:

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা না পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

কারণ জানাই তো আছে যে উদাসীন সত্যই উদাসীন নন, তিনি আসতেই ইচ্ছুক; আর যখন আসেন, 'অরুণবরন পারিজাত হাতে' নিয়ে আসেন। বাধা তাঁর দিক থেকে নয়। বাধা এই যে পাশে এসে বসলেও নিদ্রাকাতরা হতভাগিনীর ঘুম ভাঙে না; কখনও বা নেহাত আলসেমিতেই পেয়ে বসে:

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি;
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে।

এই অবিক্ষুব্ধচিত্ত স্থিতহৃদয় বিরহিণীর বিরহ-দুঃখে কি সুখের আমেজ যথেষ্ট লাগে নি? 'বিরহ মধুর হ'ল আজি মধুরাতে',—শুধু কোনো বিশেষ রাতে নয়, সব রাতেই মধুর।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি পর্বে দুঃখের কথা খুবই ভাবছেন, কিন্তু সে-দুঃখ একান্তভাবে নিজেরই। আগেই বলা হয়েছে যে গীতাঞ্জলির কবি নিজেকে এবং তাঁর জীবনবল্লভকে নিয়ে

সর্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত, প্রায় সমস্ত কবিতা এই নিভৃত দ্বিরালাপের কবিতা। দৈবাৎ কোথাও যদি শুনি :

চরণভরে কাঁপে ধরা,
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
জীবনদেবতা মেতেছে আজ
মরণ-উৎসবে।

তবে হঠাৎ ভ্রম হয়, কবি বুঝি সমস্ত পৃথিবীর, সকল মানুষের সর্বনাশের কথাই ভাবছেন। কিন্তু পরবর্তী শ্লোক সে-ভুল ভেঙে দেয়, অগ্নিবাণে 'আমার'ই 'বক্ষ বিদীর্ণ' হচ্ছে, 'আমার'ই মরণ নিয়ে এ মরণ-মহোৎসব; আর সে-মরণকে নিয়ে তো কোনো দুর্ভাবনা নেই, কারণ

মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে।

সর্ব মানবের দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন নৈবেদ্য-এ, আবার ভাববেন বলাকায়— ভক্তিপর্বের দুই প্রান্তবর্তী কাব্যে। ইতিমধ্যে কেবল 'তুমি' আর 'আমি' একান্তে আসীন, সমাজ সংসার মিছে না হলেও বহু দূরে স'রে গেছে। প্রমথনাথ বিশী ঠিকই বলেছেন : 'সর্ব মানবের সহিত একাত্মবোধ··· গীতাঞ্জলি পর্বে বাধাগ্রস্ত।' কিন্তু তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে 'নৈবেদ্য প্রকাশের পরে অর্থাৎ ১৯০২ হইতে বলাকার কবিতা রচনার সময় ১৯১৪ পর্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর রবীন্দ্রপ্রতিভার বনবাস?'[২] মানবমুখিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি ধারা, একমাত্র ধারা নয়।

১ নীহাররঞ্জন রায়— রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (৫ম সংস্করণ), পৃ ১১·

২ প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭ ও ২১

গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা

> *"We read fine things, but never feel them to the full until we have gone the same steps as the author."*
>
> Keats (Letters)

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি (যা ভাবের গভীর ঐক্যে একই কাব্যগ্রন্থ তার তিন খণ্ডের তিনটে স্বতন্ত্র নাম আলোচনার পক্ষে অসুবিধাজনক; অতঃপর বর্তমান লেখাতে সাধারণভাবে গীতাঞ্জলি বলতে গীতাখ্য তিনখানা বই-ই বোঝাবে) স্পষ্টতই ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা বা গান। এর অধিকাংশ গান শুনে আমি মুগ্ধ হই, এমনকি সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতারূপে পাঠ করলেও আমার মন গভীরভাবে সাড়া দেয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার নেই এমন কথা বলব না। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক যে-কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত। শব্দ (authority) প্রমাণ হিসেবে আমার কাছে একেবারে অগ্রাহ্য, শুধু অগ্রাহ্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। এবং দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার পথে-বিপথে যত এগিয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ততই ক্ষীণ হয়েছে; অবশেষে আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে বাল্যকালের পরম আশ্রয়দাতা, পরম কল্যাণময়, অনন্ত শক্তিধর, সকল দুঃখতাপহর কোনো বিশ্ববিধানকর্তাকে তো আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ যে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে আমার মনের প্রতিটি কক্ষে প্রবল প্রতিরোধ, সেই ঈশ্বর-প্রেমে আদ্যোপান্ত অনুরঞ্জিত কা[illegible] হৃদয়ে স্থান দিতে একটুও বাধে না।

কেন বাধে না, এ-প্রশ্ন আমাকে তরুণ বয়স থেকে ভাবিয়েছে।

একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস বলি এখানে। গীতাঞ্জলি আমি প্রথম পাঠ করি উর্দু ভাষায়—তখনো বাংলা পড়তে বা বলতে শিখি নি। ইংরেজি গীতাঞ্জলির চমৎকার অনুবাদ করেছিলেন নেয়াজ ফতহ্‌পুরী ; যতদূর জানি ঐ অনুবাদ থেকেই উর্দু গদ্য-কবিতার (নসর-শায়েরীর) সূত্রপাত। কহ্‌কুশান নামক মাসিকের পাদ-পূরণ-রূপে ব্যবহৃত এই গদ্য-কবিতাগুলি পড়তে পড়তে চোখে জল আসত যে অতিশয় আনাড়ি কিন্তু নিঃসন্দেহে আন্তরিক পাঠকের তার বয়স তেরো, সে তখন মনেপ্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, পরকালের ভয়ে পুণ্যকর্মে যত্নশীল, পাপবোধে ঈষৎ পীড়িত। বছর তিনেক পর অপেক্ষাকৃত পরিণত রুচি ও বুদ্ধি নিয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়লাম। প'ড়ে আরও মুগ্ধ হলাম, কতবার যে আবেগকম্প্র কণ্ঠে আবৃত্তি করলাম তার ইয়ত্তা নেই। স্মরণ-শক্তি নিতান্ত ভোঁতা না হলে আজও তার অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ থাকত। কিন্তু ততদিনে আমি বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতির পাঁচ-সাতখানা গণপাঠ্য দার্শনিক পুস্তক হস্তগত ক'রে হয়ে উঠেছি ঘোরতর নাস্তিক, এমনকি নাস্তিক্যপ্রচারের মিশনরি উৎসাহ নিয়ে বড়োদের সঙ্গে তর্ক করতে সর্বদা উদ্যত। সহিষ্ণুরা সক্ষোভে ক্ষমা করেছিলেন ; অসহিষ্ণুদের কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিলাম যতবার, ধর্মবিশ্বাসের অসারতা বিষয়ে আমার প্রত্যয় ততবার নতুন ক'রে বল পেয়েছিল।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠ ক'রে একটি সংকল্প এবং একটি প্রশ্ন মনে দানা বাঁধল। সংকল্পটি মূল বাংলা ভাষায় গীতাঞ্জলি পড়বার। সুতরাং বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আর মিল্‌ন্ সাহেবের ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণ যোগাড় ক'রে লেগে গেলাম সেই ভাষার চর্চায় যে-ভাষা আজ আমার মাতৃভাষার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়। প্রশ্নটি হ'ল—যে-ঈশ্বরকে আমি কায়মনোবাক্যে

অলীক বলে জানি, সেই ঈশ্বরভাবে ভরপুর কাব্যে মন কেন সাড়া দেয় ? আমি পেশাদারী নিস্তাপ সাহিত্যিক বিচার বা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কথা বলছি না যার দৌলতে আমরা দুর্লঙ্ঘতম মানসিক ও হার্দিক ব্যবধান অনায়াসে পার হয়ে দূরতম যুগ, সংস্কৃতি ও মেজাজের শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতী রায়দান ক'রে থাকি। আমি বলছি কাব্যের সেই সংরক্ত আবেদনের কথা যাতে সমস্ত মন-প্রাণ মুচড়ে ওঠে। প্রশ্নের কোনো উত্তর পাই নি সেদিন; আজো তার উত্তর খুঁজছি। কিছুক্ষণের জন্য পাঠককেও সেই খোঁজার শরিক ক'রে নিতে চাই।

একটি উত্তর সহজেই মনে আসে। গীতাঞ্জলিতে তো ঈশ্বর-বিষয়ক কোনো মত, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে না, ঈশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে একজন কবির একটি বা একাধিক অনুভূতি মাত্র ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই কবি এবং পাঠকের মধ্যে মত-বিশ্বাসের পার্থক্য যত গভীর ও মৌলিক হোক অনুভূতির প্রকাশ যদি সুন্দর হয়ে থাকে তবে যে-কোনো সহৃদয় পাঠকের মন তাতে সাড়া দিতে পারবে না কেন ? অনুভূতির প্রকাশ অবশ্য সার্থক হওয়া চাই। মা যখন পুত্রশোকে কাঁদে তখন সে-ও তার তীব্র বেদনা প্রকাশ করে। তবু তা কবিতা নয়, কারণ মায়ের হৃদয়াবেগ নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্যক্ত হয় বটে কিন্তু সুস্পষ্টরূপে হয় না; মা নিজেই নিজের অনুভূতির রূপরেখা, বর্ণালি ও গভীরতা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারে না। কবি পারেন। দ্বিতীয়ত, কবি কলাকৌশল দ্বারা তাঁর অনুভূতির সত্যরূপ পাঠকের চিত্তে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। শোকার্ত মায়ের কান্না শ্রোতার মনে যে-অনুভূতি জাগায় তা শোক-জাতীয় কিছু নয়, একেবারে ভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতি— করুণা বা দরদ। মোটকথা সুস্পষ্ট অনুভূতির সুদক্ষ প্রকাশই কবিতা। অন্য সব প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

কিন্তু অনুভূতি-বহির্ভূত আর সব প্রশ্নই কি অবান্তর? আমরা ভুলে যাই যে আমাদের অনুভূতিগুলি একান্ত নিরালম্ব স্বাশ্রয়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনোব্যাপার নয়। এরা বাস্তব জগতের কোনো অবস্থার বা ঘটনার (অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, নিকটস্থ বা দূরবর্তী) উপলব্ধি নামক একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যঙ্গ-বিশেষ; প্রত্যঙ্গ না ব'লে বলা উচিত তারই অনুরঞ্জন কিংবা অনুরণন। কাজেই কবিকে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করার জন্যে অনুভূতির বাহ্য উৎস বিষয়েও পাঠককে প্রয়োজনমতো অবহিত করতে হয়। কবি তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করেন উতলা মায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ে বা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ক'রে নয়, বাস্তব বা বাস্তবপ্রতিম কোনো-কিছুর যথোপযুক্ত বর্ণনার মাধ্যমেই। অবজেক্‌টিভ কোরেলেটিভের[১] কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, আমি তারই কথা বলছি এখানে।

কবিতায় প্রকাশিত অনুভূতি নিরালম্ব নয়, বিষয়-নির্ভর—এটা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু সে-বিষয় বাস্তবিক না হয়ে কাল্পনিক হলেও কবিকর্ম বেশ সুষ্ঠুভাবেই এগুতে পারে। আর কাব্যানুভূতির অধিষ্ঠান যদি কল্পলোকেই হয় তবে তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সে-বিশ্বাসের সঙ্গে পাঠকের বিশ্বাসের ভেদাভেদ নিয়ে তো কোনো সমস্যা উঠতে পারে না। তা কিন্তু নয়। এখানে অনুভূতি-প্রকাশের বাহ্য প্রতীক এবং অনুভূতির বাহ্য বিষয়—এ-দুটিকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্রথমটি কাল্পনিক হতে কোনো বাধা নেই। প্রেমভাব-প্রকাশের অবজেক্‌টিভ কো-রেলেটিভ হতে পারে কোনো কাল্পনিক গভীর বন বা সুরম্য অট্টালিকা। কিন্তু প্রেমাস্পদ রক্তমাংসের মানুষ ছাড়া আর কী হতে পারে? যে-কবি কখনো সত্যিকার প্রেমে পড়েন নি, শুধু প্রেমের কবিতা বা উপন্যাস প'ড়েই প্রেমের কথা জেনেছেন এবং

সে-বিষয়ে একটি কাল্পনিক ভাবাবেগ গ'ড়ে তুলেছেন, প্রেমরস কি তাঁর কাব্যে সত্য হয়ে উঠতে পারে? এবং যে-পাঠক প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত, তার পক্ষে কি প্রেমের কবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব? অর্থাৎ রোম্যান্টিক প্রেম যার কল্পনাতেই আছে, হৃদয়ে অনুপস্থিত এবং প্রতিরুদ্ধ, সে কি কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, য়েট্‌স কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাপাঠে অধিকারী? তেমনি এ-প্রশ্নও কি ওঠে না যে, ভক্তিভাব যার মনে স্থান পায় নি, উপরন্তু সে-জাতীয় কোনো ভাবাবেগ জাগবার অনুকূল মনই যার তৈরি নেই, সে কি গীতাঞ্জলির মতো ভক্তি-কাব্যপাঠে অধিকারী?

কোনো কলাকৈবল্যবাদী তবু তর্ক করতে পারেন, প্রেমই হোক আর ভক্তিই হোক, বিদগ্ধ এবং সহৃদয় পাঠক কাব্যের সেই ভাবকে সম্যক আত্মসাৎ ক'রে তাতে বিহ্বল হতে যাবেন কেন? এমনকি কবি নিজেও তো সেই ভাবের ঘোরে কাব্য লেখেন না। আমাদের আলংকারিকদের ভাষায় কবিকর্মে ভাব পরিণত হয় রসে, অর্থাৎ যা ছিল মনকে আন্দোলিত ক'রে, আপ্লুত ক'রে, তা এক বিশুদ্ধ, শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক, অলৌকিক রূপ ধারণ করে কবিতায়—এমন যে তাকে আমারও বলা যায় না, পরেরও বলা যায় না (পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ)। সেই রসও আবার সহৃদয় পাঠক অন্তরে ঠিক গ্রহণ বা ধারণ করেন না, তার আস্বাদমাত্র সম্ভোগ করেন, অর্থাৎ তাকে যেন জিভের উপর রেখে একটু চেখে দেখেন মাত্র। অতএব কাব্যে প্রকাশিত হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে যদি-বা কোনো বাস্তব বিষয়ের উপলব্ধি এবং কোনো জাগতিক কিংবা সামাজিক সত্যে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, আর সেই অনুভূতি যখন রূপান্তরিত হয় রসে এবং ঐ রস যখন কোনো পরিশীলিত পাঠকের নিরুত্তাপ

সম্ভোগমাত্রের বস্তু হয়, তখন কবির মনে যে-গভীরতর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের পরিমণ্ডল তাকে বেষ্টন করেছিল তা অগ্রাহ্য ঠেকলেও তাঁর বিশুদ্ধ রসানুভূতি ক্ষুণ্ণ হতে যাবে কেন ?

এ-মতে আমার মন অনেকটা সায় দেয়, বেশ কিছু কাল সম্পূর্ণ সায় দিত। সম্প্রতি একটু খটকা লাগে। আলংকারিক-দের মত নাট্যকাব্যকে অবলম্বন ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করা যাক। ওথেলোর ঈর্ষা, ইয়াগোর অসূয়া, লেডি ম্যাকবেথের দুর্ধর্ষ অভীপ্সা—এই ভাবগুলিকে নাটকে আমরা বস্তুতপক্ষে অনুভব করি না, আস্বাদন করি মাত্র ; নাটক দেখার সময়ে যদি সত্যি সত্যি ঐসব ভাবে বিলোড়িত হয়ে পড়ি তবে রসসম্ভোগে বিঘ্ন ঘটে এবং আমরা উপযুক্ত দর্শক নই একথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রাচীন আলংকারিকরা নাটকে অভিব্যক্ত এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টি এবং তাদের রসরূপের প্রতি যতটা মনোযোগী ছিলেন, সে-পরিমাণে দৃষ্টি দেন নি নাটকের সামগ্রিক ঐক্যরূপের দিকে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, ভয়ানকাদি নবরস নাটকে ব্যবহৃত উপকরণ, এর কয়েকটি বা সব-ক'টির যথাযথ সন্নিবেশে নাটক রচিত হয়, কিন্তু কোনো একটিকে সমগ্র নাটকের মূল রস বলা যায় না (সব-ক'টিকে বা কয়েকটির সমষ্টিকে তো নয়ই)।

অনেকে শান্তরসের পক্ষ থেকে এই দাবি তুলেছেন। এক হিসেবে এ-দাবি যথার্থই। জীবনের চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের তুলনায় আর্টের অভিজ্ঞতা প্রশান্ত বইকি। যত ভয়ানক বা মর্মন্তুদ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হোক রঙ্গমঞ্চে, আমরা তা প্রত্যক্ষ করি (বলা উচিত সম্ভোগ করি) প্রশান্ত চিত্তে। প্রেক্ষাগৃহে যেসব মহিলা ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে শুরু করেন বা কণ্ঠস্বর তারায় চড়িয়ে চিৎকার-শব্দে ছাদ ফাটাবার

উপক্রম করেন, তাঁরা নাট্যরস-সম্ভোগের উপযুক্ত মানসিক পরিণতি লাভ করেন নি। শোনা যায় নীলদর্পণ দেখতে দেখতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি দৃশ্যবিশেষে এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন তাঁকে চটি জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ঘটনাটা যদি সত্য হয় তবে বিদ্যাসাগরের চারিত্র্যগুণ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ে, কিন্তু তিনি সুরসিক দ্রষ্টা ছিলেন কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। যা-ই হোক, যে-শান্তরস নবরসের একটি রস এবং অন্য আটটির সমপর্যায়ভুক্ত, আর যে-শান্তরস সমগ্র নাটকের মূলরস—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

তবু শান্তরসকে (মনে হয় আরিস্টট্ল-এর কাথার্সিস তত্ত্বের ইঙ্গিতও এর দিকেই) আমি নাটকের মূলরস বলব না, মূলরসের সর্বপ্রধান গুণ ব'লেই গণ্য করব। নাট্যকার এবং মহৎ শিল্পী মাত্রেই মানুষকে, সমাজকে, পৃথিবীকে এবং সমগ্র বিশ্বজগৎকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করেন, সে-নিরীক্ষণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় হৃদয়াবেগ জড়িত থাকে। আবেগপূর্ণ নিরীক্ষাকে উপলব্ধি বলা যেতে পারে। নাট্যকারের এই উপলব্ধিটি নাট্য-রচনায় যে-রূপান্তর গ্রহণ করে তাকেই ঐ নাটকের মূলরস বলা সংগত।[২] তা অবশ্যই শান্ত হবে, কিন্তু শান্ত বললেই তার যথোপযুক্ত পরিচয় দেওয়া হয় না। নাটকের অন্তর্ভুক্ত এবং উপকরণরূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন গৌণ 'রস'গুলিকে যে-ভাবে আমরা আস্বাদন করি, সমগ্র নাটকের মূল উপলব্ধি এবং তার রসরূপ সেইভাবে শুধু চেখে দেখবার জিনিস নয়, তার আবেদন নিবিড়-তর, অন্তরের গভীরে সে পৌঁছয় এবং বাসা বাঁধে।

কলাকৈবল্যবাদীদের আমি প্রশ্ন করব: নাটকের মূল উপলব্ধির আলয় যে-জাগতিক নিরীক্ষা, তার সঙ্গে আমাদের

স্বকীয় জাগতিক নিরীক্ষার বিরোধ যদি মৌলিক হয় তবে কি ঐ নাটকের সম্যক রসসম্ভোগ অব্যাহত থাকবে? সাহিত্য-বিশেষজ্ঞের সুশীতল সাধুবাদের পক্ষে অবশ্য কবি ও তাঁর পাঠকের মধ্যে হার্দ্যবিচ্ছেদ মস্ত বাধা নয় জানি, কিন্তু আমি বলছি সেই রসগ্রহণের কথা যাতে অন্তঃকরণের প্রতিটি তার ঝংকার দিয়ে ওঠে। তেমন ক'রে সাড়া দেওয়ার কথা ভাবলে কি টি. এস. এলিয়ট-এর মতো আমরাও মানতে বাধ্য নই যে তত্ত্বের এবং তর্কের খাতিরে যা-ই বলি, কাব্যরসসম্ভোগ আমাদের মৌল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হয়ই।[৩]

শেক্সপীয়র যে-মহান দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন মানুষকে এবং জগৎকে তাঁর প্রধান ট্র্যাজিডিগুলিতে, তার সঙ্গে আমরা নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করি। না করলেও আমরা শেক্সপীয়রিয়ান ট্র্যাজিডির রচনাকৌশলের প্রশংসা করতাম। কিন্তু হৃদয়ের এত গভীরে তাকে স্থান দিতে পারতাম না, ট্র্যাজিডিকারের মহত্ত্ব-বিষয়ে এমন নিঃসংশয় হতে পারতাম না। কবির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির আনুপূর্বিক মিল থাকবে এমন কথা অবশ্য আমি বলছি না। কিন্তু আমার মতে সম্যক রসগ্রহণের ন্যূনতম শর্ত এই যে কবির সম্পূর্ণ উপলব্ধি— শুধু তাঁর অনুভূতির দিকটা নয়, তাঁর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিও— পাঠকের দ্বারা গৃহীত না হোক অন্তত তার কাছে গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ঠেকবে। যদি কবির সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিভেদ এতই মৌলিক হয় যে পাঠক কবির দৃষ্টিকে কেবল অগ্রাহ্য নয়, অসত্য বা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে, তবে সেক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে হার্দ্যসংযোগের এমন কোনো প্রণালী খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্য

া বইতে পারে।

এলিয়ট যদিও দান্তে প্রসঙ্গে জোর গলায় বলেছিলেন, 'কবির

মতবিশ্বাসের সঙ্গে পাঠকের মতবিশ্বাস এক না হলে রসসম্ভোগের ব্যাঘাত ঘটবে একথা আমি সরাসরি অস্বীকার করি' তবু শেলি ও কীট্‌সের আলোচনায় তাঁকে ভিন্ন সুরে কথা বলতে হয়েছে। তার কারণ শেলির অনেক কবিতাই তাঁর ভালো লাগত না এবং আত্মবিশ্লেষণ ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, 'শেলির মতামত আমি অপছন্দ করি ব'লে তাঁর কাব্যসম্ভোগে বাধা পাই; শেলির কতকগুলি মত আমার এতই বাজে ('puerile') মনে হয় যে, যেসব কবিতায় ঐ মতের ছায়া পড়েছে তাতে আমি কোনো রসই খুঁজে পাই না।' ফলে তাঁর পূর্বোক্ত সরাসরি অস্বীকৃতিকে একটু সংস্কৃত ক'রে অনেকখানি মোলায়েম ক'রে এলিয়ট শেষ অবধি যে-ফরমূলায় পেঁৗছলেন তা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত :

'When the doctrine, theory, belief, or "view of life" presented in a poem is one which the mind of the reader can accept as coherent, mature, and founded on the facts of experience, it interposes no obstacle to the reader's enjoyment, whether it be one that he accept or deny, approve or deprecate.'। 'When' কথাটার উপর আমি কিন্তু জোর দিতে চাই এবং যে-তিনটি বিশেষণের দ্বারা কাব্যব্যক্ত 'অবিঘ্নকারী' মতবিশ্বাসকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলির উপর। এতগুলি সদ্‌গুণবিশিষ্ট যে-মত তা আমার আপন না হলেও, খুব অনাত্মীয় নয়, অপাঙ্‌ক্তেয় তো নয়ই।

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয় যদি প্রশ্নটাকে বিশ্বনিরীক্ষা বা ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক বিরোধ থেকে মূল্যবোধের, নীতিবোধের, সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে আসা হয়। ফ্যাশিস্ট মার্কা উচ্চণ্ড স্বাজাত্যদম্ভ ও পরজাতিবিদ্বেষের দৃষ্টিকোণ থেকে

উচ্চাঙ্গের নাটক, কবিতা বা উপন্যাস লেখা হয়েছে কিনা জানি না। আদৌ সম্ভব কিনা এমন সন্দেহ যদি কেউ প্রকাশ করেন তবে বলব যে তিনি গোড়াতেই মেনে নিচ্ছেন সাহিত্যে মতবিশ্বাসের কথাটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাই আপাতত ধ'রে নেওয়া যাক যে সত্যাসত্য শুভাশুভ যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উঁচু দরের সাহিত্য রচনা সম্ভব— অর্থাৎ সেই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যা উঁচু দরের ব'লে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু আমাদের মতো মনে-প্রাণে ফ্যাশিস্টবিরোধী যারা— যাদের কাছে ঐ বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও হৃদয়ভাব শুধু অনধিগম্য নয়, রীতিমতো অবজ্ঞেয়— তাদের পক্ষে ফ্যাশিস্ট সাহিত্যের রসসম্ভোগের চেষ্টা কি পদে পদে ব্যাহত হবে না? অবশ্য আমরা কোনো ফ্যাশিস্ট নাটকের প্লটের ঘনসন্নিবদ্ধতা, চরিত্রাঙ্কণের সূক্ষ্মরেখতা, ভাষার অনবদ্যতা, ছন্দের অপূর্বতা, চিত্রকল্পের উজ্জ্বলতা, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শীতল প্রশংসাবারি বর্ষণ করতে পারি; কিন্তু তাকেই কি বলে রসগ্রহণ? পেশাদারী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েও আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা বিমুখ থাকবে। কারণ ফ্যাশিস্ট লেখক এবং ফ্যাশিস্ট-বিরোধী পাঠকের মধ্যে ব্যবধান অসেতুবন্ধ্য।

এ তো গেল নাট্যকাব্যের কথা। গীতিকবিতার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কবির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কোনো-একটা দিক কিংবা জগৎ ও জীবন বিষয়ে তাঁর কোনো পূর্ণ উপলব্ধি পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা কম। তেমন প্রকাশ ঘটে অনেকগুলি কবিতার মাধ্যমেই। সে-সমস্ত কবিতা একই কাব্যগ্রন্থে সংগৃহীত থাকতে পারে, বা একাধিক কাব্যগ্রন্থে ছড়ানো। অনেক সময়ে সমগ্র কাব্যসংকলন না পড়লে আমরা কবির মনের নাগাল পাই না। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মেজাজ ও উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে গীতাখ্য তিনখানি কাব্যগ্রন্থে, উৎসর্গে এবং তৎপূর্ববর্তী নৈবেদ্য-র ও অব্যবহিত

পরবর্তী বলাকার কয়েকটি কবিতায়। এই পর্বকে ভক্তিপর্ব বলা যেতে পারে, এর আগে বা পরে আমরা ঠিক ভক্তিরসের স্বাদ পাই না[৪]— খুব অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যতিক্রম ধর্তব্য নয়।

গীতিকবিতা প্রায় সব সময়েই উত্তম পুরুষে লেখা হয়, কিন্তু এই উত্তম পুরুষটি যে সর্বদা কবি নিজেই হবেন এমন কোনো কথা নেই। "The Love Song of Alfred J. Prufrock" বা "Portrait of a Lady"র উত্তম পুরুষ স্পষ্টত এলিয়ট নন, মানসীর "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি", "বধূ", এবং শিশু কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতারই উত্তম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ নন। প্রথম দুটি তো ক্ষুদ্র নাটিকাই, প্রুফরক এবং অন্য কবিতাটির তরুণ প্রণয়ী (যাদের মুখ দিয়ে কবিতা দুটি বলানো হয়েছে স্বগতোক্তির আকারে) দুই নাটিকার দুজন নায়ক। "নারীর উক্তি", "বধূ", এবং শিশু-র কবিতাগুলি ঠিক নাটিকা না হলেও নাট্যধর্মী। এসব ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর অনুভূতি কবির অনুভূতি নয়, কবি পাঠকের সামনে এই অনুভূতিগুলির চিত্র এঁকেছেন মাত্র। এই চিত্রের অন্তরালে কবির নিজের যে উপলব্ধিটি উহ্য রয়েছে তা যদি পাঠকের মর্মে না পৌঁছে থাকে তবে বলতেই হবে হয় কবির লেখা নয় পাঠকের পড়া ব্যর্থ হয়েছে। যে-কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই সেটা এই যে এ-জাতীয় নাট্যধর্মী লিরিকে পাত্রপাত্রীর অনুভূতি আর কবির অনুভূতি বা উপলব্ধি বেশ একটু পৃথক, এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপজীব্য। পাঠকও কবিতার দুই স্তরের অনুভূতিকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। প্রুফরক এবং বধূর অনুভূতির আমরা দ্রষ্টা বা আস্বাদকমাত্র, কিন্তু তদন্তরালবর্তী কবির নিজস্ব অনুভূতি আমাদের অন্তরের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে; তার সঙ্গে যদি অনেক পরিমাণে তাদাত্ম্য (আইডেন্টিটি) স্থাপিত না হয় তা হলে কবিতার সম্যক রসগ্রহণ সম্ভব হয় না।

কিন্তু বেশির ভাগ গীতিকবিতার উত্তম পুরুষ কবি স্বয়ং, তাঁর কল্পিত কোনো ভিন্ন-হৃদয় চরিত্র নয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই স্তরের অনুভূতি সেখানে এক হয়ে গেছে, কবিতায় অভিব্যক্ত অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং কবির অনুভূতি। অবশ্য কাব্যের অনুভূতিমাত্রই জীবনের অনুভূতি থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের—অপেক্ষাকৃত সাধারণীকৃত এবং নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিটি কবিরই, কাজেই পাঠক যদি তাকে নিজ অন্তরের গভীরতম কক্ষে জায়গা না দিয়ে তাকে প্রেক্ষাগৃহের আসন থেকে দেখেন, তবে তিনি একটি গীতিকবিতাকে অবলম্বন ক'রে স্বতন্ত্র নাটক রচনা করতেও পারেন, কিন্তু ঐ গীতিকবিতার মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাবে। অনেক নাস্তিক (শুধু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অর্থেই নয়, জীবনবিমুখ এবং বিশ্ববিতৃষ্ণ অর্থে নাস্তিক) এবং রবীন্দ্রমানসে বীতশ্রদ্ধ সমালোচক যখন গীতাঞ্জলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তখন সে-প্রশংসায় অন্তরের সাড়া যতটা থাকে তার চেয়ে হয়তো অনেক বেশি থাকে কৃতবিদ্য সূক্ষ্মদর্শী মূল্যবিচার, বিশেষত কলাকৌশলগত গুণগ্রাহিতা। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে এঁরা গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকেও নাট্যকাব্য রূপে গ্রহণ করেন, কবিতার ভক্তিভাব যেন কবির নিজস্ব অনুভূতি নয়, কবিবর্ণিত একটি ভক্ত হৃদয়ের চিত্রণ মাত্র। সুতরাং পাঠকও নাটকোচিত দূরত্ব রক্ষা ক'রেই তার রসসম্ভোগ করবেন, যেমন ক'রে তিনি দূর থেকে সম্ভোগ করেন ওথেলোর ঈর্ষা বা ইয়াগোর অসূয়া। কিন্তু তাই যদি হ'ত, তবে এই ভক্ত হৃদয়ের অভিব্যঞ্জনায় গীতিনাট্যকারের স্বকীয় একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে উঠত— ব্যঙ্গের, করুণার বা ট্র্যাজিক চেতনার। সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোনো আধুনিক কবি যদি কখনো গীতাঞ্জলির ভাব নিয়ে কাব্যরচনা করেন, তবে তার পেছনে

এমনতর ব্যঙ্গের, করুণার, সকৌতুক বিস্ময়ের বা ট্র্যাজিডির সুর প্রচ্ছন্ন থাকবে— প্রচ্ছন্ন থাকবে এমন কোনো ইঙ্গিত যে এ 'মৌল নাস্তি'র অনন্ত অমার মাঝখানে ব'সে যে-মানুষের হৃদয়ে অনাবিল প্রশান্ত প্রেম জেগে ওঠে স্রষ্টা বা তাঁর সৃষ্টির প্রতি, কত আত্মপ্রতারক, অর্বাচীন বা মধ্য-ভিক্টোরীয় তার অন্ধ ভাবাবেগ!

কিন্তু গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ কাব্যবর্ণিত ভক্ত হৃদয়কে দূর থেকে সকৌতুকে বা সকরুণায় অবলোকন করছেন না, সে ভক্ত হৃদয় রবীন্দ্রনাথেরই। পাঠক যদি গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে এই নাটকীয় দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেন তবে আমি বলব গীতাঞ্জলির সুর তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছয় নি। শিশু কাব্যগ্রন্থে শিশুমনের প্রকাশের প্রতি পাঠকের যে-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, গীতাঞ্জলিতে ভক্ত-হৃদয়ের অভিব্যক্তির প্রতি সেই একই নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়া অসংগত। 'ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে / মিলিয়ে এল আলো' এবং 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে / আঁধার করে আসে', কিংবা 'আমার যেতে ইচ্ছে করে / নদীটির ঐ পারে' এবং 'আমি চঞ্চল হে / আমি সুদূরের পিয়াসী'— কবিতাদ্বয় পাশাপাশি পড়লে আমার বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। প্রথমত, শিশু থেকে উদ্ধৃত কবিতা দুটিতে যে ভাবদ্বৈত আছে, গীতাঞ্জলি ও উৎসর্গের কবিতায় তা অবর্তমান। দ্বিতীয়ত, শিশুর কবিতা পড়বার সময়ে আমরা কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিশুমনের সকৌতুক পরিচয় লাভ করি, কিন্তু গীতাঞ্জলি পাঠকালে আমরা কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরই মনের বেদনা ও ব্যাকুলতা অনুভব করি। শিশুর সুখদুঃখ আমাদের পক্ষে ঠিক অনুভব করা সম্ভব নয়, আমরা তার সহৃদয় দর্শকমাত্র। অপর পক্ষে, গীতাঞ্জলির বেদনা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত নয়, অনুভূত। এই সমানুভবতার প্রয়োজন আছে গীতাঞ্জলির মতো কাব্যের পূর্ণ রসসম্ভোগের জন্য।

কাজেই প্রশ্ন থেকে যায় কেমন ক'রে অভক্ত পাঠক, ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পাঠক, গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে সেই তাদাত্ম্য অনুভব করবেন যার অবর্তমানে এ-ধরনের গীতিকবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। প্রথিতযশাদের মধ্যে নাম করতে পারি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, গেল দশ বছরের বুদ্ধদেব বসু[৫] এবং শিবনারায়ণ রায়ের। এঁদের মনে কখনো এ-সমস্যা জেগেছিল কি না, এবং জেগে থাকলে তাঁরা কীভাবে তার নিরাকরণ করেছিলেন, ঠিক বলতে পারি না। আমার নিজের চোখে সমস্যাটি যে-রূপ ধারণ করেছে তার কিছু পরিচয় দিলাম। কোন্ পথে আমি সমাধান খুঁজেছি এবার সে-বিষয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

তার আগে দুটো কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো। প্রথমত, পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সাহিত্যকর্মীদের মন গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ থেকে যতটা দূরে অবস্থিত ব'লে আমার বিশ্বাস, আমার নিজের মন ততটা দূরে নয়, কাজেই যে গিরিদরী আমাকে লঙ্ঘন করতে হ'ল তা ততটা দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। স্রষ্টা, বিধাতা এবং ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা যদিচ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আমি কোনো অর্থেই জড়বাদী নই। মানুষের সমগ্র সত্তা শারীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ছকে কোনো দিন ধরা দেবে— একথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারি না। এমনকি, আমার বিশ্বাস জড়জগতের একটা চিত্রমাত্র পদার্থ-বিজ্ঞানে অনুরেখনীয় ও অনুধাবনীয়। অর্থাৎ যদিচ বিজ্ঞান আমার চোখে অতীব শ্রদ্ধেয় ও প্রণিধানযোগ্য, তবু আমি ভুলতে পারি না যে, অনেকান্ত বিশ্বজগতের একটা অন্ত বা দিক মাত্র বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, বাকিটা ধরাছোঁয়ার বাইরে, অপার গভীর

রহস্যে ঢাকা। উপরন্তু মানবেতিহাসে আমি একটি মন্থর, যদিচ উত্থান-পতন-বন্ধুর, অগ্রগতির আভাস দেখতে পাই। এবং লক্ষ কোটি বৎসর পর নাক্ষত্র-জগতের অবধারিত তাপমৃত্যুর ফলে মনুষ্যজাতির নিদারুণ বিনাশ ঘটবেই এ-দুশ্চিন্তা আমার ঈষৎ ক্ষীণ আশাবাদকে সমূহ আচ্ছন্ন করে না, কারণ আমি ওয়াইৎ-সেকরকে অনুসরণ ক'রে পদার্থবিজ্ঞানের এমনতর বহুদূরপাল্লার ভবিষ্যৎ-বাণীকে (তথা অতীত-বাণীকে) সন্দেহের চোখে দেখি।

এতৎসত্ত্বেও—এবং এটাই আমার দ্বিতীয় স্বীকৃতি—গীতাঞ্জলির সব কবিতা আমার মনে সাড়া জাগায় না। যেগুলিকে বলা যেতে পারে শুদ্ধা ভক্তির কবিতা (যথা, 'আমার মাথা নত করে দাও হে', 'একটি নমস্কারে প্রভু', 'তোমায় আমার প্রভু করে রাখি', 'আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না' ইত্যাদি), সুরের দিক থেকে কয়েকটি তার ভালো লাগলেও, ভাবের দিক থেকে আমাকে স্পর্শ করে না। উচ্চাঙ্গের কাব্যকৌশল এমনকি সুরের কৌশলও কোনো ব্যক্তি-স্বরূপিত সত্তার প্রতি আমার মনে কোনো প্রকারের দাসভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম নয়। এই বিশেষ মানসমুকুলটি ফুটিয়ে তুলবার মতো সার আমার মনের মাটিতে অনুপস্থিত। তবে সুখের কথা এই যে এ-ধরনের প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক-নির্ভর ভক্তিগীতির সংখ্যা সমগ্র গীতাঞ্জলির গানের সংখ্যার অনুপাতে অত্যল্পই।

গীতাঞ্জলিতে বহু সংখ্যক রোম্যান্টিক প্রেমের এবং প্রকৃতি-অনুরাগের গান আছে যাতে ভক্তির ছোঁয়া লেগেছে, অনেক সময়ে খুব আলগোছেই লেগেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি: 'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি', 'আরো আঘাত সইবে আমার', 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না', 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো', 'আমারে

দিই তোমার হাতে'— এগুলিকে নিছক প্রেমের গান মনে করলেও খুব ভুল করা হয় না। অন্য দিককার উদাহরণ : 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে', 'আজি বারি ঝরে ঝর ঝর', 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে', 'এসো হে এসো, সজল ঘন বাদল বরিষনে'— এগুলিকে তেমনি নিছক প্রকৃতির গান মনে করলে ভুল করা হয় না। ভুল করা হবে না বটে, তবে এই উভয় শ্রেণীর গানের মধ্যে ভক্তিভাবের আমেজ না দেখতে পেলে তার সম্পূর্ণ মূল্য অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

কিন্তু গুণ এবং মাত্রা উভয় নিরিখে গীতাঞ্জলির মূল সম্পদ হচ্ছে সেইসব গান যাতে ভক্তি এবং প্রেমের কিংবা ভক্তি এবং প্রকৃতি-অনুরাগের কিংবা তিনটেরই সংগম ঘটেছে। উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই— 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে', 'ও আমার মন যখন জাগলি না রে', 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' প্রভৃতি বহু সংখ্যক গান আমাদের খুবই পরিচিত ; গীতাঞ্জলি বলতে এইসব গানের কলিই সর্বাগ্রে মনে আসে।

দুটি কথা লক্ষ্য করবার মতো। প্রথমত, প্রেমের অথবা প্রকৃতি-অনুরাগের মধ্যেই ভক্তিভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এসব গানে। দ্বিতীয়ত, ভক্তি শব্দের প্রয়োগ এখানে তার সুনির্দিষ্ট সুপরিচিত অর্থে নয়, তার চেয়ে একটু ছড়ানো বা ঢিলেঢালা অর্থে। কারণ এসব গানে প্রিয়া বা প্রকৃতির সীমিত সত্তায় যে-অধরা, ধাবমান ছায়ার মতো মুহূর্তে সচকিত ক'রে দূরে-পালিয়ে-যাওয়া সত্তার আভাস রয়েছে তাকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসসম্মত, শাস্ত্রনির্দিষ্ট অর্থে ভগবান বলা একটু শক্ত। সেই আভাসিত সত্তার জন্য আকূতি আছে, আনন্দ ও বেদনা আছে, ভরসা ও

নৈরাশ্য আছে, বিস্ময় ও রহস্যবোধ আছে, এবং এইসব ভাবপুঞ্জ ঐহিক প্রিয়া ও প্রকৃতির জন্য যতটা স্বাভাবিক তাকে মাত্রায় ও গুণে ছাড়িয়ে গেছে, তবু এগুলির মিলিত সত্তার যে-ভাবাবেগ সমুৎপন্ন করে তাকে আভিধানিক অর্থে ভক্তি বলতে বাধে।

বাধাটা আরও পরিষ্কার হবে যদি এগুলির সঙ্গে আমরা তুলনা করি গীতাঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত খাঁটি ভক্তিভাবের গানের। সেখানে ভক্তি নির্দিষ্ট অর্থে ভক্তিই, আর পাত্র চলিত অর্থে ভগবানই। আগেই বলেছি এই শেষোক্ত গানের সম্যক রস-গ্রহণে আমি অনধিকারী। বাকী গানের বেলা এই অনধি-কারের বাধা নেই, কারণ সেক্ষেত্রে প্রেমের ও প্রকৃতি-অনুরাগের পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা জমি তৈরি ক'রে রেখেছে। প্রেমের বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের মনে খুব নিবিড় এবং প্রবল ভাবে জাগে তখন আমরা বোধ করি প্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা ঐ সীমাটুকুর মধ্যে ধরা দেয় নি যে-সীমা শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস টেনে রেখেছে প্রেমেতর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায়-চেনা মানুষের চারিদিকে; সেই মানুষকে যখন আমরা প্রেমের মধ্যে গ্রহণ করি তখন সে যেন এক অসীম রহস্যময় লোকোত্তর সত্তায় মিশে যায় বা তার রক্ত-মাংসের প্রতীক হয়ে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রবল অনুভূতিও (বিশেষত ঐ সৌন্দর্য যদি সেই পর্যায়ভুক্ত হয় ইংরেজিতে যাকে সাব্লাইম বলে) আমাদের এক রহস্যঘন অনন্তলোকের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

খেয়া এবং গীতাখ্য তিনখানি কাব্যে অধিকাংশ কবিতার লগ্ন হয় গোধূলি নয় গভীর অন্ধকার রাত্রি, স্থান নির্জন নদীতীর কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তর। ঐ সময়ে অমন স্থানে এক অবর্ণনীয় অপার রহস্যের আবছায়া অনুভূতি আমাদের মতো সাধারণ

মানুষের মনকেও দ্রবীভূত করে, কবির মনকে যে অভিভূত করবে তা আর বিচিত্র কি। তখন মনে হয় আমরা যেন অন্য এক জগতে চলে এসেছি, যেখানকার প্রত্যেকটি দৃশ্য একটি কম্পমান যবনিকা— যদি হঠাৎ স'রে যায় সে-যবনিকা (কখনো স'রে যাবে না তা অবশ্য জানি) তবে আমরা এমন এক সত্তার মুখোমুখি হব যা ধারণার অতীত, কিন্তু অনুভূতির অগম্য নয়। এ-অনুভূতিকেও মিস্টিক বলা যায়, যদিও ধর্মাত্মা সাধকদের তপস্যালব্ধ তূরীয় অবস্থার কোনো অভিজ্ঞতার সমপর্যায়ভুক্ত নয় সে অনুভূতি। উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্রে— নাস্তিক পাত্রেও— এ-ধরনের অনুভূতি আপনিই জাগে এবং ক্ষণকালের মধ্যে আপনিই মিলিয়ে যায়। সে-'মুগ্ধক্ষণ' কেটে গেলে আবার নদীকে নিতান্তই জলস্রোত এবং পাহাড়কে নিছক শিলাখণ্ডই বোধ হয়।

প্রেম ও প্রকৃতির মধ্যে এই যে অধরার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, তাকেই আরও ইঙ্গিতময় ও প্রত্যক্ষগোচর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানগুলিতে আমি একেবারে অপরিচিত অনভিজ্ঞাত অনধিগম্য ভাবের ব্যঞ্জনা পাই না; প্রিয়া ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে যা আগেই পেয়েছি তারই উন্নীততর, সূক্ষ্মতর, পূর্ণতর এবং সর্বোপরি স্পষ্টতর (নান্দনিক অর্থে স্পষ্টতর) রূপ দেখে মুগ্ধ হই। গীতাঞ্জলি পড়বার সময়ে সবিস্ময়ে অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ধ'রে হাঁটছি, একটু এদিকে সরলে পা পড়ে মর্ত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিকে সরলে বাতাসে পাই অমৃতলোকের গন্ধ।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত ইংরেজি গীতাঞ্জলির কল্যাণে পশ্চিমের এবং এদেশের অবাঙালী পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথকে মোটের উপর ভক্তিরসের কবি ব'লেই জানেন; অর্থাৎ অত্যন্ত আংশিকরূপেই জানেন। ভক্তিরস তাঁর একটি বিশেষ পর্বের

(কালের দিক থেকে দশ-বারো বৎসরের) মধ্যে সীমাবদ্ধ। বারো বৎসর অবশ্য খুব অল্পকাল নয়, তবে যিনি ষাট বৎসরের অধিককাল কাব্যসাধনা করেছেন তাঁর কবি-পরমায়ুর ক্ষুদ্র অংশ তো বটেই। কিন্তু ঐ সময়ের কবিতাও যে বিশুদ্ধ ও অনন্যাশ্রয়ী-ভাবে ভক্তিরসের কবিতা নয় সেটা আরো একটু বিশদ ক'রে একটু অন্য দিক থেকে বলা হয়তো বাহুল্য হবে না।

ভক্তের মন একান্তভাবে ঈশ্বরে তন্ময়, নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকার কথা নয় তার। ভক্তিরস বাৎসল্যরসের মতোই একতরফা; মা যেমন শিশুর কাছে, ভক্ত তেমনি ভগবানের কাছে নিজেকে নিঃশেষে কেবল ঢেলে দিতেই চায়, প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা রাখে না, দাবি তো নয়ই। কিন্তু গীতাঞ্জলির কবি আত্মবিস্মৃত মোটেই নন, গীতাঞ্জলির ভাবজগতে দান যেমন অকৃপণ, প্রতি-দানের দাবিও তেমনি অকুণ্ঠ, আত্মবিসর্জন এবং আত্মস্ফুরণ দু বিপরীত ভাবের ব্যঞ্জনা একাধারে বিধৃত। একদিকে যেমন শুনি-

আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি।

অন্যদিকে তেমনি জানতে পারি—

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?

একদিকে যেমন—

আরো প্রেমে, আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে

অন্যদিকে তেমনি—

আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের
বহুক না তুফান।

একদিকে—

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।

অন্যদিকে—

যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।

এই দ্বিতীয় সুরটি কবীরের দোঁহার মতো বিশুদ্ধ ভক্তিকাব্যে স্বভাবতই শোনা যায় না, কারণ এ-সুরটি প্রেমের, ভক্তির নয়। প্রেমিক সর্বদাই প্রতিদান চায়, না পেলে তার প্রেম ব্যর্থ, আত্মনিবেদন বৃথা। প্রেমাস্পদের জন্য যত উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, উদ্বেলতা থাক, আত্মবিস্মৃত নয় প্রেমিক। কবীরের কাব্য ভক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল কিন্তু প্রেমের লক্ষণে দীন একথা মানতেই হবে। কবীরের সঙ্গে তুলনার বিশেষ গুরুত্ব আছে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবীরকে তাঁর পূর্বসূরীরূপে পাশ্চাত্ত্য এবং সেই সূত্রে এ-দেশীয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্ত্য একদল ধর্মব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এইসব কথা খ্রীষ্টধর্মেরই প্রভাবে লেখা এবং আমাদের দেশের বহু লোক সেই কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন··· তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ ক'রে দেখাতে হ'ল এই জাতীয় ভাব ইংরেজ আমলের পূর্বে এই দেশে ছিল, কবীরের মধ্যে ছিল।'

অথচ এমনি কপাল যে ঐ অনুবাদ প'ড়ে য়েট্‌স্ প্রমুখ কয়েকজন বিদগ্ধ পশ্চিমী পাঠকের মনে হয়েছিল এ-অনুবাদ না ছাপলেই ভালো করতেন রবীন্দ্রনাথ, কেননা তাঁর কাব্যিক অর্থাৎ ঈষৎ জোলো ভক্তিরস কবীরের খাঁটি গাঢ় ভক্তিরসের তুলনায় একটু পান্‌সে ঠেকে। এঁরা লক্ষ্য করলেন না যে, কবীর শুধু খাঁটি ভক্ত নন, মূলত ভক্তই, কবিতা তাঁর পক্ষে গৌণ কর্ম, কবি

না হলেও তাঁর ভক্তিরস বিন্দুমাত্র খণ্ডিত হ'ত না। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ খাঁটি কবি এবং মূলত কবিই, ভক্তি তাঁর কাব্যসৃষ্টির উপাদান এবং একমাত্র উপাদান নয়, ভক্ত না হলেও তিনি উঁচু দরের কবি হতেন, কিন্তু কবিতায় প্রকাশের সার্থকতা না পেলে তাঁর ভক্তিরস অচিরে শুকিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, কবীরের দোঁহা বিশুদ্ধ ভক্তিরই প্রকাশ, তাতে প্রেমিক-প্রেমিকার সেই ভাবগত আদান-প্রদান নেই যা গীতাঞ্জলির ভক্তিকাব্যকে অন্য এক স্তরে নিয়ে গেছে। কবীরের ভক্তিরসের সঙ্গে যা মিশেছে তা প্রেম নয়, বিশুদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যান এবং ধর্মদেশনা : 'The creature is in Brahma and the Brahma is in the creature, they are ever distinct yet ever united.' (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)— এই ধরনের পঙ্ক্তির অপ্রতুলতা নেই তাঁর কাব্যে। দু-এক জায়গায় স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমাস্পদের প্রতীক থাকা সত্ত্বেও (এ-প্রতীকের ব্যঞ্জনাশক্তি খুবই দুর্বল সেখানে) সর্বত্র যা প্রকাশ পেয়েছে তা কেবল এক পক্ষের আকূতি এবং আত্ম-নিবেদন— সেটাই ভক্তির ধর্ম। অপর পক্ষ যে পরমেশ্বর, তিনি কেমন ক'রে ব্যাকুল হবেন কারও জন্য ? গীতাঞ্জলির ভগবান কিন্তু আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ নন ('আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে'), তিনি বিরহী ('আমার মিলন লাগি তুমি / আসছ কবে থেকে', 'তুমি পার হয়ে এসেছ মরু / নাই যে সেথায় ছায়াতরু') ; তিনি চোখের জলও ফেলেন :

সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে
এই-যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে
ওগো বন্ধু, বলো দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি ?
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে।

এমনতর বিরহ-ব্যাকুল মিলন-তৃষ্ণার্ত ত্রিভুবনেশ্বরের চিত্রকল্প কবীরের রচনায় আশা করা যায় না, ভাবাই যায় না।

এ-সবই পাওয়া যাবে অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীতে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতায় 'প্রেমভক্তি-আত্ম-নিবেদন-মিশ্রিত বৈষ্ণবীয় ভঙ্গির আমেজ লাগিয়াছে।'[৬] প্রেমের ধারা যে বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির তুল্য সংরক্ত, প্রাণস্পন্দিত ও প্রকাশোজ্জ্বল প্রেমের কবিতা যে-কোনো সাহিত্যে দুর্লভ, এবং রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে তার নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। সন্দেহ উপস্থিত হয় অন্য দিক দিয়ে। বৈষ্ণব কাব্যের যে-পদগুলির সঙ্গে আমরা অত্যন্ত পরিচিত এবং যার কাব্যিক উৎকর্ষ সর্বসম্মত, তাতে প্রায়ই প্রেমের লক্ষণ কি ভক্তির লক্ষণকে ছাড়িয়ে যায় নি? অনেক সময়ে মনে হয় যেন ভক্তির ছদ্মবেশে নিরতিশয় মানবিক প্রেমই অভিব্যক্ত; ছদ্মবেশটাও যে সর্বত্র ধারণ করা হয়েছে তা নয়। বিদ্যাপতি সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন—'বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ ব্রজের রাধা বা বাসুদেবনন্দন কৃষ্ণ বলিয়া একেবারেই ঠাহর হয় না। সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার রূপটিই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে পাই'[৭]—তা কি চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ পদাবলী সম্বন্ধেও বলা যায় না? এটাও ভাববার কথা যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্যের সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের একাত্মতা বোধ করেন নি, নইলে 'পাশ্চাত্ত্য ধর্ম-ব্যবসায়ীদের' ভুল শোধরাবার জন্য কেবল কবীরের দোঁহার ইংরেজি তর্জমা ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, অন্তত কয়েকটি বৈষ্ণব পদের অনুবাদও সংযোজিত ক'রে নিজের এ-দেশীয় পূর্বসূরীদের

পরিচয় পূর্ণতর করতেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে কবীরও খেয়া-গীতাঞ্জলি রচয়িতার পূর্বসূরী ছিলেন না। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশে ভারতীয় ভাবধারার ও সৃষ্টিকর্মের পূর্বাপরতা যতখানি লক্ষণীয়, অপূর্বতা তার চেয়ে ঢের বেশী। তবে অপূর্বতা তাঁর ভুঁইফোড় ছিল না, দেশের মাটির মধ্যে বহুদূরবিস্তৃত এবং শক্ত তার শিকড়।

১ 'The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective correlative'; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that *particular* emotion ; such that when the external facts, are given, the emotion is immediately evoked.'

T. S. Eliot : Essay on "Hamlet and his problems"

২ 'অভিনব যদিও কাব্যার্থকে রস বলিয়া বলিয়াছেন এবং কাব্যের একান্ত তাৎপর্য রসের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে এবং কবি যে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্বভুবনের সত্যকে নিত্য নবোন্মেষিণী বুদ্ধির দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।'

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—কাব্যবিচার, পৃ ১৩৪

৩ 'I can only conclude that I cannot, in practice, wholly separate my poetic appreciation from my personal beliefs.'

T. S. Eliot : *Dante*, p. 54

৪ 'রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্ম সংগীতগুলি প্রচলিত ধর্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোনো অধ্যাত্ম অনুভূতি

জাগে নাই—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপন বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই।'

অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাব্যপরিক্রমা, পৃ ১১০

৫ এই অধ্যায়টি "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বুদ্ধদেব বসুর কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার পাঠ ক'রে লক্ষ্য করলাম যে আমার সমস্যার কাছ ঘেঁষে তিনি নিম্নপ্রকার উক্তি করেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের সে-সব কবিতাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে হৃদয়-গ্রাহী, যেগুলি সবচেয়ে কম স্পষ্ট ও নিশ্চিত। তাঁর প্রতিভার এই বিশেষ চরিত্রলক্ষণটি বেরিয়ে আসে তাঁর ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র তুলনা করলে। 'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে, / শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে' : যদি 'গীতবিতান'-এ মুদ্রিত না থাকতো তাহ'লে এই ঈশ্বরবিশ্বাসী উত্তম-ভাবসম্পন্ন গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা ব'লে বিশ্বাস করা সহজ হ'তো না ; উপরন্তু, এক 'দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ' ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকেও গ্রহণ করতে আমাদের কারো-কারো আপত্তি হ'তে পারে। কিন্তু 'আলোয় আলোকময় কর হে / এলে আমার আলো'—এই কবিতাটিতে 'আলো' বলতে কী বোঝাচ্ছে তা অস্পষ্ট ব'লেই অনাস্থার অপনোদন ঘটে, আমরা তৎক্ষণাৎ অতি সহজে কবির কাছে আত্মসমর্পণ করি। (পৃ ৮১-৮২)

কিন্তু গীতাঞ্জলির অনেক কবিতার ব্যঞ্জনা বুদ্ধদেব-উদ্ধৃত কবিতার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট ; ভগবানকে সেখানে 'আলো'-র মতো শব্দের আড়ালে রাখা হয় নি, 'প্রভু', 'নাথ', 'রাজার রাজা' ইত্যাদি সম্বোধনে তাঁকে চিনতে আমাদের একটুও দেরি হয় না। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাটিই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ ; প্রথম ছয়টি কবিতাই উদাহরণরূপে পেশ করা যায়। এই কবিতাগুলি কি বুদ্ধদেবের কাছে 'হৃদয়গ্রাহী' ঠেকে না ? যদি না ঠেকে তবে কি সেখানে ভগবানের অনাবরণ উপস্থিতিই তার কারণ, অন্তত অন্যতম কারণ ? তিনি কি মানেন যে কবি ও পাঠকের মধ্যে বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গির মৌল বিরোধ কাব্যরসসম্ভোগের অন্তরায় হতে পারে ? তাঁর কাছে থেকে এ-প্রসঙ্গের আরও বিশদ আলোচনা পেলে আমি (এবং আমার মতো অনেক পাঠক) উপকৃত বোধ করব।

৬ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৯৭

৭ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও অন্যান্য মহাজন পদকর্তা, কবিপরিচয়

কালের দিক থেকে বলাকা গীতাঞ্জলি পর্বের অব্যবহিত পরে, কতকটা সমসাময়িকও বটে। বলাকার কবিতা লেখা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে, গীতালির গান লেখা তখনো শেষ হয় নি। অথচ ভাবের দিক থেকে ব্যবধান অনেকখানি। বলাকা-ছন্দের নূতনত্ব শুধু ছন্দ নিয়ে পরীক্ষার ফল নয়, নতুন প্রাণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল নতুন কলেবরের। কাব্যের আঙ্গিক-বদল সব সময়ে হার্দ্য পরিবর্তনের তাগিদেই যে ঘটে তা নয়— এমনকি রবীন্দ্র-কাব্যেও না। উদাহরণত, পুনশ্চ-র গদ্যকবিতা ভাবের বিচারে খুব অভিনব নয়। শেষ পর্ব নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রকাব্যের এক নতুন পর্ব, কিন্তু সে নূতনত্বের স্বাক্ষর পরিশেষ-এর নিয়মানুগ ছন্দেই সুস্পষ্ট, গদ্যকবিতায় তা নূতনতর হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অবশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী: 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস, এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।' শেষ দশকের কবিতায় কাব্যের অধিকারকে তিনি অনেক দূর প্রসারিত করেছিলেন নিশ্চয়ই, তবে তা ছন্দ ভাঙার অপেক্ষা রাখে নি। বলাকা কাব্যে কিন্তু নতুন কালের করাঘাতে ছন্দের মুক্তি ও ভাবের উন্মোচন একই সঙ্গে ঘটে।

গীতাঞ্জলিতে কাল তার গতিধর্ম হারিয়ে এক নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দ অকূল সরোবরে পরিণত হয়েছিল। বলাকাতে পশ্চিমী গতিবেগের যৌবনোচিত চাঞ্চল্য দেখা যায়, এবং সাম্প্রতিক কালের বিক্ষোভ। আমরা অবিরাম শব্দ শুনি পাড়-ভেঙে-চলা

স্রোতস্বিনীর। ৮ সংখ্যক কবিতায় কবি স্বয়ং এই উপমা ব্যবহার করেছেন; নাম-কবিতাটিতে কালের উদ্দামতা আরো মনোগ্রাহী চিত্রকল্পে অভিব্যক্ত।

প্রসঙ্গত, লক্ষ্য করবার বিষয় যে কালচেতনা কর্মচেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভক্তি কালাতীত ব্যাপার, এমনকি তাতে ইহকাল-পরকালের ভেদ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কর্মব্রতী মানুষের একটি চোখ থাকে উপস্থিত কালের উপর নিবদ্ধ, আর একটি চোখ প্রসারিত হয় অনাগত কিন্তু ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে। সে চায় অবস্থার পরিবর্তন—কখনো সংস্কারের পথে, কখনো বা বিপ্লবের। কাজেই কালের গতিশীলতা সে ভুলতে পারে না।

গীতাঞ্জলির কবি ছিলেন সমাজ থেকে বেশ একটু দূরে, আপন পরান-সখার সঙ্গে একান্তে আসীন, বা এক তরীতে কূলহারা কিন্তু প্রশান্ত—কানে-কানে গান শোনানো যায় এতটা প্রশান্ত —সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। বলাকার কবি সারা পৃথিবীর দুঃখ ও পাপের ভারে নিপীড়িত। আমরা জানি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রকাশ্য ধ্বংসলীলা আরম্ভ হবার কিছু পূর্বেই মানবজাতির কোনো অজ্ঞাত মহাবিনাশ আসন্ন জেনে তাঁর মন কী-রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। যখন যুদ্ধ বাধল, 'মৃত্যুর গর্জন' কবির কানে এসে পৌঁছল, তখন তা শুধু বেদনাদগ্ধই করল না তাঁকে, কর্মেও উদ্বুদ্ধ করল। মানসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'; বলাকা সম্বন্ধে লিখতে পারতেন, 'কবির সঙ্গে যেন একজন কর্মী এসে যোগ দিল'। এই কর্মীপুরুষকে আমরা আগের কোনো কোনো কাব্যেও দেখেছি, বিশেষত নৈবেদ্যে। কিন্তু এতখানি সমাজ-সচেতন, অমঙ্গলপীড়িত, দেশ-বিদেশের দুঃখ ও পাপ বিষয়ে কর্তব্য-

ভারগ্রস্ত কর্মীপুরুষের অস্তিত্ব ইতিপূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল। গীতাঞ্জলিতে যিনি সহজ মনে বলতে পেরেছিলেন—

কথার পাকে কাজের ঘোরে
তলিয়ে রাখে কে আর মোরে
তাঁর স্মরণের বরণমালা
গাঁথি বসে গোপন কোণে,—

বলাকায় এসে তাঁর মনে পড়ল বিধাতা তাঁর উপর কেবল বাঁশি বাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করেন নি। অকস্মাৎ যেন ভাবের ঘোর কেটে গেল, মাটির দিকে চেয়ে দেখলেন— তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে আছে। পূর্ববর্তী ভক্তিপর্বের তদ্গত আত্মনিমজ্জিত ভাবটাকে লক্ষ্য ক'রেই বোধ হয় বললেন :

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

অতএব শান্তি-স্বর্গ খোঁজা আর হ'ল না, পূজার ঘরে কুলুপ লাগিয়ে বেরিয়ে আসতে হ'ল আঘাত-সংঘাত-মুখর জনসমাজে। এই কবিতার গদ্য-ব্যাখ্যায় কবি বলছেন, 'সে সময়ে পূজাকেই একমাত্র কর্তব্য ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবী এল, হঠাৎ মনে হ'ল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে

হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গণ্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় তো ডাকতে হবে।'

'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো / বেদনায় যে বাণ ডেকেছে' কিংবা 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে / পরাও রণসজ্জা' যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (৫ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১), তখন সর্বনাশা মহাযুদ্ধ এসে পৌঁছয় নি, তবে বিপুল সমারোহে ও বিকট দম্ভে আটঘাট বাঁধা হচ্ছিল ভিয়েনায়, বের্লিনে, পীটার্সবার্গে, প্যারিসে, লণ্ডনে; প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। যুদ্ধের খবর পেয়ে লিখলেন বলাকার ৫ সংখ্যক কবিতা। লক্ষণীয় যে এত বড় সর্বনাশের খবর পেয়ে যে-কথাটা প্রথমে তাঁর মনে এল সেটা এই নয় যে সর্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের বিধানে এমন দুঃসহ দুঃখ কোটি কোটি মানুষকে সইতে হবে কেন? মনে এল—

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।

; যত ভয়ানক হোক. যত কোটি মানুষই ডুবে মরুক, তবু কবির ৷ সন্দেহ নেই যে তাঁর নেয়ে, মানবেতিহাসের নেয়ে, কালসাগর পাড়ি দিয়ে আসছেন: প্রশ্ন শুধু এই— কোন্ সম্পদ নিয়ে আসছেন তিনি এবং কোন্ ভাগ্যবান দেশের জন্য:

নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন রতনের বোঝা
আসছে তরী বেয়ে।
... ...
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে।

—আশ্চর্য প্রশ্ন এবং আশ্চর্য এর মূলীভূত প্রত্যয় ('যুদ্ধের সমুদ্র

পার হয়ে নাবিক আসছেন')। কিন্তু প্রত্যয়ান্তরের সূচনাও বলাকাতেই পরিলক্ষ্য।

মহাযুদ্ধের অভিঘাত অনেক বেশি স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে বছর খানেক পরে লেখা ৩৭ সংখ্যক কবিতায় :

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন;

মহাযুদ্ধের বীভৎসতা এই 'উদাসীন' কবির চিত্তে নতুন চেতনার উদ্রেক করল, বিশ্ববিধান ও বিধানকর্তা সম্বন্ধে তাঁর এতদিনকার কুসুমাস্তীর্ণ বিশ্বাস-ভূমি ধীরে ধীরে প্রশ্ন-কণ্টকিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন পুরানো সত্যের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, গীতাঞ্জলির যে-বন্দরে এতকাল তাঁর ভাবের তরী অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল সেখান থেকে নোঙর তুলতে হবে, এই বিষশ্বাস-ঝটিকার মাঝখানে তরী বেয়ে চলতে হবে তাঁকে।—

বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীরপানে
দিতে হবে পাড়ি।'

কিন্তু যে-নতুন মানসভূমির দিকে তরী চলেছে তার ভূ-প্রকৃতি, তার তটরেখা, এমনকি তার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো ধারণা ছিল না তখন। শুধু জানতেন :

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

কবিতার স্তবকে স্তবকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত একটি সক্ষোভ এবং সাগ্রহ আওয়াজ— 'বন্দরের কাল হল শেষ'।

এই পর্যন্ত কবিতাটি সুন্দর; এর পর থেকে তার কাব্যপ্রাণ কতকটা চাপা প'ড়ে গেছে তত্ত্বকথা আর উপদেশবাণীর ভারে। নৈবেদ্যে উল্লিখিত বোয়ার যুদ্ধের চেয়ে এই বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মনের আরও অনেক গভীরে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এবারেও অন্তত প্রথম দফায় তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে পশ্চিমের কয়েকটি বলদৃপ্ত রাষ্ট্রের উৎকট স্বাজাত্যভিমান ও হিংস্র সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং সেই মহাপাপের প্রচণ্ড শাস্তি রূপেই দেখেছিলেন। কিন্তু এ-দেখা একপেশে; সমাজ-সংস্কারকের পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক, কবির পক্ষে ক্ষতিকর। আগেই বলেছি, গীতাঞ্জলিতে যিনি ছিলেন নিছক প্রেমভক্তিরসের কবি, বলাকায় তিনি মানুষকে কঠিন কর্তব্যের পথে আহ্বান করার শঙ্খ হাতে তুলে নিলেন। তবে এ-কথা ভুললে চলবে না যে কর্মপ্রেরণা কোনো কবির, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো কবির— যিনি আধুনিক ও বৈদিক উভয় অর্থে কবি— মূল প্রেরণা হতে পারে না। তাই মহাযুদ্ধের প্রতি তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ধর্মনীতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রইল না বেশিদিন, কবির সংবেদনী চিত্ত ধর্মোপদেষ্টার নীতি-বাক্যকে ছাপিয়ে উঠল।

দুঃখ-কষ্টের দুই প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রাচীন ধর্মমতে। এদেশীয় ব্যাখ্যা হ'ল— মানুষের দুঃখ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত এবং জাগতিক নিয়মানুগ, ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। কর্মভোগ সমাপ্ত হলে এবং এ-জন্মের পাপ-পুণ্যের খতিয়ানে পুণ্যের পাল্লাটা ভারী থাকলে পরজন্মে উন্নতি এবং সুখলাভ অবধারিত। সেমিটিক ধর্মের শিক্ষা অন্যপ্রকার। মানুষের পার্থিব পরমায়ু তার অনন্ত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। ঐহিক দুঃখ-কষ্টের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ধর্মে মতি তার খাঁটি এবং টেঁকসই কি না। যদি পরীক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় তবে ইহজীবনে না হোক পরকালে অক্ষয় আনন্দের দ্বারা তার স্বল্পকালীন ঐহিক যন্ত্রণার বহুগুণীকৃত ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর যদি পরীক্ষায় তার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয় তবে ঐহিক এবং পারত্রিক সমূহ দুর্ভোগ আছে তার কপালে। অবশেষে যথাবিহিত নরক-যন্ত্রণার পর তার পাপক্ষালন হবে, সে গৃহীত হবে ঈশ্বরের অপার করুণায় ও প্রেমে।

মানুষের ঐহিক দুঃখভোগের এসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও সাফাই রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনির্ভর মন গ্রহণ করতে পারে নি। পারে নি ব'লে তার এক অভিনব স্বকীয় ব্যাখ্যা তৈরি করলেন তিনি। ঐ সময়ে শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত একটি অভিভাষণ 'পাপের মার্জনা'য় তার মূল কথাটা পাওয়া যাবে। এই যুদ্ধ যে-অসহ্য দুঃখ-কষ্ট বহন ক'রে নিয়ে আসছে 'তার সমস্ত বেদনা কোনখানে গিয়ে লাগছে? কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে।' অগণ্য নিরীহ মানুষের উপব এমন নিষ্ঠুর আঘাত কেন? —দুঃসাহসিক প্রশ্ন, কিন্তু সহজেই তার সমাধান খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন:

'যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে? কিন্তু, এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়।'

তথ্যের দিক থেকে কথাগুলি নির্ভুল। পিতার ব্যভিচারের ফলে পুত্র সিফিলিস রোগে অন্ধ হয়, রাজা বা রাষ্ট্রপতি দুর্নীতি-পরায়ণ হলে প্রজাবর্গের কপালে অশেষ যন্ত্রণা থাকে, নাৎসীদের জঘন্য জাতিবিদ্বেষের ফলে ষাট লক্ষ নিরপরাধ ইহুদী প্রাণ হারায়। এমনটা হয়ে থাকে, কিন্তু এমনটাই কি হওয়া উচিত? এই সব নির্দোষ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে কি আমাদের বিবেক পীড়িত হয় না, ন্যায়নীতিবোধ বিদ্রোহ ক'রে ওঠে না? পাপ যে করবে তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, আর যে নিষ্পাপ সেই পাপের মার খেয়ে মরবে— এ প্রকৃতির অন্ধ নিয়ম হতে পারে, বিধাতার মঙ্গলবিধান হতেই পারে না। কোনো পিতা যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের অপরাধের শাস্তি দেয় কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার ক'রে যেহেতু তাকেই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, তা হলে আমরা বলবই— অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এই শাস্তি দেওয়া হ'ল। আমাদের পরম পিতা যদি প্রবলের পাপের শাস্তি দুর্বলকে দেন, তবে কি বলব না তিনি ততোধিক অন্যায় করেছেন? রবীন্দ্রনাথ এই ব'লে তার সমর্থন করতে পারেন না যে 'অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তরে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পর গাঁথা হয়ে আছে।'

একটি জীবদেহে যেমন বহুকোটি জীবকোষ তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে এক বৃহত্তর যৌগিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে যায়, কোনো মনুষ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত বহু লক্ষ মানুষ তেমন ক'রে তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সমাজদেহের

অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র হয়ে যায় না। সমাজসেবার উদ্দেশ্যও ব্যক্তির আত্মস্ফুরণ, আত্মবিলোপ নয়; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব, মৌমাছিতন্ত্রে নয়। চরিত্রনীতির ক্ষেত্রে এই মানবিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। পাপ-পুণ্য, অপরাধ-শাস্তি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। মনুষ্যসমাজ পাপচিন্তা ও পাপাচরণ করে না, এক বা একাধিক ব্যক্তিই করে। পাপ যারা করে আর শাস্তি যারা পায় তারা যদি ভিন্ন হয়, তবে তা বিশ্ববিধানের ত্রুটি। কার্যকারণ শৃঙ্খলা তাতে অটুট থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মনীতি থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ এসব কথা তখন ভাবেন নি, বরঞ্চ পদ্যের আবেগ-পূর্ণ ভাষায় ব্যক্তির পাপ ও শাস্তিকে সমাজের পাপ ও শাস্তির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে এক ক'রে দেখিয়েছেন :

হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।

পৃথিবীর এক স্থানে তাপবৃদ্ধির ফলে ঝড় ওঠার সঙ্গে সমাজের এক স্থানে পাপ জ'মে ওঠার ফলে সামাজিক ঝড়ের তুলনা বলাকার অন্য একটি কবিতার গদ্য-ব্যাখ্যায় সবিস্তারে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বায়ুমণ্ডলের কোনো-এক অংশ যদি উত্তপ্ত হয়ে তনুত্ব-প্রাপ্ত হতে থাকে তা হলে অনেকক্ষণ তার কোনো ফল দেখা দেয় না। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে ভীষণ ঝড় ওঠে, হাজার হাজার ক্রোশ জুড়ে বনপ্রান্তর লোকালয় সব ছারখার ক'রে দেয়। তেমনি সমাজের কোনো-এক অংশে পাপ জমতে জমতে যখন একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন বিধাতার শাস্তি নেমে আসে ভয়ংকর রূপে, অনেক সময় মহাযুদ্ধ রূপেই। কিছুকাল

পরে পাপক্ষালন হলে, সমাজ শুদ্ধ হলে, শাস্তির মেয়াদ ফুরোয়, আবার আসে শান্তি, স্বস্তি, আশীর্বাদ।

কবিজনোচিত সুন্দর উপমা, কিন্তু উপমামাত্র। পাপ ও তজ্জনিত দুঃখের এই ধরনের সরল কাব্যিক ব্যাখ্যায় একটা চারিত্র্যনৈতিক ফাঁকি আছে, সেটা রবীন্দ্রনাথের সুষ্ঠু সুষম বিচার-শক্তির কাছে ধরা না প'ড়ে পারে না। বছর পনেরো পর যখন বিহারের নিদারুণ ভূমিকম্পকে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-পাপের ভগবৎকৃত শাস্তি ব'লে ঘোষণা করলেন তখন রবীন্দ্রনাথই প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর একটা বড়ো যুক্তি ছিল যে— এ পাপের প্রধান পাপী তো সেই উচ্চবর্ণ হিন্দুরাই, অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই পাকা দালান-কোঠায় বাস করত ব'লে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। অপর পক্ষে, অচ্ছুৎরা বেশির ভাগই বাস করত মাটির ঘরে, তাদেরই সর্বনাশ হ'ল। অর্থাৎ পাপের মার যারা খেয়েছিল, শাস্তির মারও পড়ল তাদেরই পিঠে। মহাযুদ্ধের বেলাও তাই ঘটেছিল। যে-অল্পসংখ্যক ক্ষমতামদমত্তদের সাম্রাজ্যলিপ্সা ও ধনলোলুপতা ঐ যুদ্ধ বাধিয়ে তুলল, তারা তো দিব্যি বহাল তবিয়তে রইল ; উপরন্তু, দুই হাতে মুনাফা লুটল। আর তাদেরই দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হ'ল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাল, সব দিক দিয়ে সর্বস্বান্ত হ'ল।

প্রচলিত বা তাঁর স্বকীয় ধর্মতত্ত্ব যা-ই বলুক, কবির সংবেদনী ও ব্যথিত হৃদয় উপলব্ধি করল যে, কোনো ধর্মোপদেশ বা নীতি-বাক্যের দ্বারা এতগুলো মানুষের এত বড়ো দুঃখ-দুর্দশাকে ঢাকা যায় না। 'য়ুরোপের দম্ভ ও লোভ সর্বজাতির কল্যাণযাত্রার পথ রুদ্ধ ক'রে জগদ্দল পাথরের মতো সবার বুকের উপর চেপে থাকবে— এটা কখনো বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না।'— এ-কথা যেমন ভাবুক রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ঙ্গম করলেন, তেমনি কবির

সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে এ-কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ‘উপরিতলের রাজনীতিওয়ালাদের ক্ষমতার কাড়াকাড়ি’র পরিণামে য়ুরোপের তথা সারা দুনিয়ার নিম্নতলের কোটি কোটি নিরীহ অসহায় মানুষের সর্বনাশ ঘটুক— এটাও বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না।

অথচ সর্বনাশ তো ঘটল। এ এক নতুন উপলব্ধি। বস্তুত এত বিরাট, এত ভয়াবহ, এত দুর্বিষহ ও দুর্বোধ্য আকারে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ও পাপের চেহারা ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি, কল্পনার চক্ষেও না। এর ফলে তাঁর ধর্মচিন্তা, জীবনবোধ, হৃদয়ানুভূতির বর্ণালি, কাব্যরচনার ধারা— সবই বদলে গেল। একটু তলিয়ে দেখলে এই নতুন কবির পরিচয় বলাকাতেও আমরা পেতে পারি; তবে তার অব্যর্থ স্বাক্ষর শেষ পর্বের (অর্থাৎ পরিশেষ ও তৎপরবর্তী) কাব্যেই পরিলক্ষ্য।

পূর্বে উদ্ধৃত ৩৭ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যদিচ ‘নিখিলের হাহাকার’ শুনেও তরী বেয়ে চলেছেন ‘চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন’, দুঃখ ও পাপের ‘অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ’-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছেন, ‘তোরে নাহি করি ভয়’, বলছেন, ‘শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক’ ; কিন্তু স্পষ্টতই বিশ্বাসের ইমারত ঠিক আগের মতো মজবুত নয় আর, সংশয়ের ফাটল এবং সে-ফাটলকে পলেস্তারা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা দেখা যায়। কবি যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করছেন, নিজেকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, ‘দেবতার অমর মহিমা’ সাময়িকভাবে ঝাপসা হয়েছে মাত্র, মহাযুদ্ধের ঘন কুজ্ঝটিকা কেটে গেলে আবার পূর্ণ জ্যোতিতে ভাস্বর হবে। বলছেন, কিন্তু আশ্বাসবাক্যে অন্য এক ইঙ্গিত ধরা পড়ে, ধরা পড়ে ‘মানুষের ধর্ম’-রচয়িতার মানবিক ধর্মমতের পূর্বাভাস।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কবিতার উপান্ত্য প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর অবশ্যই 'হ্যাঁ', কিন্তু কবিতাটি প্রশ্নেই শেষ হয়। এবং উহ্য উত্তরের পিছনে আরও কিছু উহ্য থাকে। মানুষ অযুত নিযুত বৎসর ধ'রে দুঃসহ দুঃখ ভোগ ক'রে দুঃসাধ্য জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে আপন মর্ত্যসীমা (জৈবধর্মের সীমা) 'চূর্ণ' করতে পারে যদি, তবেই দেবতার অমর মহিমা দেখা দেবে, নতুবা নয়। তার মানে এই নয় কি যে, দেবতার অমর মহিমা এখনো পর্যন্ত অপূর্ণ বা অনভিব্যক্ত; দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ মনুষ্যত্বেরই পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভরশীল ও শর্তাধীন? এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় সেই স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করবেন—ভগবান বলতে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না।

যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজের সন্দেহভঞ্জন করা এবং একটি শর্তযুক্ত বাক্যে সেই তর্কের সমাপ্তি ১৯ সংখ্যক কবিতায় আরও স্পষ্ট। জীবনানুরাগের সঙ্গে মৃত্যুচেতনার দ্বন্দ্বই এই কবিতার মূল বিষয়।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী

একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

নিজের মৃত্যুকে এমন একান্ত নঞর্থক চেহারায় দেখা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটু অপ্রত্যাশিত বইকি। 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'— সেই বাল্যরচনার সময় থেকে কত মধুর সম্ভাষণেই তিনি ডেকেছেন মরণকে।

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।

সেই রবীন্দ্রনাথ আজ প্রণয়ী রূপে নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা রূপে নয়, মরণকে দেখছেন জীবনের পরিপন্থী রূপে। বলাকার ঐ কবিতার গদ্য-ব্যাখ্যায় বলছেন, 'এমন করে যে জগতকে চাচ্ছি, আর এমন করে যে জগতকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই দুটো যদি সমান সত্য হয়েও দুটো contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার, এই প্রবঞ্চনা, থেকে যেত ; তবে তার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্রূরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এ দুই সত্যের মিল কোথায়? এর উত্তর কবিতায় নেই।' দুটি অসমঞ্জস অথচ অনস্বীকার্য সত্য কোথায় কেমন ক'রে কাঁটায় কাঁটায় মিলেছে তার বিবরণ কবিতায় থাকার কথা নয়। কিন্তু মিলেছে কি? যেখানেই হোক, যেমন ভাবেই হোক, সম্পূর্ণ মিলেছে— সে-প্রত্যয়ও তো এই কবিতায়

দানা বাঁধতে পারে নি। বরঞ্চ কবিতা শেষ হয় একটি দুর্বল অনুমানে, দর্শনের পরিভাষায় অর্থাপত্তিতে :

এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

উহ্য প্রতিজ্ঞা— নিখিলের সব আলো কালো হয়ে যায় নি, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি সুন্দর ; অতএব মিল আছে কোনোখানে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের সৌভাগ্যের যথোপযুক্ত প্রমাণ নয়। দুর্বল হোক, সবল হোক, কবিতা যখন যুক্তিতে এসে ঠেকে তখন বুঝতে হবে কবির উপলব্ধির কোনো পর্বে ভাঁটা পড়েছে।

তবু সমগ্র কবিতাটি দুর্বল নয়। তার কারণ কবিতার আপাত বক্তব্যের অন্তরালে রয়েছে তার গভীরতর ব্যঞ্জনা। আপাতত মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন পাটিগণিতের অঙ্ক মেলাবার মতো ক'রে দেখিয়ে দিতে চান জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী নয়, কোথাও নিশ্চয়ই মিলেছে তারা। কিন্তু কবিতার গূঢ় ব্যঞ্জনা তা নয়। ব্যঞ্জনা— ঐ বিরোধের ভয়াবহতা, এবং কোনো পূর্ণ সামঞ্জস্যের জন্য কবির আকুলতা ও উৎকণ্ঠা। এই ব্যঞ্জনাই কবিতাটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

বলাকার আর-একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। 'এই সব দারুণ নীচতা ও ভণ্ডামির অন্তরালেও শিব সক্রিয় আছেন'— এ-বিশ্বাস তাঁর অটুট রইল, কিন্তু এই লীলাময় দেবতার সঙ্গে নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির প্রেমকরুণাময় ভগবানের তফাত অনেক। ১১ সংখ্যক কবিতায় এই দেবতাকে

কখনো 'হে মোর সুন্দর' ব'লে সম্বোধন করা হচ্ছে, কখনো 'হে রুদ্র আমার' ব'লে ; তাঁর স্বভাবে ভয়ংকর কঠোরতা ও জননী-সুলভ কোমলতা সমমাত্রায় বিদ্যমান। উপরন্তু এই লীলাময়ের বিচারালয় থেকে মানুষের 'উগ্রতা 'পরে' কখন যে 'জননীর স্নেহ-অশ্রু'র মতো তাঁর বিচার ঝরবে, কখন আবার 'গর্জমান বজ্রাগ্নি-শিখা'র মতো, তা ঠাহর করা আমাদের মানুষী বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধের সাধ্যাতীত। বরঞ্চ আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমতো আমরা যখন জননীর স্নেহ প্রত্যাশা করি তাঁর কাছ থেকে, ঠিক তখনই বজ্রাগ্নি ঝরে ; আর যেখানে মনে হয় দেবতার কঠোরতম শাস্তি সমুপযুক্ত সেখানেই তাঁর করুণা নেমে আসে।

তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে ;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধরো, প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার।
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে ;

পক্ষান্তরে যারা মূঢ়, যারা কোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলুব্ধ হয়ে 'সিঁধ কেটে করে চুরি তোমার ভাণ্ডার', তারা আপন পাপের ভারে আপনিই ভেঙে পড়ছে। তাদের হয়ে কবি কেঁদে বলেন, 'এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার'। কিন্তু রুদ্রের এ কী অদ্ভুত বিচার—

মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

দুঃখ ও দুঃখের দেবতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধির ফলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'ল সেই ভক্তিরসধারা যা নৈবেদ্য থেকে গীতালি পর্যন্ত উচ্ছল ছিল। শুভ ও সুন্দরের দিকে পিঠ ফেরালেন না রবীন্দ্রনাথ; বরঞ্চ শুভ ও সুন্দরের চেতনা তাঁর মনে আরও গভীর ও সুপরিণত হ'ল। তবে তাঁর চরম মূল্যবোধের স্থানাঙ্কদ্বয় (co-ordinates) গেল পাল্‌টে। এই নতুন কো-ওর্ডিনেট ফ্রেম্‌ সম্বন্ধে অবহিত না হলে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের রসগ্রহণ ব্যাহত হবে। এই পর্বে বিবৃতির প্রাধান্য যতটুকু ঘটেছে তা এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বুঝতে চাইছেন, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিতে চাইছেন; তাঁর বিশ্বনিরীক্ষায় যে-একটা বিপ্লব ঘ'টে গেছে সেটা মানতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে, সেটাকে ক্রমবিবর্তন ব'লেই দেখতে এবং দেখাতে চেষ্টা করছেন। পুরানো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়া কিন্তু শেষ অবধি খণ্ডিতই রয়ে গেল। সেই আংশিক ব্যর্থতা শেষ পর্বের কাব্যকে অভূতপূর্ব সার্থকতা দান করেছে। বোঝাপড়া সন্তোষজনক হলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন দার্শনিক, কবিকর্ম হ'ত তাঁর পক্ষে গৌণকর্ম। রবীন্দ্রনাথের দর্শন শ্রদ্ধেয়, কিন্তু আরও অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর দার্শনিক অপূর্ণতা- ও অতৃপ্তি- সম্ভূত গীতিকাব্যের স্থান।

পরিশেষ আর পুনশ্চ প্রকাশিত হয় এক মাসের ব্যবধানে, দুটোরই রচনাকাল ১৩৩৮-৩৯। পরিশেষ নাম শুনলে মনে হয় বইখানা যেন পূর্ববর্তী কাব্যধারার সমাপ্তি-ঘোষণা; রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটাই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ, এর পর কবিকর্ম থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। মুখবন্ধ-স্বরূপ "প্রণাম" কবিতাটিতে সেই ইঙ্গিত রয়েছে—'এই গীতিপথ-প্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে / দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে / আরতির সান্ধ্যক্ষণে'। নৈঃশব্দ্যের তীরে এসে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন নতুন এক ভাবসমুদ্র।

নতুন এক রীতিরও (কবি যার কাব্যিক নাম দিয়েছেন 'গদ্যিকা রীতি') প্রবর্তন হয় ঐ দুখানি বইতে, কিন্তু ভাবের দিক থেকে পরিবর্তন আরও লক্ষণীয়। সংশয়, প্রশ্ন, 'নৈরাশ্যের তীব্র বেদনা', মানসিক দ্বন্দ্ব, তিক্ততা (রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতখানি তিক্ত হওয়া সম্ভব), সেই সঙ্গে 'সন্ন্যাসী মহাকালে'র কাছে দীক্ষা-গ্রহণ একদিকে এবং অন্যদিকে পুরোদস্তুর মানবিকতাবাদ—এসবেরই সূত্রপাত ঐ দুখানি পর্বান্তকারী কাব্যে। এর কিছুই হয়তো একেবারে নতুন নয়, প্রথম পর্বেও এসব ভাবের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু তখনকার কিঞ্চিৎ অপরিণত মনের সে-উপলব্ধি সম্পূর্ণ স্বকীয় ছিল না, পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক অ্যাগনির অল্প-বিস্তর সংক্রমণ দেখা যায় মানসী-চিত্রার যুগে, তৎপূর্বে তো বটেই। প্রকাশভঙ্গি শিথিল না হলেও শক্ত হয় নি মাংসপেশি, শব্দের জাদুকরি ছিল, গৃহস্থালি ছিল না; ভাবালুতা দোষও

চোখে পড়ে— অবশ্য সে-যুগে তা দোষ ব'লে গণ্য হ'ত না। পূর্বোক্ত ভাবপুঞ্জকে মাত্রায় ও গুণে, অনুভবে ও অভিব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বের কাব্যে এমন এক স্তরে তুলে দিয়েছেন যাকে নতুন ব'লে অভ্যর্থনা করতেই হয়।

বলাকা রচনাকালে প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'দুঃখের বিরাট স্বরূপ' দেখে বলেছিলেন বটে 'তুফানের মাঝখানে/ নূতন সমুদ্রতীর-পানে/দিতে হবে পাড়ি', কিন্তু ঠিক তখনই নতুন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয় নি, চেনা সাগরেই তরী বাওয়ার নতুনতর কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল আরো কিছু কাল। যে-অজানা দেশের ইঙ্গিত ছিল বলাকাতে, তার সাক্ষাৎ পাই না পূরবী কিংবা মহুয়ায়; বরঞ্চ মনে হয় আমরা যেন মানসীর ভাবলোকেই ফিরে গেছি, তফাত মোটের উপর কলাকৌশলেই। নতুন পর্বারম্ভের স্বাক্ষর পরিশেষ-পুনশ্চ-র আগে সুস্পষ্ট নয়।

পূরবী-মহুয়াতে কবি যেন ভাষা ও ছন্দের প্রোৎকর্ষের দিকেই অধিকতর মনোযোগী। সে-মনোনিবেশ শিথিল হয় নি সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক পর্যন্ত, যদিও তার পূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘ'টে গেছে। তার পরে কঠিন পীড়া ও দেহযন্ত্রণার মধ্যে নতুনতর সৃষ্টির পালা আরম্ভ হ'ল। আমরা সেই অন্তিম পর্বে এসে পৌঁছই যখনকার রচনাকে বৈদিক মন্ত্রকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, শিশিরকুমার ঘোষ যার আরও সঠিক সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সারাৎসার কাব্য' এবং সেই কাব্যের চরিত্র-বর্ণনায় ডি. এইচ. লরেন্স-এর পত্রাবলি থেকে উদ্ধৃত করেছেন[১] :

> Everything can go but the stark, bare, rocky directness of statement that alone makes poetry to-day.

কিন্তু এই পর্যায়ের শেষেও ভাবের গতি কিংবা আঙ্গিকের বিবর্তন থামত এমন তো মনে হয় না। শেষ লেখা-র অপ্রত্যাশিত বাঁকে

এসে আমরা যখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি নতুন এক কাব্যদিগন্ত দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশায় ঠিক তখনই এই চির-পথিকের পথ চলা অকস্মাৎ থেমে গেল একটি বাহ্য কারণে। রোগশয্যা, আরোগ্য কিংবা শেষ লেখা-র লেখনী ক্লান্ত নয় মোটেই ; এ-কাব্যগুলির পাতায় পাতায় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা আছে, জরা নেই, মানসিক জরা একেবারে অনুপস্থিত। যিনি 'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস' তাই দেখছেন 'অনন্ত আকাশে', তাঁর সেই স্বচ্ছ নির্ভীক দৃষ্টিশক্তি ও রচনা-ভঙ্গিকে অসুস্থ বা ক্লিষ্ট বলবে কে ?

আধুনিক সমালোচকরা যথার্থই বলেছেন, যে-কবিতায় একই বা এক-জাতীয় অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে উঁচু দরের ব'লে গণ্য হবে সেই কবিতা যাতে একাধিক বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ঘটেছে (অবশ্য যদি অনুভূতির প্রকাশ দুটোতে সমান রূপদক্ষতার সঙ্গে হয়ে থাকে)। আরও উঁচু দরের কবিতায় আমরা পাই বিপরীতের সন্নিপাত, যেমন কীট্‌সের নাইটিংগেলে, হপ্‌কিনসের ভক্তিকাব্যে, এলিয়টের ফোর কোয়ার্টেট্‌স্‌-এ। রিল্‌কে বলেছিলেন টেরিব্‌লনেস এবং ব্লিস একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ— এই উপলব্ধিটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাওয়া যাবে তাঁর শেষ দুখানি কাব্যগ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ প্রান্তিকের ১০ সংখ্যক কবিতায় আক্ষেপ করেছেন যে, তাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে এল অথচ 'চরমের কবিত্ব মর্যাদা' তিনি পান নি, কারণ 'জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি'।

ভীষণের প্রসন্ন মূর্তি যে দুর্লভ ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে তারি জন্য সর্বান্তঃকরণের আকূতি তাঁর শেষ পর্বের কাব্যকে —পরিশেষ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত— আশ্চর্য সার্থকতা দান করেছে। প্রথম পর্বের কাব্যেও 'ভীষণ' একেবারে অনুপস্থিত

নন, কিন্তু ভীষণ সেখানে ভীষণই (যেমন ছবি ও গান-এর "আর্তস্বর" ও "নিশীথ জগত"-এ, মানসীর "নিষ্ঠুর সৃষ্টি" ও "সিন্ধু-তরঙ্গ"-এ), এবং মধুর মধুরই— তার উদাহরণ অজস্র। তবে সে-পর্বের কবিতা মোটের উপর মধুর রসেরই কবিতা। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা অন্য পথে গিয়েছে, কিন্তু তা ক্বচিৎ, এবং সে ক্বচিৎ-আভাসিত অসুন্দরের বা অশুভের ছায়া পড়ে নি কবির সমস্ত হৃদয়মনের উপর। মানসী, সোনার তরী, চিত্রার কাব্যরসে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, এমনকি একই কবিতায় অনেক সময় বিবিধ রসের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু বিপরীতের টানে কবির মন দীর্ণ হয় নি তখন। নৈরাশ্য ও বিষাদের যতটুকু ধুলো-বালি দেখা দিয়েছিল মানসীর যুগে, তাও মুছে গেল গীতাঞ্জলি পর্বে এসে। ভক্তিরসে আপ্লুত এই মধ্য পর্বের কাব্যে ভীষণের চেহারা দেখা যায় না তা নয়, কিন্তু তাকে আর ভীষণ ব'লে চেনাই যায় না। হোক সে 'ভীষণ তরবারি' তবু সে যে প্রিয়তমের অভিসার-রাত্রির দান, তাকে বুকে চেপে ধরতে হবে যদি-বা বুক কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মোটের উপর তখন রুদ্রের দক্ষিণ মুখই দেখা গিয়েছিল, তবে সেই প্রসন্ন মুখের 'আনন্দ-আবেশ'-ভরা প্রকাশ খেয়া থেকে গীতালি পর্যন্ত গূঢ় ও বিশ্রব্ধ ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।

অবশ্য ঐ একই সময়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতীকী নাটক রাজা। রাজার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সহচরী সুরঙ্গমার সঙ্গে রানী সুদর্শনার সংলাপে পড়ি:

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত?
সুরঙ্গমা। উঃ, কী নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুর, কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!
সুদ। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে?
সুর। কী জানি মা! এত অটল, এত কঠোর বলেই এত নির্ভর,

এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে।

সুদ। তোর মন বদল হল কখন?

সুর। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি, যত ভয়ানক ততই সুন্দর।

এবং শেষ দৃশ্যে সুদর্শনা রাজার কাছে আত্মনিবেদন ক'রে বলছেন: 'তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও। তুমি অনুপম।··· যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।' কিন্তু রাজা কিসে ভয়ানক, কোথায় নিষ্ঠুর, তার প্রকাশ নাটকে স্পষ্ট নয়। যা স্পষ্টরূপে ফুটেছে তা রাজার আত্মগোপন ক'রে থাকার ইচ্ছা— যতদিন রানীর চোখ কেবল সুন্দরকে খুঁজছে ততদিন রাজা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ অনুমানে জেনেছিলেন কোথায় যেন ভয়ানক কিছু আছে, নিষ্ঠুর কিছু ঘটছে, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর-ভয়ানকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি তখন।

ভয়ানককে আবার দেখা গেল— অন্ধকারে নয়, আলোতেই দেখা গেল— বলাকা কাব্যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। বলাকা রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে একটি সন্ধিস্থল। মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে রবীন্দ্র-কবিপুরুষ খানিকটা দিশাহারা বোধ করেছিল। এত বড় নিদারুণ অভিঘাতকে সহজভাবে গ্রহণ করার যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না গীতাঞ্জলির কবির চিন্তায় বা অনুভূতিতে। তাই নৈবেদ্যে যেমন, বলাকাতেও তেমনি জগৎ-জোড়া দুঃখ ও পাপের চেহারাটাকে কবি সহনীয় ক'রে নিতে চাইলেন তাকে ঈশ্বরকৃত শাস্তিবিধানরূপে দেখে— একথা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই সহজ সমাধানের ব্যর্থতা তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করল, তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি গেল পালটে।

বলাকা প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে, পরিশেষ ও পুনশ্চ ১৩৩৯-এ। অবশেষে এই ষোলো বছর পরে আমরা সেই 'নূতন সমুদ্রতীর'-এর কাছে পৌঁছলাম যার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল বলাকার ৩৭ সংখ্যক কবিতায়। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতার ব্যঞ্জনা একটু তলিয়ে দেখলে এই নতুন তীরের পরিচয় পেতে আমাদের সুবিধে হবে। প্রগতিসাহিত্যবাদীদের কল্যাণে পরিশেষ-এর "প্রশ্ন" কবিতাটি বহুল খ্যাতি লাভ করেছে। মার্কসবাদী অর্থে এর মধ্যে বৈপ্লবিক কিছু নেই, কিন্তু রবীন্দ্রমানসের বিকাশে এই কবিতার ভূমিকা ক্রান্তিকারী। এ তো প্রশ্ন নয়, চ্যালেঞ্জ। এ 'দয়াহীন সংসারে' এমন বীভৎস পাপ অনেক ঘটে যা কোনো-মতেই ক্ষমার যোগ্য নয়, এমন মনুষ্যত্ববর্জিত পাপী আছে আমরা যাদের কিছুতে ভালোবাসতে পারি না। অথচ ঈশ্বরের প্রেরিত দূতেরা ব'লে গেলেন, ক্ষমা করো সবে, ব'লে গেলেন ভালোবাসো। ইতিহাসের পাতায় এঁদের নাম লেখা রইল, এঁদের অনুগামীদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কবি তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেবল একটি ব্যর্থ নমস্কার জানিয়ে। তাই কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতে যে-ব্যথিত প্রশ্নটি উচ্চারিত হ'ল— 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'— তার অন্তরালে একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন রয়েছে: তোমার প্রেরিত দূতেরা কেন এমন অন্যায় উপদেশ দিলেন? আরো উহ্য প্রশ্ন: তোমার সৃষ্টিতে এমন পাপ কেন যা ক্ষমার যোগ্য নয়, এমন মানুষ কেন যাদের ভালোবাসা যায় না কিছুতেই। এ-সব উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত প্রশ্ন 'নূতন সমুদ্র-তীর'-এর দিকনির্দেশক।

পরিশেষ-এর আর একটি কবিতা "ছোটো প্রাণ"-এ কবি মেনে নিচ্ছেন যেখানে 'সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী / লিখে ইতিহাস জুড়ে' সেখানে আঘাত-সংঘাত, হিংস্রতা ও বর্বরতা

অনিবার্য, সেখানে ‘ভাঙা চোরা যত হোক / তার লাগি বৃথা শোক’। কিন্তু মেনে নিতে পারছেন না যখন সহসা ঝঞ্ঝার বা বোমার আঘাতে আর্ত বিলাপ ওঠে নিভৃত কোনো পল্লির ছোটো একটি কুটির থেকে মায়ের কোলে শিশু যেখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে। কবিতাটি শেষ হয় এমন একটি বিক্ষুব্ধ প্রশ্নে আস্তিকের মনে যার কোনো উত্তর নেই, সান্ত্বনা নেই :

হে রুদ্র, কেন তারো ’পরে হানো,
কেন তুমি নাহি জানো
নির্ভয়ে ওরা তোমাকে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমারি আলো।

*এই কাব্যগ্রন্থে একই রূপকল্পের তিনটি কবিতা রয়েছে—তার মধ্যে দুটির নামও একই,—“সান্ত্বনা”; তৃতীয়টির নাম “চিরন্তন”। তিনটি কবিতাই মানুষের (‘নিখিল মানবের’) দুঃসহ দুঃখ ও ঘৃণ্য পাপের তীব্র চেতনায় সংরক্ত :

প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি
সরল বিশ্বাস ;
....
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি
পৃথ্বীব্যাপী মানব-বিভীষিকা

কিংবা,

যে-দুঃখ নিহিত আছে
অপমানে শঙ্কায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্যাতন করে মোরে।

দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক বলেছেন, কিন্তু কোনো কালে যে-দুঃখের অন্ত নেই সে-দুঃখের কথা কি আগে বলেছেন? মানুষের পাপের সঙ্গে পরিচয় তাঁর যথেষ্ট ঘটেছিল, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মানববিভীষিকা কি ইতিপূর্বে এমন মুক্ত চোখে দেখেছেন তিনি? সোনার তরীর একটি সনেটে— তখনকার রচনাধারায় কতকটা প্রক্ষিপ্তভাবে— বলেছিলেন বটে :

জানি না, কী হবে পরে, সবই অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে— নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে।

কিন্তু সোজাসুজি কখনো বলেন নি যে, নিখিল দুঃখের কোনো-কালেই অন্ত নেই।

এই নির্যাতন থেকে মুক্তি খোঁজা, কোথাও কোনো কণ্ঠে একটু সান্ত্বনার বাণী শুনতে চাওয়া স্বাভাবিক, উক্ত কবিতাত্রয়ে তার প্রকাশও আন্তরিক। যেটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকে তা এই যে, এমন নিদারুণ দুঃখের বিভীষিকায় তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান এত সহজে— একটি পাখির ডাকে বা একটি বনস্পতির পত্রমর্মরে। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে এটা অস্বাভাবিক ঠেকত না, কিন্তু শেষ পর্বে ঠেকে। অন্ধকার যত ঘন হোক, ঝড়-তুফান যত ভয়ংকর হোক, ডাকলেই কাণ্ডারি এসে হাল ধরবেন— বলাকা ও তৎপূর্ববর্তী যুগে এমন প্রত্যয় ছিল মনে। কিন্তু আজ যখন কবি জানেন, 'সহায় কোথাও নাই' এবং সকল প্রার্থনাই ব্যর্থ হবে, তখন আকাশ থেকে অকস্মাৎ মানবোত্তীর্ণ আনন্দ ও শান্তির বার্তা বহন ক'রে আনে মানবেতর প্রাণীবিশেষ— এটা কি বিচিত্র নয়?

"সান্ত্বনা" নামের দ্বিতীয় কবিতাটিতে এবং "চিরন্তন"-এ

কীট্‌সের "Ode to a Nightingale"-এর ভাবচ্ছায়া পড়েছে। কীট্‌স্‌ কিন্তু অবগত ছিলেন যে, এই জগতের—

> **Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ;**
> **Where but to think is to be full of sorrow**
> **And leaden-eyed despairs—**

প্রতিকারহীন অন্তহীন বেদনা কেবল মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকা যায় বুলবুলির গান শুনে, কিন্তু সে-গানে জগৎ-যন্ত্রণার কোনো স্থির চূড়ান্ত সান্ত্বনা খোঁজা বৃথা। তাই তাঁর কবিতা শেষ হয় বুলবুলিকে বিদায়-সম্ভাষণে ; গান আর শোনা যায় না, বুলবুলিটি কি উড়ে গেল মাঠ নদী পাহাড় পেরিয়ে দূরের কোনো উপত্যকায়, না কি যে-গানের মধুরিমায় কবি তাঁর সব ব্যথা দুঃখ ভুলেছিলেন, তা কেবল দিবাস্বপ্নই ছিল, একটি কর্কশ শব্দের ('forlorn') আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন পিনাঙের রাস্তা দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে যেতে যেতে পীড়িত কল্পনার চোখে চেয়ে দেখছেন 'পৃথ্বীব্যাপী মানব-বিভীষিকা', ভেবে পাচ্ছেন না 'কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে', তখনই পার্শ্ববর্তী কোনো অশোক শাখা থেকে একটি কোকিল ডেকে ওঠে, আর সেই কোকিলের ডাক

> পরশ করে প্রাণে
> যে-শান্তিটি সব-প্রথমের,
> যে-শান্তিটি সবার অবসানে,
> যে-শান্তিতে জানায় আমায়
> অসীম কালের অনির্বচনীয়,—
> 'তুমি আমার প্রিয়'।

কবিতার এই বাঁক ফেরাটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অবাস্তব। "সান্ত্বনা" নামক দ্বিতীয় কবিতাটির পরিণামও তদ্রূপ। মানুষের

জীবনের অন্তবিহীন দুঃখ যখন তাঁকে 'নির্যাতন' করছে, তখন সহসা অদৃশ্য কোন্ এক পাখির গান এল কানে, আর রবীন্দ্রনাথের মনে হ'ল—

আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে,
যে-আনন্দ অন্তিমে বিরাজে,
....
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে।

এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

মানুষের জীবনে— ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে— দুঃখ পাপ মূঢ়তা ও হিংস্রতার অন্ত নেই; অথচ প্রকৃতি শান্ত সুন্দর নিষ্কলুষ। তাই কি মনুষ্যলোকে কোনো আশা, কোনো সান্ত্বনা খুঁজে না পেয়ে কবি মানুষ থেকে দৃষ্টি ফেরান প্রকৃতির দিকে, 'সান্ত্বনার চির-উৎস' খুঁজে পান তারি বর্ণে গন্ধে গানে? অনেক সময়ে তাই— যেমন পূর্বোক্ত দুটি কবিতাতে। রবীন্দ্র-রচনাবলী ঘেঁটে তার আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা যায়, এমনকি, একেবারে শেষ দিককার রচনা থেকেও। সেঁজুতির "যাবার মুখে" কবিতাটাই ধরা যাক। কবি যখন বেশ খানিকটা উত্ত্যক্ত হয়ে বলছেন:

যাক এ জীবন, পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
.. ..
নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে-জমা-করা
প্রবঞ্চনায়-ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।

তখন সহজেই অনুমেয় যে, এই পুঞ্জিত জঞ্জালটা মানবিক। অথচ যখন 'সকল-কিছুর অবশেষেতে'ই অক্ষয় মূল্য বহন ক'রে বাকি

যা রয় তার কথা বলছেন, তখন দেখা যায়, তালিকাটি সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক :

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই-যে শিমুল, ওই-যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে—
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।

....

যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ক'রে পৃথিবীটা বস্তুত যেমন, তাকে তেমনি ক'রেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই।'[২] সেই কথাটা স্মরণ ক'রে বলতে চাই—কোকিলের আলো-ভরা কণ্ঠে বা বনের রহস্যময় পত্রমর্মরে যদি-বা আমরা শুনতে পাই 'যে-শান্তিটি সব-প্রথমের,/যে-শান্তিটি সবার অবসানে' তারি স্নিগ্ধ বার্তা, তবু সে-বার্তা কি ছাপিয়ে উঠতে পারে মনুষ্যসমাজ থেকে যে আর্ত চিৎকার ওঠে তার বিরূপ সাক্ষ্যকে? প্রাকৃতিক সুষমা আর মানবিক বিভীষিকা যদি বিপরীত সুর যোজনা করে বিশ্বের ঐকতানে, তবে তার মধ্যে একটি সুরকেই শুদ্ধ বা মূল সুর ভাববার কি কোনো কারণ আছে? মানুষের কানে মানুষের সুরই যদি বেসুর বাজে তবে প্রকৃতির বসন্তবাহার কি তাকে শেষ সান্ত্বনা দিতে পারবে?

প্রমথনাথ বিশী ঠিকই বলেছেন : 'ভগবদ্‌বিশ্বাসীগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তের হৃদয়কেই ভগবৎ-লীলার একমাত্র আসর মনে করেন, ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার পদক্ষেপ স্বীকার করেন না বা

সে পদক্ষেপ সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহাদের কর্তব্য সহজ। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে ভক্ত ও ভগবানের খেলাঘরেই আবদ্ধ রাখেন না, মনে করেন যে বৃহৎ ইতিহাসের উত্থানপতনেও তাঁহার লীলা তরঙ্গিত, কবিবর্ণিত সর্বজনীন বীভৎসা ও ব্যভিচারের মধ্যে কী ভাবে ভগবদভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায় তাঁহাদের। কিন্তু কাজটি সহজ নয়।'[৩] প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে মনোনিবেশ করলেও কাজটি মোটেই সহজ হয় না। সহজ হয় না, একথা রবীন্দ্রনাথ নিজে ভালোভাবে জানতেন। বহুকাল পূর্বে আত্মপরিচয়-এ লিখেছিলেন: 'অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।'[৪] তাই আমার মনে হয় যে-সব কবিতায় তিনি মানব-বিভীষিকাকে সহনীয় ক'রে নিতে চেয়েছেন চামেলি-সজ্‌নের সবুজ বৈতালিতে বা পাখির কণ্ঠে প্রিয়-সম্বোধন শুনে, সেখানে তাঁর কল্পনা কবিত্ব-মণ্ডিত হলেও দৃষ্টি সত্যসন্ধানী নয়।

এর চেয়ে অকুতোভয়, সত্যের কঠিনতম রূপকে মেনে নিতে অকুণ্ঠিত নয় কি আলবের কামুর শিল্পদৃষ্টি? কামুও প্রাণ দিয়ে প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন, তার রূপলাবণ্যে অনাধুনিক মাত্রায় মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানতেন যে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এমন কোনো পরম কল্যাণময় অনন্ত শক্তির সাক্ষ্য দেয় না যার মধ্যে মানুষের চূড়ান্ত পরিত্রাণের লেশমাত্র অঙ্গীকার আমরা খুঁজে পেতে পারি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানুষের জীবন অসুন্দরই থাকবে যতদিন না আমরা তাকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারি, দুঃখ ও পাপে মগ্ন থাকবে যতদিন না আমরা তার দুঃখমোচন ও কলুষহরণ করতে সক্ষম হই। এ-কাজ মানবোত্তীর্ণ কোনো

মঙ্গলবিধানকর্তার সাধ্য নয়, তেমন বিধানকর্তা নেই কোথাও।

শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথেরও স্থায়ী এবং মৌলিক বিশ্বাস অনুরূপ ছিল। তার পরিচয় আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পাব। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর বিগত দিনের পিতানোঽসি-বোধ, ভক্তিপর্বের 'দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা/তোমারে যেন না করি সংশয়' ভাব ছিটকে এসে পড়ে শেষ পর্বেও। পড়বেই তো; বহুকাল যে-প্রত্যয় মনে দৃঢ় ছিল, যে-হৃদয়াবেগ প্রবল ছিল, তা জীবনের শেষ দশকে একেবারে ধুয়ে-মুছে যাবে— এমন প্রত্যাশা আমরা করতে পারি না। তবে রবীন্দ্রনাথই বারে বারে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস একটা সজীব, সচল পদার্থ, তার উপর টিকিট মেরে জাদুঘরে রেখে দেওয়ার মতন অটল রূপ সে কখনও ধারণ করে নি। আর মৃত্যুর মাত্র সাত দিন আগে লেখা তাঁর দীর্ঘ কাব্য-জীবনের শেষ জবানবন্দীতে প্রকৃতিকে বলেছেন 'ছলনাময়ী':

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;

রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রতিভাও কি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের দ্বারা মাঝে মাঝে প্রবঞ্চিত হয় নি, মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে নি? আমার তো মনে হয় উপরে উদ্ধৃত কবিতায় সেই বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে।

বলাকার ১৯ সংখ্যক কবিতার ('আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে') ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন—

বলাকা শীর্ষক অধ্যায়ে তার কিছু আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি —সেটাকেও প্রকৃতির ছলনাময়ী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের সাক্ষ্যরূপে ভাবা যেতে পারে, অন্তিমকালে কবি স্বয়ং হয়তো তাই ভেবেছিলেন।

সমস্ত পৃথিবীটা যদি-বা সদ্যফোটা ফুলের মতো সুন্দর হয়, বাহ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যে সৌন্দর্যের উপর এম্‌ফ্যাসিস যদি-বা স্পষ্টতই প'ড়ে থাকে, তাতে কি প্রমাণ হয় যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে যাবে না? সুন্দরতম পরিবেশে কুৎসিততম পাপ ও দুর্বিষহতম দুঃখ ঘটেই থাকে। রূপে গন্ধে বর্ণে অতি মনোহরা বসুন্ধরার কোলে তার অসহায় সন্তানেরা 'মুহূর্তের নিরর্থকতায়' নিঃশেষ হয়ে যাবে— এটা ভয়ংকর হলেও অসম্ভব নয়। প্রকৃতির মনোহারিতা কিছুই প্রমাণ করে না; তার মধ্যে এত বড় প্রমাণ দেখতে পাওয়া মানেই হচ্ছে প্রকৃতির নিপুণ হাতে পাতা বিচিত্র ছলনাজালে ধরা দেওয়া। ফুল্ল অশোক শাখায় ব'সে কোকিল যত বিমল সুরেই ডাকুক, তার 'গভীর রমণীয়' সুরব্যঞ্জনা কবিকে বলতে পারে 'তুমি আমার প্রিয়', কিন্তু এ-আশ্বাস দিতে পারে না যে, মানববিভীষিকার পরপারে বিশ্বের আদিতে ও অন্তে পরম শান্তি বিরাজমান। এমনতর কবিকল্পনা ছোটো অর্থে সুন্দর হতে পারে কিন্তু কোনো মহৎ অর্থে নয়, কারণ তাতে জগতের কঠিন সত্যকে একটু মোলায়েম ক'রে নেওয়ার দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

পূর্বোদ্ধৃত কবিতার পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি বলছেন:

> তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
> যে-পথ দেখায়
> সে যে তার অন্তরের পথ,
> সে যে চিরস্বচ্ছ,

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

প্রকৃতি বিষয়ে পর পর দুই আপাতবিপরীত উক্তিতে (ছলনাময়ী ও পথপ্রদর্শক) সত্যিই কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে ফেলে তখনই যখন তাতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভাবে বিশ্বের বিধানে সব-কিছুই সুন্দর, আপাতত না হলেও বস্তুত মানব-ভাগ্যের অনুকূল। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রে চামেলির গন্ধ-জাতীয় সহজ মনোহারিতা থেকে চোখ তুলে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে যখন সে তাকায় তখন 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' থেকে মুক্ত হয়। কারণ নাক্ষত্রিক জগৎ মনোহর নয়, সাব্লাইম; শুধু তার কল্পনাতীত দূরত্ব ও আকারই নয়, তাতে যে অভাবনীয় শক্তিসমূহের আঘাত-সংঘাত, সৃষ্টি-প্রলয় নিরন্তর চলছে তা আমাদের জানিয়ে দেয় যে, অনন্ত অনাদ্যন্ত বিশ্ব সেই বিরাট অর্থে 'সুন্দর'— 'নিষ্ঠুর' ও 'ভয়ানক'ও যার অভিধাভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই নিষ্ঠুর ও ভয়ানককে প্রণাম জানিয়েছিলেন বহুকাল পূর্বে রানী সুদর্শনার মুখে, আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আবার তাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। ভয়ানক এবং সুন্দরকে একত্র দেখতে পাওয়া তাঁর জীবনের 'শেষ পুরস্কার'। এই পুরস্কার যে পেয়েছে—

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষতম অভিব্যক্তি থেকে ফেরা যাক পরিশেষ-এর "সান্ত্বনা" নামক অন্য কবিতাটিতে ('যে বোবা দুঃখের ভার')। ঐ বইয়ের সান্ত্বনা-বিষয়ক পূর্বোল্লিখিত অন্য দুটি কবিতা থেকে বেশ একটু আলাদা এর সুর, রোম্যান্টিক

ভাবাবেগের সঙ্গে মিশেছে আইরনির বোল। মানুষের অসহায় অপ্রতিকার্য দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে কবি কল্পনা করছেন, 'সর্ব দুঃখ সন্তাপ' যখন 'উদার মাটির বক্ষোদেশে' নেমে যাবে তখন সেই মাটিতে—

বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির,
পুষ্প তার পত্রপুটে
শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমামুকুটে।

একে প্রকৃতির পরিহাস ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে? সে-পরিহাসকে মেনে নিয়ে কবিতার শেষে 'সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী'র কথা বলেছেন কবি :

বোবা মাটি, বোবা তরুদল,
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
স্তব্ধতায় মিলাইছে প্রতি মুহূর্তেই,—
নির্বাক সান্ত্বনা সেই

দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী।

আরোগ্য-র ছোটো একটি কবিতা ২৫ সংখ্যা তার শিরোনাম :

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকাসম।

সে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনা-কক্ষপথে।

চিত্রকল্পটি সুন্দর, সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবির রচনায় তার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত নয়। নবজাতক-এর "কেন" শীর্ষক কবিতায়ও এর প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। চিত্রকল্পটি কিন্তু অনেক বেশি বেদনাময় ও মর্মগ্রাহী হয়ে ওঠে যখন 'বাণীধারা' রূপান্তরিত হয় 'অশ্রুধারা'য় :

অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে ;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো—[৫]
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

অকথিত বাণীপুঞ্জ যেমন মহাশূন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষের দুঃখশোকের অশ্রুধারাও কি তেমনি দেশে দেশান্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ফুলে ফুলে উঠছে যুগ যুগ ধ'রে? কী উদ্দেশে? দুটি চিত্রকল্পের তাৎপর্য কিন্তু এক নয়, প্রশ্নের তীব্রতাও ভিন্ন।

অকথিত বাণীপুঞ্জ বায়বীয় নেবুলার মতো মহাকাশে ভ্রাম্যমাণ—এই কল্পনাটি কৌতুকপ্রদ, তার বেশি কিছু নয়। কী উদ্দেশে তা কবিবিশেষের চিত্তে ঘনীভূত হয়ে শিল্পরূপ পরিগ্রহ করে, আবার মহাশূন্যে হারিয়ে যায়—প্রশ্নটি সাহিত্যিক কৌতূহল প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে দুঃখের তরঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছে— এটা কল্পনা নয়, নিষ্ঠুর বাস্তব। 'কী উদ্দেশে' প্রশ্নটিও নিছক কৌতূহলব্যঞ্জক নয়, একটি ধর্মনীতিক বিচার তাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে— এমন তো হওয়া উচিত ছিল না তবু এমনটা হ'ল কেন, কার কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করছে এই অশ্রুধারার ফুলে-ফুলে-ওঠা ব্রহ্মপুত্র ?

প্রশ্ন ও বিচারের ইঙ্গিত আরো উঁচু পর্দায় ওঠে বীথিকার "দুর্ভাগিনী" কবিতায়। "বিশ্বশোক"-এর প্রশ্ন উত্তরের সম্ভাবনা-রহিত ছিল না. প্রশ্নকর্তার মনের কোণে একটুখানি আশা রয়েছে যে এই জাগতিক শোকের এবং সেই শোকতরঙ্গের দ্বারা একজন ব্যক্তির হৃদয়কে হঠাৎ প্লাবিত ক'রে দেওয়ার কারণপরম্পরার মধ্যে হয়তো কোনো মহাকল্যাণময় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, যদিও সে-উদ্দেশ্য আমাদের মানুষী বুদ্ধির কাছে মোটেই পরিষ্কার নয়। কিন্তু "দুর্ভাগিনী"র 'কেন, ওগো কেন' স্পষ্টতই সেই চিরপ্রশ্ন-সমূহের অন্যতম যার 'বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে / বিরাট নিরুত্তর'। কবির সব দিক থেকে দুর্ভাগিনী কন্যার শেষ ভরসা ছিল দীপ্তিমান তরুণ পুত্র নীতীশ। সেই নীতীশ জার্মানির এক হাসপাতালে যক্ষ্মারোগের অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে মারা গেল— তারি মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এই কবিতাটি রচিত। কিন্তু সেটা উপলক্ষ্য মাত্র, কবিতার বিষয়বস্তু একটি ব্যক্তির শোক নয় ; অথবা সেই ব্যক্তির অশেষ দুঃখ জগতের দুঃসহতম দুঃখ ও হতাশার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ঐ কবিতায়। 'দুঃখের

স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার'কে মহিমান্বিত ক'রে দেখানোই প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়: 'তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন/নত হয় মন।' কিন্তু পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতেই প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে, 'যেন ভয় লাগে/প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।' কোন্ প্রলয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন কবি?

ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে;
... ...
দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

এর পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে আর কোনো আড়ালই রইল না, শুধু বিশ্বই ভেঙে পড়ছে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দেবতার উপর বিশ্বাসও ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে:

সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া;
ভিতরে কে দিবে সাড়া।
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিঃশ্বাস,
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।

কবিতার শেষে যে-বিদ্রোহী যন্ত্রণা চিৎকার ক'রে ওঠে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে, তা কি কেবল কবিতার নায়িকারই মনের কথা:

তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন!

সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে নির্বাসিত শুধু দুর্ভাগিনী কন্যা নন, "দুর্ভাগিনী"-রচয়িতাও ; বহু দূরে ছেড়ে এসেছেন সেই ভক্তি-শ্যামল মানস-ভূমি 'জীবন যেখানে ছিল ফুলের মতো', যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সহজে বলতে পারতেন 'দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন / পার আছে রে— এই সাগরের / বিপুল ক্রন্দন'।

'কেন' শব্দটি শেষ পর্বের কাব্যে বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন এক কবি-পুরুষের পরিচয় লাভ করছি। কেবল সংখ্যা-গণনার দিক দিয়ে এই শব্দটি যে আগের চেয়ে খুব বেশি লক্ষণীয় তা নয়। 'কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ', 'কেন নিবে গেল বাতি', 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা', 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে / কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে / এমন গানে গানে', 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে / তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না', 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না / শুকনো ধুলো যত'— ইত্যাদি শত শত 'কেন'-সংবলিত কবিতা ও গান মনে আসে পূর্ব যুগের রচনা থেকে। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে একটু আগে উদ্ধৃত "দুর্ভাগিনী" কবিতার শেষ ছত্রের 'কেন, ওগো কেন'-র তুলনা করলেই দেখা যাবে 'কেন' শব্দের অর্থব্যঞ্জনায় যুগান্তর এসেছে। "প্রশ্ন" শীর্ষক একাধিক কবিতা পাওয়া যাবে শেষ পর্বে ; নবজাতক-এর একটি কবিতার নাম "কেন"। কবিতাটির বিষয়বস্তু কবির নবার্জিত জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে নেওয়া। জড়জগতে, প্রাণীলোকে, মানবেতিহাসে এমন প্রভূত, অপরিমেয় অপচয় ('আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়') কেন ? মহাযুদ্ধে, খণ্ডযুদ্ধে, গৃহযুদ্ধে মনুষ্যজাতির পৌনঃপুনিক মূঢ় আত্মজিঘাংসাই রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে পীড়িত করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে সমস্ত সৌর জগৎ এবং যাবতীয় নক্ষত্রলোকের অবধারিত 'তাপমৃত্যু'র

বিভীষিকা। সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ধর্মে-কর্মে মানুষ যদি-বা উপরে উঠতে পারে এবং যতই উপরে উঠুক, এমন দিন আসবেই যখন মানুষের তথা প্রাণীমাত্রের প্রাণধারণ আর সম্ভব হবে না —সূর্যের অবধারিত তাপক্ষয়ের পরিণামস্বরূপ। এ-বিষয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানীদের সুদৃঢ় প্রাগুক্তি রয়েছে। তার পরে আবার যদি নীহারিকা-সৃষ্টির পালা শুরু হয় তবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম মতে আবারও সেই সার্বিক 'তাপমৃত্যু' ঘটবে।

নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন।

পরবর্তী স্তবকে অনুরূপ আর-একটি প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে— 'প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে/এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে'। তরুণ কবি জানতে চেয়েছিলেন, 'বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে / মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে/···জীবনের মরণের নিত্যকলরব'। কিন্তু সেই প্রথম বয়সেরও কল্পিত নিরসন এই নয় যে 'ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে' অখণ্ড পূর্ণতা বিরাজিত।[৬] সেখানে বিরাজ করে কেবল একটি 'প্রতিধ্বনিমণ্ডল', এবং সেই প্রতিধ্বনিমণ্ডলে 'বাঁধে বাসা / চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা'। কবিতার এই অংশে (কোনো অংশেই) অখণ্ড পূর্ণতা বা লাভক্ষতির হিসাব মেলাবার কোনো কথা নেই—যদি

না আমরা অখণ্ডতা বা হিসাবের মিল খুঁজে পাই মানুষের চিত্ত নিয়ে 'বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে' অনন্তকাল ধ'রে যে দ্যূতখেলা চলছে তার বিষয়ে কবি যে-কাব্যরচনা করেন সেই কাব্যের অক্ষয় সৌন্দর্যে। কারণ কবি বলছেন সেই প্রতিধ্বনিমণ্ডল থেকে—

বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

কিন্তু মহাকালের নিরর্থক দ্যূতখেলার মধ্যে এই যে যুগযুগান্তের বাণীধারা এসে কবিচিত্তে সংহত হয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যের জন্ম দিল, তার মধ্যেও কি সৃষ্টির অর্থ এবং সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সম্ভব হ'ত যদি সর্বত্যাগী অপব্যয়ের মধ্যে এইটুকু সঞ্চয়ও থাকত। কিন্তু এই বাণীধারার প্রতিও মহাকাল সমান নির্দয়। তাই নিয়ে কবির শেষ প্রশ্ন :

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড-হেন?
কিন্তু, কেন।

প্রশ্নটা প্রকৃতপক্ষে এই নয় যে, এই বাণীধারার সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে কি না। সে-আলংকারিক প্রশ্নের উত্তর উহ্য রয়েছে কিন্তু মোটেই অস্পষ্ট নয়— হয়ে যাবেই। ঐ উত্তর থেকেই আসল প্রশ্নের উৎপত্তি— 'কিন্তু কেন'? এই রূপহারা গতিবেগের প্রেত-লোকে এইটুকু পাথেয়ের পাত্রও কেন উজাড় ক'রে দিতে হবে

‘আপন স্বল্পায়ু বেদনায়’ ? এ-প্রশ্নও শূন্যে বাজতে থাকবে, ‘ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর’।

‘ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর’ যে-কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি, তা কিন্তু নবজাতক-এর ভিন্ন একটি কবিতা, নাম “প্রশ্ন”। আরো গভীর, হতাশ, হৃতবিশ্বাস তার সুর। একজন তরুণ কবি-সমালোচক আপত্তি তুলেছেন—ঐ কবিতার অনেক অংশ একটি সম্ভাব্য কবিতার পদ্য-ভাষ্য মাত্র, কবিতা হয়ে ওঠে নি। “কেন” সম্পর্কে এ-ধরনের আপত্তি আরও সোচ্চার হতে পারত। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তার বিস্তারিত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের কানেও এমনতর আপত্তির কথা পৌঁছেছিল—তাঁর শেষ দিককার কবিতা নাকি চিন্তাগর্ভ, হৃদয়-সঞ্জাত নয়, সেই কারণে বিশুদ্ধ কবিতা নয়। এই আপত্তির উত্তরে তিনি নিজে যে-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাত্মক বাক্যটি ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন তা স্মরণীয় এবং অবিস্মরণীয় : ‘চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না ?’ আমি শুধু যোগ করব যে, মহৎ কবিতা আমরা তখনই পাই যখন কোনো গভীর চিন্তাগর্ভ কথা তৎসম্ভূত ও তদাবরক হৃদয়ানুভূতির বিস্তৃত পরিমণ্ডল-সুদ্ধ ব্যক্ত হয়। অনুভূতি না থাকলে কবিতা হয় না, কিন্তু অনুভূতিমাত্র কবিতার সম্বল নয়, শুধু চিত্রকল্প অর্থাৎ অপ্রতীকী চিত্রকল্পও নয়। কাব্যের উপাদানগুলি কবিতার মধ্যে অর্থবান না হয়ে উঠলে কবিতা হয় না। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতা এই মানদণ্ডে বিচার্য। রবীন্দ্র-পরবর্তীদেরও।

রোগশয্যায়-এর ৭ ও ৮ সংখ্যক কবিতা পরস্পর-সম্পূরক ; একই কবিতার দুই স্তবকও বলা যেতে পারে। এই যুগ্মকবিতার শিরোনামা হতে পারত ‘মনে হয়’—দুটি কবিতার মূলে রয়েছে

ঐ 'মনে হওয়া'। মনে হয় যা তার মধ্যে প্রত্যক্ষত পরম আশ্রয়ের স্বীকৃতি রয়েছে, অন্ধকার ছিন্ন ক'রে আলোরই জয় হবে, অন্তহীন কাল ক্ষীণপ্রাণ মানুষের দায় স্বীকার ক'রে নেবে—এমনতর ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু তারি মধ্যে আবার ঐ অঙ্গীকার নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার, আকাশের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে ওঠার অনিবার্যতাও সুনির্দেশিত। প্রতীকী কাব্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সংক্ষিপ্ত, ঘনসন্নিবদ্ধ যুগ্ম কবিতার সমস্তটাই উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

৭

গহন রজনী-মাঝে
রোগীর আবিষ্ট দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,
মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমার প্রাণের দায় করিছে স্বীকার ;
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

৮

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়

আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

যাবতীয় দ্যাবাপৃথিবী থেকে আশ্রয়ের শেষ চিহ্নটাও কি মুছে গেছে? নইলে বিনিদ্র গভীর রাত্রে প্রিয়জন কেউ অল্পক্ষণের জন্য শুশ্রূষার কাজে ঘরে এলে কেন মনে হয় গ্রহতারা সস্নেহে কথা ব'লে উঠেছে, আর চ'লে গেলেই সমস্ত জগৎ একেবারে উদাসীন হয়ে যায়? এমন উপলব্ধির তাৎপর্য কী? আশার রেশটুকু ধ'রে রাখার কী অপরিসীম ব্যাকুলতা; অথচ কবিতার মধ্যে আশ্বাসের বাণী একবার শুধু আলোকের ভর্ৎসনায় সোচ্চার হয়ে উঠেই থেমে যায়, তার পরে কবির চারিদিকে রয় কেবল উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা— যে-স্তব্ধতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পাস্কালের সেই বিখ্যাত উক্তি: 'অনন্ত আকাশের স্তব্ধতা আমার চিত্তে আতঙ্ক সঞ্চার করে।' দ্বিতীয় স্তবকে আলোর ভর্ৎসনা শুনে স্বভাবতই আশা জাগে— কুজ্ঝটিকা স'রে যাবে বুঝি। কিন্তু যায় না; বরঞ্চ সূর্যোদয়ই ফ্যাকাশে হয়ে আসে। ভোরের আলোর ক্ষীণাভাসটুকু দেখতে পেয়ে অরণ্যের পাখিরা গান গেয়ে উঠেছিল, সে-গানও থেমে যায়, সারা পৃথিবীর স্তব্ধতা সব-কিছুকে গ্রাস করে। এমনি এক সর্বগ্রাসী নিস্তব্ধতার মধ্যেই কি ডুইনো এলিজি-র প্রথম পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারিত হয়েছিল—

> Who, if I cried, would hear me among the angelic orders?

রবীন্দ্রনাথ ও রিল্‌কে, এ-শতাব্দীর দুই মহান কবির সেই একই চূড়ান্ত ঘোষণা:

...For Beauty's nothing
but beginning of Terror we're just able to bear,
and why we adore it so is because it serenely
disdains to destroy us. Each single angel is terrible.

অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে,
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে।

মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দ স্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে।
শোকের বুদ্বুদ তোর অশোক সমুদ্রে যাবে ভেসে।

সানাই-এর বেশির ভাগ কবিতা প্রেমের, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা ও গান এ-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত— 'ভালোবাসা এসেছিল/এমন সে নিঃশব্দ চরণে', 'এসেছিলে তবু আসো নাই, তাই/জানায়ে গেলে', 'তব দক্ষিণ হাতের পরশ/করো নি সমর্পণ', 'তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ', 'পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে', ইত্যাদি। সানাই মধুর রসের শেষ কাব্যগ্রন্থ, কবির বয়স তখন আশির কাছাকাছি। এই শেষ দাক্ষিণ্যের মাঝখানে হঠাৎ চমকে উঠি একটি ছোট্ট কবিতায় এসে। কোনো (কোন্?) "ব্যথিতা"কে নিয়ে ঐ নাম দিয়ে লেখা এ-কবিতা :

জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।
দুঃসহ দুরাশার

গুরুভার যাক দূরে
কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা।

কী সে বঞ্চনা যার স্বরূপ বোঝাতে গেলে 'ইতর' শব্দটি ব্যবহার না করলেই নয়? কে তাকে ইতরভাবে বঞ্চিত করেছিল? তারই 'কৃপণ প্রাণ'— গানের ভাষায় যা হয়েছে 'অকিঞ্চন জীবন'? কিন্তু প্রাণকে ইতর বলা মানে তো প্রকৃতিকে ইতর বলা। প্রকৃতি কি স্বয়ংচালিত, অনীশ্বরবিহিত? তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে বিধাতাকে স্পষ্ট অদ্ব্যর্থ ভাষায় 'ক্রূর' বলা হয়েছে। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথ— বিশ্বসুদ্ধ লোক যাঁকে গীতাঞ্জলি-রচয়িতা ভক্ত কবি ব'লেই চেনে— এই শব্দগুলি এক বঞ্চিতার দুঃখ বর্ণনা করতে অসংকোচে ব্যবহার করলেন, এবং তার একটি অন্তত সোজাসুজি ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করলেন?[৭] কোন্ কশাঘাততুল্য ব্যক্তিগত কিংবা সমাজগত অভিজ্ঞতা (বা অভিজ্ঞতার স্মৃতি) তাঁকে শেষ জীবনে অন্তত একবারের মতোও ব্ল্যাস্‌ফেমির আশ্রয় নিতে বাধ্য

শেষ পর্বের কবিতার ফলশ্রুতি কি তবে এই যে, অন্তিম দশকে রবীন্দ্রনাথের মন হয়ে উঠেছিল সর্বব্যাপী দুঃখ ও পাপ বিষয়ে অতীব চেতন, সত্য-শিব-সুন্দরের পরমতা বিষয়ে সন্দিহান, মঙ্গলময় বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সর্বতোভাবে নিরাশ, নিরুৎসাহ, নিরানন্দ? না।

১ শিশিরকুমার ঘোষ— রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য, পৃ ১৯২

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ১৮৯

৩ প্রমথনাথ বিশী— রবীন্দ্র-সরণী, পৃ ৩৯৯

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ১৯৪

৫ 'বুঝতে পারছি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না, এত কষ্ট পাচ্ছে। নানারকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে একথা ভাবলে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপর।' চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, আষাঢ় ১৩৩৯। পুনশ্চ-এর "বিশ্বশোক" কবিতাটির রচনার তারিখ ১১ ভাদ্র, ১৩৩৯।

৬ এই কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী লিখছেন, "এই লীলার সংগতি কোন্‌খানে? বলছেন 'ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর মাঝে' যা কিছু দেওয়া এবং হারানোর হিসাব মিলছে। সবসুদ্ধ ক্ষয় নেই, অখণ্ড পূর্ণতা বিরাজিত।"—সাম্প্রতিক, পৃ ১৯০

৭ এই কবিতাটিতে সুর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে অনেকটা বদলে দিয়েছিলেন। 'ও আজি মেনেছে হার ক্রুর বিধাতার কাছে' হয়েছে 'ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে' এবং 'কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা'র সংস্কৃত রূপ হচ্ছে 'অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা'। অথচ সানাই-এর কবিতাতে মেয়েটির নির্দোষ অসহায় ও অসহ ব্যথার যে অব্যর্থ প্রকাশ, গীতবিতান-এর গানের ভাষায় তার সিকি ভাগও সম্ভব হয় নি। গানের অধিক সংখ্যক শ্রোতার কথা স্মরণ ক'রে কি এই ভাষাশুদ্ধি? না কি তাঁর মনে হয়েছিল কবিতাব ছন্দ যতখানি জোরালো এবং অনাবৃত শব্দের আঘাত সইতে পারে, গানের সুর ততখানি পারে না, সুর চায় অপেক্ষাকৃত মোলায়েম, নিরীহ ভাষার বাহন?

উত্তীর্ণ-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথ ঐ বয়সের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ও রোগযন্ত্রণা এবং ঐ সময়কার ঘোরতর 'সভ্যতার সংকট'-জনিত মানসিক গ্লানি সত্ত্বেও মনের গভীর তলে আদর্শনিষ্ঠা, মূল্যবোধ ও ধর্মবিশ্বাস (faith) বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ; তাঁর শেষ পর্বের বাণী সর্বময় প্রত্যাখ্যানের, বিতৃষ্ণার বা বিদ্রূপের বাণী নয়। দুটি কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে এ-প্রসঙ্গে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস বলতে কোনো পূর্ব যুগাগত ধর্মমতের প্রতি আনুগত্য বোঝায় না,[১] বোঝায় তাঁর 'আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে' পাওয়া কঠিন সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা। য়ত, তিনি যেমন কোনো প্রাচীন বা প্রচলিত ধর্মমতকে সম্পূর্ণ নিজের ব'লে স্বীকার করতে পারেন নি, তেমনি তাঁর জীবনের তথা কাব্যের কোনো-এক পর্যায়ে অভিব্যক্ত ধর্মচিন্তা বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে তার সমস্ত জীবনের পক্ষে ধ্রুব ব'লে মেনে নিতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল।[২]

ব্রহ্মসংগীতের 'নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা'র কিংবা গীতাঞ্জলির 'পরান সখা, বন্ধু'র সাক্ষাৎ মেলে না শেষ পর্বের কাব্যে। সে শূন্য আসন পূর্ণ করলেন যে দুই দেবতা তাঁদের কথাই বোধ করি কবি বলতে চেয়েছেন পত্রপুট-এর "পনেরো" সংখ্যক কবিতার শেষ ভাগে :

সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

মনের মানুষের কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে "মানুষের ধর্ম" ও "Religion of Man"—যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩) ও ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩০) প্রদত্ত বক্তৃতামালায়। "শান্তিনিকেতন" নামক দুই খণ্ড পুস্তকে সংকলিত আশ্রম মন্দিরে প্রদত্ত (১৯০৮-১৯১৪) বক্তৃতাবলীর সঙ্গে "মানুষের ধর্ম"-এর তুলনা করলে ঐ সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। 'মনের মানুষ' কথাটা বাউল গান থেকে নেওয়া, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন; সেই অর্থ বোঝাবার জন্য বলেছেন—'এক মানুষ', 'মহামানব', 'বিশ্বমানব', 'পূর্ণ পুরুষ', 'The Eternal Man', ইত্যাদি। শেষ পর্বের দ্বিতীয় আরাধ্য দেবতা 'মহাকাল', 'রুদ্র', 'ভীষণ', 'ভৈরব', 'নটরাজ', 'খেলার গুরু' প্রভৃতি নামে অভিহিত। এই দেবতার আবির্ভাব গদ্যে বিরল, কিন্তু শেষ পর্বের কাব্যে তাঁকে প্রায়ই পাওয়া যায়। অপরপক্ষে মহামানব যতখানি ভাবুক রবীন্দ্রনাথের ধ্যেয়, ততখানি কবি রবীন্দ্রনাথের নন।

আমার এই শেষের উক্তিটির মহৎ ব্যতিক্রম "শিশুতীর্থ"—সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা (অথচ লিপিকার কয়েকটি ছোট ছোট রচনা বাদ দিলে এটাই তাঁর প্রথম গদ্যকবিতা)। এই দশ পৃষ্ঠার ঠাসবুনোন রচনায় আছে মহাকাব্যের সুবিস্তৃত পটভূমি, মহোচ্চ ভাব ও অনুভব, আছে বলিষ্ঠ ভাষার গম্ভীর ঝংকার। সেই এপিক ভাব ও ধ্বনিধারার সঙ্গে মিশেছে লিরিকের সূক্ষ্ম আবছা ইঙ্গিতময়তা। দুই বিপরীত ঠাটের রাগিণীর যুগলবন্দি শুধু নয়,

তারই সঙ্গে তাল রেখে চলে চিত্রকল্পের দ্রুত পটপরিবর্তন— মানবিক ও প্রাকৃতিক ল্যাণ্ডস্কেপ-আঁকা ক্যানভাসগুলি একটার পর একটা চোখের সামনে আসে আর স'রে যায়।

ভাবতে অবাক লাগে যে, এমন আশ্চর্য সার্থক কবিতা প্রথমে লেখা হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। মিউনিকের নিকটবর্তী ওবেরাম্‌মের্গান নামক গ্রামে যীশু খ্রীষ্টের জীবনলীলা অবলম্বনে রচিত একটি প্যাশন-প্লে দেখে কবি তার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরে তা বাংলায় রূপান্তরিত হয়; অনূদিতও বলা যায়, কারণ দুটোর ভাব ও বিষয়বস্তু একই। কিন্তু শিল্পোৎকর্ষে আসমান-জমিন তফাত। মূল ইংরেজি মোটের উপর নৈরাশ্য-জনক; প'ড়ে কোনো ধারণাই হয় না বাংলা ভাষায় এই কবিতাটি কী মহিমা লাভ করেছে। মালার্মের উক্তিটি মনে পড়ে—'poetry is written with words, not with ideas'। ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহৎ ভাবের যথাযোগ্য শব্দবাহন খুঁজে পান নি; বাংলায় তাঁর অতুলনীয় বাক্‌সিদ্ধি ঐ ভাবকে রসসৃষ্টির উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাক্‌সভ্য নগ্ন হিংস্রতার কাল থেকে সেই সুদূর ভবিষ্যতের স্বপ্নাবৃত স্বর্ণযুগ পর্যন্ত যখন 'মহামানব' জন্মলাভ করবে— মানবজাতির ইতিহাস-যাত্রা বিধৃত হয়েছে অল্প কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখায়। কবিতার সূত্রপাত নাটকীয় এবং প্রতীকী:

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;

পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

মানুষের স্বভাবে রয়েছে এক অবিরাম অথচ অঋজু গতি—পশু থেকে দেবতার দিকে। কিন্তু পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। রাত কত হ'ল, আদিমযুগের তামসিকতা কতটুকু কাটল ?— কোনো উত্তর নেই এই উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে পথ এখনো অনেক বাকী রয়েছে। প্রকৃতির (জীব ও জড় প্রকৃতির) রাক্ষসী মায়া বিভীষিকা বিস্তার করে। বিপুল সংখ্যক মানুষ পরস্পর বিদ্বেষে অন্ধ, হিংসায় উন্মত্ত ; জড় প্রকৃতির, মূঢ় সংস্কারের, স্বার্থান্বেষী অধিনেতার দাস তারা :

সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্‌কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে,
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।

শেষের পঙ্‌ক্তিগুলির উপর সেই সময়কার অতি জঘন্য হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার ছায়া পড়েছে। মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণকারী জাপানী ফৌজের বীভৎস আচরণের সংবাদও এসে পৌঁছেছিল বোধ হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণও একটি হত্যাকাণ্ড, সম্ভবত কোনো-এক পাগলের হাতেই।

এই তমসাচ্ছন্ন, জড়বুদ্ধি মানবজাতির মধ্যেই দেশে দেশে যুগে যুগে দেখা দেন সক্রেটিস, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, মোহনদাস গান্ধীর মতো মহাপুরুষেরা ; আসেন প্রজ্ঞা ও প্রেমের বাণী নিয়ে, জনসমাজে স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠা, আনুগত্য লাভও করেন তাঁরা।

কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। জনতা কিংবা কুলপতিরা বিদ্রূপের অট্টহাস্য দিয়ে আঘাত করে তাদের শিক্ষাকে, কখনো বা হত্যা ক'রে বসে শিক্ষাদাতাকেই। তার পরে মূঢ়ের দল আবার নেমে যায় তাদের আদিম স্বভাবের নিম্ন ভূমিতে। অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে। অমানুষিকতা যখন চরমে পৌঁছয় তখন 'বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ'— সেই প্রকৃতির পরিহাস :

> জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
> অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
> 'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।'
> ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
> তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
> অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
> হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
> অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
> একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
> তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
> রাত্রি নিস্তব্ধ।
> ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
> বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখানো হয়েছে মানুষের স্বভাবে পশুই অধিপতি, দেবতা প্রচ্ছন্ন, অনুত্থিত। তবু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস হারান না,[৩] চেয়ে থাকেন সেই অনাগত কালের দিকে যখন মানুষ জয় করবে তার পশুস্বভাবকে। অবতার বা মহাপুরুষ নন, ঘরে ঘরে ভূমিষ্ঠ হবে পূর্ণ পুরুষ, পূর্ণ মনুষ্যত্বের চিরজীবিত আদর্শ। "শিশুতীর্থ"-তে ত্রাণকর্তাদের[৪] মহিমান্বিত ব্যর্থতাই দেখতে পাই; যে-নবজাতকের অভ্যুদয় শেষ কয়েকটি ছত্রে ঘোষিত তিনি

কোনো ত্রাণকর্তা, পীরপয়গম্বর, ঋষি বা অবতার নন, তিনি চিরমানব :

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে :
'জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।'

'এই মাতা কে ?'—প্রশ্ন করেছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এবং ঠিকই উত্তর দিয়েছেন : 'মাতা বসুন্ধরা। সমস্ত সৃষ্টি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে কবে মাতা বসুন্ধরা তাঁহার তৃণশয্যায় মানবশিশু কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন ; সেই মানবশিশুর মধ্যে ঘনীভূত হইয়া রূপ লাভ করিবে সৃষ্টির সকল অর্থ।'[৫] কিন্তু যে-মানবশিশুর মধ্যে সৃষ্টির সকল অর্থ দেখতে পাওয়া যাবে তিনি এখনো জন্মান নি, 'পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক ; তাঁর রথ ধাবমান ; কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি'।[৬]

মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি- ও প্রলয়- সভাতলে—
তার বহ্নিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা— কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।

(রোগশয্যায়—"পাঁচ")

বিশ্বের ভৈরবীচক্রে মানুষের ক্ষুদ্র দেহ তার বহ্নিরসপাত্র নিয়ে কিসের জন্য যোগ দিল, শুধু কি অপরিমেয় যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ? সেই ক্ষুদ্র দেহের মৃৎভাণ্ড

ভ'রে উপচে পড়ছে 'রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোত'— এ কি কেবল 'বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা', কোনো অর্থ নেই তার ? কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না মানুষের সত্তার বাইরে ; সে-অর্থ তো পাওয়ার জিনিস নয়, দেওয়ার জিনিস। মানুষ আপন অপরাজেয় সাধনার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে যদি অর্থবান ক'রে তুলতে না পারে তবে সে-সৃষ্টি বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা রূপেই প্রতিভাত হতে থাকবে সুস্থ মূল্যবিচারে। একদিন রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ভাষায় বলেছিলেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর / এ প্রেম হত যে মিছে।' আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন —আমায় নইলে এ সৃষ্টি হ'ত মিছে। শুধু 'আমায় নইলে' নয়, আমি যদি একে আপন তপস্যার মূল্যে, প্রাণের মূল্যে, সত্য না করতে পারি তবে এ-সৃষ্টি মিথ্যাই থেকে যাবে। মানুষ জগৎ সৃষ্টি করে নি, কিন্তু জগৎকে মূল্যযুক্ত (charged with value— 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'-এর অর্থও কি তাই নয় ?) ক'রে তুলবার দায়িত্ব মানুষেরই :

প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে ?

সবার উপরে মানুষ সত্য— হিউম্যানিজ্‌ম্-এর এই মূল কথাটা উপরে উদ্ধৃত কবিতায় এবং শেষ পর্বের আরো কয়েকটি কবিতায় যত উদ্দীপ্ত, যত জ্বালাময় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গদ্যে বা পদ্যে তেমন ক'রে আর কেউ বলেছেন ব'লে তো মনে করতে পারছি না।

ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ বলেছেন— স্বে মহিম্নি, আপন মহিমায়। সেই ভাষায় রবীন্দ্রনাথও বলছেন মানুষের সত্যপ্রতিষ্ঠা তার মহিমায়, তার পূর্ণতায়। মনুষ্যজাতির দেবকল্পনার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তার আপন পূর্ণতার আদর্শকে গ'ড়ে তুলবারই ইতিহাস ; আপন পরিপূর্ণ বিকাশের চরম আদর্শকে মানুষ ভগবান ব'লে জেনেছে চিরকাল। যখন অখণ্ড প্রতাপকেই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তর ভেবেছে, তখন শক্তির পূজা করেছে ; যখন শ্রেয়োনীতিক আদর্শ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে তখন ভগবান হয়েছেন পরম মঙ্গলময়, প্রেমময়। অবশ্য ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় এমন সব উপাদান দিয়েও দেবমূর্তি গড়া হয়েছে 'শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর (আমার চরম মূল্য কোথায়— এই প্রশ্নের ভ্রান্ত উত্তর।) এবং মানুষের কল্যাণের জন্য সকল রকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই।'[৭] অর্থাৎ দেবতা যে কেবল যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হচ্ছেন তাই নয়, যুগে যুগে স্বধামে পরিশুদ্ধ বা সমুন্নতও হচ্ছেন —মানুষেরই আত্মশুদ্ধি ও ক্রমোন্নতির অব্যর্থ পরিণাম-স্বরূপ। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম— কোন্ দেবতা আমার যথার্থ দেবতা —এ-প্রশ্ন সর্বকালের। কিন্তু কেমন ক'রে জানব আজকের দিনে কোন্ দেবতা সত্য, সত্যই পূজনীয় ; আর কোন্ দেবতা ইতিমধ্যে হবিদানের অযোগ্য হয়ে পড়েছেন ? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।'[৮]

পূর্ণ পুরুষের যে-চরম আদর্শ আমাদের মনে বিরাজিত, তাকে ভগবানের শত রূপের একটি রূপ মাত্র বলা যেতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার চেয়েও বেশি বলতে চান, বলতে চান

ভগবান শব্দ দ্বারা এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। এর বাইরে যদি কোনো অভিধা থাকে ঐ শব্দের তবে তা আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত, সুতরাং তাকে মানা না-মানা দুই-ই সমান। দেশ-বিদেশের ধর্মশাস্ত্র ভগবানকে যত মানবোত্তীর্ণ বিশ্বাতিগ রূপেই কল্পনা করুক না কেন, বস্তুত, মনুষ্যত্ববিকাশের চরম আদর্শ ছাড়া ভগবানের আর কোনো মানে নেই।[৯] শেষ জীবনে মানবোত্তীর্ণ কোনো অধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না এ-কথা একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন : 'আমার মন যে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই।'[১০] সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্য মানুষের মধ্যেই নিহিত ; তার বাইরে যেমন কোনো পরম শ্রেয় নেই, তেমনি কোনো পরম সত্যও নেই: 'জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাইছে বিশ্বমানবে। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।'[১১]

সৌরজগতের আরম্ভকালের বহু শত কোটি বৎসর পরে মানুষের সূচনা, তাই সে চরম মূল্য ও পরম সত্যের আধার হতে পারে না— এমন ভাবা ভুল। ক্ষুদ্রায়তন ও ক্ষণজীবী ব'লে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে তার তাৎপর্য মোটেই সীমিত নয়। 'মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার ক'রে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড় করা একটা

মোহ মাত্র।'[১২] মানুষের দুর্জয় চেতনা সেই অপরিমেয় সত্য।

'ভগবান' এবং 'মহামানব' শব্দদ্বয় যদি সমার্থবাচক হয় এবং মহামানব মানবত্বের চরম আদর্শ রূপেই সত্য হন, তবে কি একথা মানতে আমরা বাধ্য নই যে, ভগবান মানুষের মনের একটি ধারণামাত্র (সে-ধারণার মূল্য যতই হোক), মনের বাইরে তিনি সত্য নন ? কারণ আদর্শ আমরা তাকে বলি যা ইতিমধ্যেই সিদ্ধ নয়, মানুষের নিত্যনিয়ত সাধনার দ্বারা অল্পে অল্পে অনন্ত কাল ধ'রে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে চলেছে। ভগবানের সত্তা কি তবে আমাদেরই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অক্ষম চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, কাজেই সে-চেষ্টার সম্যক্ চরিতার্থতার পূর্বে তিনি পূর্ণ সত্য নন ?

ভগবান বা পূর্ণ পুরুষ মানবোত্তীর্ণ কিছু নন, একথা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাদের মনগড়া বা মনোগত ব্যাপার মাত্র। আমরা এখানে একটি জটিল তত্ত্বে এসে পৌঁছচ্ছি। পরম মূল্য একাধারে বিষয়গত ও বিষয়ীগত ব্যাপার, মনের মধ্যে সত্য, আবার মনের বাইরেও সত্য। কোনো দার্শনিক আলোচনায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক সমাধানটাই এখানে খুব সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করবো :

মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। এক দিকে সে জীব, জৈবধর্ম পালন করে, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত হয়। অন্য দিকে সে জীববিজ্ঞানের বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য নয়। স্বভাবের তাগিদকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রেয়ের উপর স্থান দেয় শ্রেয়কে, সহজেই আত্মরক্ষা করতে পারত যে-দিকে সে-দিকে না গিয়ে পা বাড়ায় সেই দুরত্যয় ক্ষুরধার পথে যে-পথে তার ধনপ্রাণ প্রিয়জন সবই বিপন্ন। সচরাচর এমনটা ঘটে না, তবু ঘটে। কী সেই প্রবল শক্তি যা তাকে স্বাভাবিকের ইস্পাতে-বাঁধা মসৃণ সড়ক থেকে

যেন ডিরেল্‌ ক'রে নিয়ে যায় দুঃসাধ্য আদর্শের উপল-বন্ধুর অজানা ভূমিতে যেখানে কোনো পথই কাটা হয় নি? 'জ্যোতির্বিদ দেখলেন কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষের মন আপন প্রকৃতি-নির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথে আবৃত্তি ক'রে চলছে না। অনির্দিষ্টের, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে।'[১৩] মানুষের বেলা এ অগোচর গ্রহের নাম ভগবান এবং সংজ্ঞা পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। এই গ্রহটি ইউরেনস নেপটিউনের মতো দূরবীনে-দেখা মাপজোখ-করা বাস্তব নয়, অথচ কাল্পনিক বা মনের ব্যাপার মাত্র ব'লে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনের বাইরেও তা সত্য, যদিও সেই সহজ অর্থে সত্য নয় যে-অর্থে প্রচলিত ধর্মমতগুলিতে অতিমানব ভগবানের অস্তিত্ব অবধারিত ও বিঘোষিত হয়ে থাকে।

শেষ দশকের অন্য ধ্যেয় দেবতা রুদ্রনটরাজ। গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাকে বলা হয়েছে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন; প্রতিতুলনায় শেষ পর্বের কবিতাকে বলা যেতে পারে শৈব-ভাবাপন্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-সব উক্তি স্পষ্টতই শর্তাধীন। প্রথমত, গীতাঞ্জলি পর্বে যতখানি ভাবৈক্য পাওয়া যায়, শেষ পর্বে (পরিশেষ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত) তা অনুপস্থিত; সেই পর্বের দ্বৈত-সাধনার কথাই বর্তমান অধ্যায়ে আমার আলোচ্য। দ্বিতীয়ত, গীতাঞ্জলির ভাব বৈষ্ণব-ঘেঁষা হলেও ঠিক বৈষ্ণবীয় নয়। পদাবলীর সঙ্গে গীতাঞ্জলির সাদৃশ্য যতখানি, বৈসাদৃশ্য তার চেয়ে বেশি। তেমনি শেষ পর্বের ভাবের সঙ্গে কোনো প্রচলিত শৈব মতের মিল খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। বৈষ্ণবই হ'ন আর শৈবই হ'ন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই।

এই সময়ে যে-চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ফিরে ফিরে আসছে তা অপ্রকাশ থেকে প্রকাশে উচ্ছ্রিত এবং প্রকাশ থেকে অপ্রকাশে বিলীন হয়ে যাওয়ার চিত্র— নীহারিকাপুঞ্জের সৃষ্টি ও প্রলয়ে যেমন, সভ্যতার উত্থান-পতনে তেমনি, তেমনি কোনো মহাকবির দেশজোড়া প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তিতে। নক্ষত্রসভায় এবং মানবসমাজে এ অন্তহীন বিরতিহীন চক্রগতির কেন্দ্রবিন্দুটি কিন্তু স্থির :

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।

(শেষ সপ্তক—"সাত")

যে-দেবতার কাছে কবি দীক্ষা চাইছেন তিনি মানুষের প্রতি মমতাশূন্য ; সৃষ্টিতে তাঁর যেমন ঔদাসীন্য, প্রলয়েও তেমনি। জড়জগতে ও প্রাণলোকে যে-বিপুল 'অপচয়' ঘ'টে আসছে চিরকাল ধ'রে, তাকে বলেছেন 'আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়' নবজাতক-এর একটি কবিতায়।

এই দীক্ষার আর-এক রূপ প্রকাশ পেয়েছে শেষ সপ্তক-এর বাইশ-সংখ্যক কবিতায়। কবি নিজের রক্তমাংসের প্রাত্যহিক স্বরূপের প্রতি নির্মম হতে চান ; তাঁর দেহ-মনকে অধিকার ক'রে আছে যে অনেক কালের বুড়ো, 'কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা', তার গ্লানিকর অস্তিত্বটাকে দূরে ঠেলে দিতে চান :

আমি আজ পৃথক হব।
ও থাক ঐখানে দ্বারের বাইরে—
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
… … …
আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে
ঐ দূরপথের পথিককে,
… … …
দেখব যেমন ক'রে পুতুলনাচ দেখে।

এখানে সন্ন্যাসী শিব এক হয়ে গেছেন নিজেরই অন্তরতম শুদ্ধতম সত্তার সঙ্গে— বেদান্তের পরিভাষায় যাকে 'সাক্ষী চৈতন্য' বলা যেতে পারে; একটু পরে ঐ কবিতায় 'আমি'র পরিচয় দিচ্ছেন পাকা বৈদান্তিকের মতো :

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,

কিন্তু তার পরেই যে-কথাটা যোগ করলেন, কোনো বৈদান্তিক 'পরম-আমি' সম্বন্ধে সে-কথা ভাবতে পারেন না। বলছেন— 'অকিঞ্চন আমি'। 'আমি' যা-কিছু ভালোবাসি, ভোগ করি, যাতে আহত ও পীড়িত হই, পুড়ে মরি— সব-কিছুই ছাড়ব, ছেড়ে একেবারে মুক্ত পুরুষ হয়ে যাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করব— 'অকিঞ্চন আমি, আমার কোনো কিছুই নেই'। যে-কবি পরিপূর্ণ জীবনের ও সুন্দর ভুবনের জয়গান করেছেন বাল্যকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত, 'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি' যাঁর আদি ও অন্তিম মন্ত্র, তাঁর মুক্তি দূরে স'রে গিয়ে নয়। 'অহংকারের প্রাচীর' ভাঙতে চাইবেন তিনি স্বভাবতই, কিন্তু বৈদান্তিক অর্থে নয়, বিশুদ্ধ বিমুক্ত আত্মা হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। 'আমার কোনো কিছুই নেই'-এর ভিতরের কথাটা

রিক্ততা নয়, ঋদ্ধি— সব-কিছুই আমার, সব-কিছু ভালোবাসি আমি, সব-কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, এক হয়ে যেতে চাই। 'কুড়িয়ে আনা ছড়িয়ে ফেলা, একি তোমার একই খেলা'— এ-খেলায় রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন তাঁর 'খেলার গুরু'র সঙ্গে। সব-কিছুকে ধ'রে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে, অনুরাগ ও নির্বেদের মধ্যে, রক্তমাংসের মানুষ ও শুদ্ধাত্মার মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব, সে-দ্বন্দ্বের বোধ ও বেদনা কবির, দার্শনিকের নয়। দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের জ্বালাই হয়ে ওঠে কবিতা; সমাধানের নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত অনুসন্ধিৎসা থেকে জন্মলাভ করে দর্শন।

উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি শুধু গদ্য ছন্দে নয়, প্রায় গদ্যেই লেখা। বন্ধন ও মুক্তির, অনুরাগ ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব সংশয়াতীত কবিতা হয়ে উঠেছে আকাশপ্রদীপ-এর "পঞ্চমী"তে।—

ভাবি ব'সে ব'সে
    গত জীবনের কথা
কাঁচা মনে ছিল
    কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে,
    যাক গে সে-কথা যাক গে।

কবিতার একেবারে গোড়াতেই পরম বৈরাগ্য, যে-বৈরাগ্যের কাছে তরুণ প্রেমের সব সুখদুঃখ নিছক মূঢ়তা ব'লে ঠেকবার কথা। কিন্তু কবিতার বক্তব্য মোটেই তা নয়। মূঢ়তা ব'লে নিন্দিত তরুণ বয়সের প্রেম নয়; প্রিয়াকে সম্পূর্ণ পাই নি ব'লে দুঃখ করাটা, যখন যেটুকু পেয়েছিলাম তাই নিয়ে খুশী না হওয়াটাই বিষম মূঢ়তা হয়েছিল।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
    ভয় ছিল হারবার,

তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।

তখন এ-ছলনাটা বড় দুঃখের মনে হয়েছিল, প্রচণ্ড নালিশ ছিল সেদিন— তুমি নিজের সবটুকু ভালোবাসা অসংকোচে দাও নি কেন, কেন অহংকারের দেওয়াল ভাঙতে পারলে না। কিন্তু আজ—

পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি,
সিকি চাঁদনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।

অথচ কবিতার শেষে কবি জানাচ্ছেন— বয়স গিয়েছে, এ-সব ভেবে হাসিই পাচ্ছে এখন; একটু যেন অহংকার ক'রেই বলছেন :

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন!

কিন্তু এ-অহংকারের ভিত বড় কাঁচা, ফ্রয়েডীয়রা যাকে বলেন 'ইচ্ছাপূরক ভাবনা', অনেকটা তাই। দর্প কিন্তু কবি নিজের হাতেই চূর্ণ করেছেন পূর্ববর্তী স্তবকে মুক্তকণ্ঠে মেনে নিয়ে যে,

বিগত দিনের কথা ভেবে আজো তাঁর অনুতাপ-পীড়িত হৃদয় হায় হায় ক'রে ওঠে :

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি,
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস্য।

আজো মন উতলা হয়ে ওঠে সেই বোকামির দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার জন্য—

এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।

যদি-বা—

মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।

তবু আর একবার ফিরে এসো। যিনি উঠে গেছেন বৈরাগ্যের শেষ গিরিশিরে, যেখান থেকে গত জীবনের দিনগুলিকে কেবল সাদা-কালো পশুদলের মতো দেখাবার কথা— সে হৈম শিখরে এ বিষণ্ণ হুতাশ কেন? একটু বেখাপ নয় কি?

এ-সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সাধনা ছিল সেই 'নির্মম' দেবতাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করার, যিনি পরম দ্রষ্টা, পরম সাক্ষী, অবিচলিত আনন্দ-পূর্ণ ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন নক্ষত্ররাজির ভাঙাগড়া, মানব-জাতির উত্থান-পতন— যেন সারা বিশ্ব জুড়ে অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে এক সংঘাতমুখর তীব্রসুখদুঃখময় মহানাটকের অভিনয় চলেছে তাঁরই সম্ভোগের জন্য। 'অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি

সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখ-দুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলেছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন-যাত্রায়; কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে। এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করা মাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো-এক রসিকের সঙ্গে এক হয়ে।'[১৪]

এই একই অনুভূতির প্রকাশ আরোগ্য-র ৯-সংখ্যক কবিতায়। সেখানেও কবি জীবনলীলাকে দেখছেন কোনো রসিক পরম দ্রষ্টার সঙ্গে এক হয়ে। সেই পরম দ্রষ্টা নটরাজ; এবং লীলা শুধু মানব-জীবনেই আবদ্ধ নয়, 'আতসবাজীর খেলা আকাশে আকাশে / সূর্য তারা লয়ে / যুগ-যুগান্তের পরিমাপে।' এই আতসবাজির খেলায় কবিও এসেছিলেন 'ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে / এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।' কবিতার মধ্যে কিন্তু কবির ভূমিকায় একটা রূপান্তর ঘটে, অভিনেতা থেকে তিনি হয়ে ওঠেন দর্শক, নট থেকে নটরাজ :

> দেখিলাম, যুগে যুগে নট নটী বহু শত শত
> ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
> রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।

দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

দর্শক-সুলভ নির্লিপ্তির আরো সার্থক রূপায়ণ পরিশেষ-এর "খেলনার মুক্তি"। ছেলে-ভুলানো রূপকথার ভাষায় লঘু পরিহাসের মধ্যে তির্যকভাবে এসে পড়েছে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি-জনিত মৃদু বিষণ্ণ নৈরাশ্য। কবিতাটি আর কিছু নয়, একটি পুতুলের বিয়ে না-হওয়ার গল্প :

এক আছে মণি দিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানী পুতুল,
নাম হানাসান—

সেই জাপানী পেশোয়াজ-পরা হানাসানের সঙ্গে বিলেত থেকে আনা কোমরে তলোয়ার বাঁধা জাঁদরেল এক রাজপুত্রের

কাল হবে অধিবাস, পর্শু হবে বিয়ে।

কিন্তু বিয়ের আগের রাত্রে কোথা থেকে এলো কালো চামচিকে, ঘরময় ঘুরে ঘুরে ওড়ে আর 'সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া'। তার পরে হানাসানকে নিয়ে যথারীতি চম্পট দিল মেঘের দেশে 'যেখানে খেলনার স্বর্গ'। কাণ্ডকারখানা দেখে স্বভাবতই পলাতকা কনের মাতৃস্বরূপিণী মণির কান্না, আঙিনায় বটগাছতলায় গিয়ে ব্যাঙগমার কাছে কাকুতি-মিনতি—'হেই দাদা, হেই ব্যাঙগমা', আমাকেও নিয়ে চলো, হানাসানকে ফিরিয়ে আনি গে। কিন্তু হানাসানকে কি আর পাওয়া যায়, সে যে মেঘে মেঘে রঙে রঙে ছড়িয়ে পড়েছে 'নানাখানা' হয়ে। কী হবে তা হলে?

মণি বলে, 'ব্যাঙগমা দাদা,
এদিকে বিয়ে যে ঠিক,
বর এসে কী বলবে শেষে?'

ব্যাঙগমা হেসে বলে,
'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।'
মণি কেঁদে বলে, 'তবে
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা ?'
ব্যাঙগমা বলে, 'মণি দিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টিধোয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

জীবনভরা সর্বজনীন ব্যর্থতার আর-একটি আশ্চর্য চিত্রণ সেঁজুতি-র "তীর্থযাত্রিণী"। এক বৃদ্ধা নামজপ-ঝুলি হাতে নিয়ে 'জীবনের পথে শেষ আধক্রোশটুকু' পার হওয়ার জন্য সারাদিন ধ'রে ব'সে আছে ইস্টেশনে কোনো তীর্থগামী ট্রেন ধরবার জন্য। তারি রিক্ত জীবননাট্যের অকিঞ্চন কাহিনী কয়েকটি রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই দু-পৃষ্ঠার কবিতার মধ্যভাগে :

যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা ;
দুঃখে-সুখে-মেশা।
সে-রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা—
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।

সে রিক্তপাত্র বহুদূরে রইল প'ড়ে। কোনো পূর্ণ কুম্ভের দুর্মর আশায় আজ অন্য এক বহুদূরের জন্য ভোর থেকে সে ব'সে আছে,

ব'সে ব'সে ভাবছে অতীতের রিক্ততার কথা, কিন্তু ভবিষ্যতের পূর্ণতার আভাসে মন আছে ভরপুর :

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে ; প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

এ-সব কবিতার মূল সুর বৈরাগ্যের, যে-চিত্ত প্রকাশ পেয়েছে তাকে বিবাগী চিত্ত বলা যেতে পারে বইকি।[১৫] কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমত এবং শেষতও অনুরাগেরই কবি। তবে তাঁর অনুরাগের রঙ গৈরিক এবং বিবাগী চিত্ত বিশ্বপ্রেমিক। কাব্যে এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর সম্পূরণ বিষয়ে তিনি যে খাঁটি কথাটি বলেছেন সেটিও এখানে স্মরণীয় : 'কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা।...কবির কাব্যে সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।'[১৬] এই কথাটাই গানের ভাষায় একদিন বলেছিলেন :

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি,
চেয়ো না, চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী।

সবই চলে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে কালের স্রোতে, তবু মুহূর্তের জন্যেও যে-দৃশ্য ফুটে ওঠে চোখের সামনে তার একটি রসরূপ

আছে, সেটি আনন্দস্বরূপ। তা-ই ধ্রুব, তাই ধ'রে রাখার যোগ্য; আর কিছু নয়।

এটা বিশুদ্ধ কবিমনেরই কথা। কিন্তু ভাবুক কবি জানেন যে, ক্ষণিকতম ঘটনাও মহাকালের মধ্যে বিধৃত, সব-কিছুর ক্ষয় আছে তবু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদ্যন্তকালব্যাপী যে-সত্তা (the universe viewed sub specie aeternitatis), তা অক্ষয়। সেই মহাকালের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন যে-কবি, তিনিও চলমানের মাঝখানে ধ্রুব কেন্দ্রবিন্দুটির সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে আর একটি মন আছে, নয়নের পিছনে আর একটি নয়ন—যার কথা উপনিষদকাররা ব'লে গেছেন। কিন্তু শেষ পর্বের কাব্যে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা ধ্রুবতায় আত্মনিমজ্জন নয়, ধ্রুব ও ক্ষণিকের মধ্যে রবীন্দ্রমানসের টানাপোড়েন, তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মূল্যবোধ। কখনো ধ্রুব মহাকাল পান পুষ্পার্ঘ্য, কখনো অমৃতভরা ধাবমান মুহূর্তগুলি।

শেষ সপ্তক-এর একুশ-সংখ্যক কবিতা আরম্ভ হয়েছে 'অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে' যে-কাল মাপা হয় তারই নিঃসীম পটে আঁকা 'ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যোতিষ্ক পতঙ্গ'-এর আসা-যাওয়ার চিত্রকল্পে। দ্বিতীয় স্তবকে দৃশ্যবদল হয়, দেখা যায় 'ছোট ছোট কালের পরিমণ্ডলে' একের পর এক দর্পোদ্ধতপ্রতাপ কত সভ্যতা বুদ্বুদের মতো উঠল জেগে। সেই সব যুগের 'আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে' অমর করতে চেয়েছিলেন তখনকার কবিরা। কিন্তু আজ সে বুদ্বুদগুলি যেমন 'মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দে' মিশে গেছে, তেমনি 'নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য'।

মনে হয় এইখানে কবিতা শেষ হবে। 'নক্ষত্রলোকের নিমেষহীন আলোকের নিচে' লতাবিতানে ব'সে কবি বললেন, 'নমস্কার করি মহাকালকে' ('মহাকাল' শিব ও অনাদ্যন্ত কাল— উভয়

অর্থদ্যোতনা বহন করছে)। কিন্তু কবিতা এখানেই শেষ হ'ল না। 'নমস্কার' যেন অক্ষর মহাকালের চরণ এড়িয়ে চ'লে গেল অধরা মুহূর্তের বেদীতলে। সন্ন্যাসী মহাকালের কাছে যিনি দীক্ষা চেয়েছিলেন, তিনি ধন্য হলেন অমৃতভরা মুহূর্তগুলির অপরিমেয় ঐশ্বর্য পেয়ে :

অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে—
তার সীমা কে বিচার করবে ?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না।

মহাকালের ভক্তকবি শেষ পর্বের একাধিক কবিতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন ক্ষণিকের পায়ে, 'অনিত্যের বুকে অসীমের হৃৎস্পন্দন' শুনতে পেয়েছেন। গতি ও সমাপ্তি, ধ্রুব ও ধাবমান, শাশ্বত ও ক্ষণিকের দ্বন্দ্ব কোথায় যেন মিলেছে এক পরম ঐক্যে —কবি বুঝেছেন অথচ বোঝাতে পারছেন না, অথবা বুঝেছেন কিনা তাও ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট বোধ তাঁকে একাধারে তৃপ্ত ও ব্যাকুল ক'রে রেখেছে। তার আরো দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,

আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।
একদা শিশিররাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে,
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়,
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।

(সানাই—"ক্ষণিক")

প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে-কালে স্বর্গ, যে-কালে সত্যযুগ,
যে-কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন,
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশ-বীণায় গৌড়-সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

(পুনশ্চ—"সুন্দর")

ক্ষণকাল থেকে আবার দৃষ্টি ফেরানো যাক মহাকালের দিকে। যে সন্ন্যাসী মহাকাল, যে নিস্তব্ধ একাকী নটরাজের কথা রবীন্দ্রনাথ অন্তিম পর্বে বার বার বলেছেন, তাঁকেও মানবোত্তীর্ণ উর্ধ্বগগনচারী কোনো দেবতা ব'লে আমার মনে হয় না। এঁর সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যটি প্রযোজ্য— '···কোনো

অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সেকথা বোঝবার শক্তি আমার নেই।' আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের গভীরে একটি ধ্যানী শিব রয়েছেন, যিনি রাত্রির আকাশে সংখ্যা-গণনার অতীত নক্ষত্র-নীহারিকাকে এবং অনন্ত দেশকালের মধ্যে অবস্থিত সমগ্র মনুষ্যজাতির ভূতভবিষ্যৎকে নির্লিপ্ত অথচ তন্ময় চোখে দেখছেন। আমারই অন্তর্যামী মহতো মহীয়ান 'আমি'-র চোখে আমার এই ক্ষুদ্র 'আমি'-কে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ দেখাবে। তবু এই ক্ষুদ্র 'আমি'-র পক্ষে সম্ভব কোনো দুর্লভ রসোত্তীর্ণ বা জ্ঞানোত্তীর্ণ মুহূর্তে সেই অনাসক্ত অনন্ত অক্ষর দৃষ্টিলাভ করা। কিন্তু সে শাশ্বত মুহূর্তও ধাবমান; শিল্পীর রসমূর্তিতে বেশিক্ষণ ধ'রে রাখা যায় না, যোগীর ধ্যানদৃষ্টিতে তাকে অক্ষয় করার জন্য আজীবন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন।

কর্মেও মানুষ পূর্ণ হয়, ধ্যানেও পূর্ণ হয়। আমাদের মধ্যে দুটি ভিন্ন সত্তা রয়েছে— কর্মী ও ধ্যানী (জ্ঞানী এবং শিল্পী উভয়ই ধ্যানী পুরুষেরই ঈষৎ ভিন্ন প্রকাশ ; প্রতিতুলনায় কর্মী মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের উপাদান ও সংগঠন আলাদা)। তাদের ভিন্নতা মৌলিক। সাধনার এই মার্গদ্বয় আমাদের সামনে খোলা আছে ; দুটি কতকটা পরস্পর সম্পূরক হতে পারে, কিন্তু ঠিক সুসমঞ্জস নয়। ধ্যানদৃষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে কর্মোদ্যম ক'মে আসে ; বৈদান্তিকেরা কর্মসন্ন্যাসের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে, কর্মে নিবিষ্ট হতে হলে দৃষ্টিকে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হয় উপস্থিত কর্ম-ক্ষেত্রের সীমিত পরিধিতে। গীতাও জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছেন ব'লে তো মনে হয় না ; শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে তিনি ওই মার্গদ্বয় দুই ভিন্ন পার্সনালিটি টাইপের জন্য নির্দেশ করেছেন।

একই মানুষের মধ্যে দুই বিষম টাইপ সহবাস করতে পারে, তবু দুটি পথ এক নয়।

কর্মী ও জ্ঞানীর (তথা শিল্পীর) অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ইতিপূর্বে বলেছি, আবারও বলব। আপাতত যা বলতে চাই সেটা এই যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের দুই আরাধ্য দেবতা মানবিক সাধনার দুই ভিন্ন পথের দুটি চরম গন্তব্যস্থল। এই উভয় সাধনমার্গেই তাঁর গতি ছিল অক্লান্ত, তবু উভয়ের গন্তব্যে কোনো বিশ্বাতিগ অদ্বৈত সত্তার সন্ধান পান নি তিনি। পেলে হয়ে যেতেন বৈদান্তিক। আর যা-ই হোক, শংকরাচার্যের পথ রবীন্দ্রনাথের পথ নয়। সব পথ তাঁর অবশ্য একদিন প্রেমময় ও মঙ্গলময় ভগবানে মিলেছিল। কিন্তু চিরকাল মেলে নি।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ যেমন অত্যধিক ছিল, জাগতিক দুঃখ ও পাপের মাত্রাও তেমনি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তখন যদিও তাঁর মন বহু নিরুত্তর প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ ও হতাশায় ভারাক্রান্ত ছিল, তবু তিনি তাঁর সহজাত মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারান নি—যেমন হারিয়েছিলেন বহু সমকালীন পাশ্চাত্য সাহিত্যরথী। নটরাজের ধ্যান তাঁকে এক প্রকার বৈরাগ্যমাখা স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্তি দিয়েছিল; অন্য দিকে মানুষের অপরাজেয় শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস তাঁকে তিক্ত নৈরাশ্যের কবল থেকে রক্ষা করেছিল মৃত্যুদিন অবধি। 'নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে' যেমন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী', তেমনি দুই মহাযুদ্ধে নির্বাপিত-প্রায় মনুষ্যত্বের ভস্মস্তূপে দেখতে পেয়েছিলেন চিরমানবকে।

এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা

বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি—

এ-দৃশ্য সমগ্র ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো কালে কোনো দেশে একজন মানুষও যদি 'নিজ মর্ত্যসীমা' চূর্ণ ক'রে থাকে, দুঃখের সীমান্ত খুঁজতে বেরিয়ে থাকে, তবে সেইখানে আমরা দেখতে পেয়েছি 'নক্ষত্রের ইঙ্গিত' ভুল হয় নি, সেই একটি মানুষ মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে দ্বিপদবিশিষ্ট পশুত্বের গ্রাস থেকে, ব'লে গেছে—এ-জগৎ স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন নয়, কাফ্‌কার উপন্যাস নয়।

১ 'শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময়ে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী— বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়।'

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ২৪৯

২ 'আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূলে ; সেই জীবন এখনও চলছে, কিন্তু মাঝখানে কোনো-এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধ'রে রাখা যায়—এটা বিশ্বাস করা শক্ত।'

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ১৮৬

৩ অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

(নবজাতক—"জয়ধ্বনি")

৪ 'তা ছাড়া যেমন আগেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর (রবীন্দ্রনাথের)

রয়েছে ত্রাণকর্তায় বিশ্বাস, সে বিশ্বাস শেষ দিককার লেখায় অধিক স্পষ্ট।'
—শিশিরকুমার ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য, পৃ ২২২

৫ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২৫

৬ মানুষের ধর্ম, পৃ ১৪

৭ মানুষের ধর্ম, পৃ ১১

৮ মানুষের ধর্ম, পৃ ১১

৯ 'Whatever character our theology may ascribe to him (God), in reality he is the infinite ideal of Man towards whom men move in their collective growth.' *The Religion of Man,* p. 165

১০ মানুষের ধর্ম, পৃ ৯১

১১ মানুষের ধর্ম, পৃ ৭১

১২ মানুষের ধর্ম, পৃ ৭১

১৩ মানুষের ধর্ম, পৃ ২৫

১৪ মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট, পৃ ৮৯

১৫ (ক) 'এই "বিবাগী-রাগিণী"ই রবীন্দ্র-কবিপুরুষের প্রাণের রাগিণী —ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের আদি ও অন্ত্য সুর।' —মোহিতলাল মজুমদার : রবি-প্রদক্ষিণ, পৃ ৫৭

(খ) 'রবীন্দ্র-কবিপুরুষের বাণী বৈরাগ্যের বাণী, তাহার সুর বিবাগী চিত্তের সুর। এই বিবাগী বৈরাগী চিত্তই শেষ পর্যন্ত নিজের আজীবন সাধনাকেও কোনো আসক্তি কোনো মোহবন্ধনে বাঁধিল না, দিল ধরণীর গৈরিক ধূলায় অসীম বৈরাগ্যের দিকবিহীন পথে উড়াইয়া।' —নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, (৫ম সং) পৃ ২৫০

১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২১৫

শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি

সহজাত বৃত্তির তাড়নায় নয়, গরজে প'ড়ে, দায়ে ঠেকে, মানুষকে হতে হ'ল যূথবদ্ধ। কারণ শিকার এবং পরে চাষবাসের কাজে দেখা গেল দলের সুবিধা অনেক। কিন্তু দলে বাস করতে হলে সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল-খুশি মতো থাকা যায় না, কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়, ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্থান দিতে হয় দলের স্বার্থকে। অর্থাৎ এক প্রকার চারিত্র্যনীতি হ'ল যৌথ জীবনের অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু সেটা চারিত্র্যনীতির ভ্রূণাবস্থা, প্রকৃত মর‍্যালিটি তাকে বলা যায় না। যূথ ছিল তখন ব্যক্তিরই সম্প্রসারিত সত্তা। আদিম মানুষ নিজের স্বকীয় ব্যক্তিসত্তা বিষয়ে খুব সচেতন নয়; যূথের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম এবং একদেহ সে, নিজেকে যৌথ দেহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ ভাবাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। যৌথ জীবনযাত্রার তাগিদে যে-চারিত্র্য-নীতি সে পালন করতে বাধ্য তার গোড়ার কথা হ'ল ব্যষ্টির ইচ্ছাকে সমষ্টির ইচ্ছার অর্থাৎ বিধি-নিষেধের অধীন জ্ঞান করা। এই শিক্ষাই প্রত্যেকটি শিশুকে দেওয়া হয় ট্রাইবল্ সমাজে। তবু যদি আশৈশব শিক্ষা বা শেখানো অভ্যাস লঙ্ঘন ক'রে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যৌথ প্রথার বিরুদ্ধাচারণ ক'রে বসে তবে সে যূথের বা যূথপতির দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে দণ্ডিত হয়। এহেন বিধিনিষেধ যে প্রকৃত চারিত্র্যনীতি নয় তা আরো সহজে প্রতিপন্ন হয় যূথ-বহির্ভূত মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে মৎস্যন্যায় ছাড়া আর কোনো ন্যায়-অন্যায়ের কথাই ওঠে না প্রাক্‌সভ্য ট্রাইবল্ সমাজ-ব্যবস্থায়।

সভ্য সমাজে কি খুব একটা ওঠে? আমরা আধুনিক যুগের

মানুষেরা অনেক দিক থেকে নিঃসন্দেহে সমুন্নত ; চাঁদে কস্‌মোনট্‌ পাঠানোর আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে এনেছি, এক কুকুরের মুণ্ড কেটে আর-এক কুকুরের ঘাড়ে জুড়ে দিতে পারি, মরুভূমিতে ফসল ফলাতে পারি, একটি হাইড্রোজন বোমা ফাটিয়ে একটা গোটা শস্যশ্যামল দেশকে মরুভূমি ক'রে দিতে পারি, ইত্যাদি। কিন্তু চারিত্র্যনৈতিক দিক দিয়ে যে বড় বেশি এগিয়েছি এমন ভাববার কারণ নেই। সভ্য সমাজের চারিত্র্যনীতির মুখোশটি সুন্দর কিন্তু মুখোশ খুললে ট্রাইবলিজম্‌-এর বিকট মুখখানি দেখা যায়। ট্রাইবের জায়গা নিয়েছে রেস, নেশন এবং ধর্মসম্প্রদায় —তফাত এইটুকু। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গকে, নর্ডিক ইহুদিকে, বর্ণ-হিন্দু চণ্ডাল এবং মুসলমানকে পুরো মানুষ ব'লে গণ্য করতে সব ক্ষেত্রে প্রস্তুত নয়, অভ্যস্তও নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোনো রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে বিবেকের বা মর‍্যালিটির ধার ধারে না ; একমাত্র আন্তর্জাতিক নীতি কূটনীতি অর্থাৎ ঠকবাজি। জাতিতে জাতিতে পরিচয় কখনো খড়্‌গে খড়্‌গে ভীম পরিচয়, কখনো বা শঠে শাঠ্যম্‌ সমাচরেৎ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রকার চারিত্র্যনীতি আজও গ'ড়ে ওঠে নি। কিন্তু আন্তর্ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা একে অপরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি সুফলের প্রত্যাশায়— তা সে হাতে হাতে হোক বা রয়ে-বসেই হোক ; নিদেনপক্ষে পরকালের বা পরজন্মের হিসাব-নিকাশ তো আছেই। অথবা আমরা সৎ না হলেও শিষ্ট হয়ে যাই ভয়ের চোটে— লোকনিন্দার ভয়ে, পুলিসের ভয়ে, প্রতিহিংসার ভয়ে, নরকের ভয়ে। যদিও ইতিপূর্বে একাধিক মহাপুরুষ ব'লে গেছেন— মানুষকে ভালোবাসো, নিছক ভালোবেসে, কোনো প্রকার লাভ-ক্ষতির কথা মনে না রেখে, মানুষের উপকার করো। গৌতম বুদ্ধ বা যীশু খ্রীস্টের মতো

ধর্মোপদেষ্টারা লক্ষ লক্ষ মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন, মৌখিক আনুগত্য পেয়েছেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁদের নীতি-উপদেশ পালন করে নি লাখে একজনও। সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ পালন করা সম্ভব কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

যে-অর্থে আমরা অত্যন্ত আপন জনকে (বন্ধুকে, প্রিয়াকে, সন্তানকে) ভালোবাসি, সেই অর্থে বা তার খুব কাছাকাছি কোনো অর্থে কি সম্পূর্ণ অচেনা মানুষকে—বুদ্ধি, রুচি ও চরিত্র নির্বিশেষে সবাইকে—ভালোবাসতে পারি? মানুষটা বিদেশী ও বিভাষী হলে ব্যাপারটা আরো অসম্ভব ঠেকে। দু-চারজন মহাপুরুষ হয়তো পারেন, কিন্তু, শুধু তাঁদের নিয়ে তো চারিত্র্য-নীতি তৈরী হয় না। গ্রীক্ ভাষা ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এক বিদেশী অধ্যাপকের মুখে শুনেছি যে নিউ টেস্টামেণ্টের বিধান 'love thy neighbour' যে-গ্রীক্ বাক্যের অনুবাদ তাতে অনুজ্ঞাসূচক শব্দটি ঠিক 'ভালোবাসো'-র প্রতিশব্দ নয়, বরঞ্চ 'সুবিবেচনাপূর্বক বা ন্যায়সম্মত ব্যবহার করো'-র কাছাকাছি তার অর্থ। এটা সংগত কথা, এবং এই অর্থে উক্ত বিধানটা শুধু কতিপয় মহাপুরুষ নয়, সকলের মান্য ও আচরণীয় হতে পারে। স্বভাবে মেজাজে রুচিতে যে-মানুষটি একান্ত অপ্রিয় তার সঙ্গেও আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারি, অন্তত সেইরূপ শিক্ষা দিতে পারি নিজেকে। তাই কাণ্ট্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রকৃত শ্রেয়োনীতি আলোকপ্রাপ্ত স্বার্থান্বেষণ কিংবা সর্বজনীন প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠেয় নয়, তার মূল স্তম্ভ হ'ল প্রত্যেকের বাঁচবার, সুখী হবার, নিজেকে নিজের মতো ক'রে প্রস্ফুটিত করবার অধিকার স্বীকার করা—শুধু মুখে নয়, অন্তরে ও আচরণে। অন্যের সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তোমার মনে যেন এমন ভাব না থাকে যে সে তোমার কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দূর বা

নিকট, স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র। মানুষ মাত্রেই উপেয় (end), কেউ কারো স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র নয়।

মোটকথা, শ্রেয়োনীতি সহজাত বৃত্তির প্রকাশবিশেষ বা জীবনধর্মের প্রকারভেদ নয়, অন্য এক স্তরের ব্যাপার। আমরা স্বভাবতই যে-স্তরে বাস করি সেখানে 'আমি' যেন কেন্দ্রস্থিত, অন্য সবাই আমারই কোনো-না-কোনো সম্ভাব্য হিতার্থে আমার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরছে। প্রয়োজন হলে এবং সামর্থ্য থাকলে আমি তাদের ব্যবহার করতে পারি আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। শ্রেয়োনীতিক মানুষকে এই জৈবনীতির উপরে উঠে এমন এক স্তরে উপনীত হতে হয় যেখানে সে আর কেন্দ্রে নয়, পরিধিতে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কেন্দ্রপরিধির উপমা খাটে না, সেখানে স্বার্থ এবং পরার্থকে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে, সমদৃষ্টিতে দেখতে হয়। এই স্তরে ওঠা মানুষের সাধ্যাতীত নয়, কিন্তু কারো পক্ষে সহজসাধ্যও নয়। যৌথ জীবনযাত্রায় এ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

তেমনি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে আমাদের দৃষ্টি ও উপলব্ধিকে প্রাত্যহিক জীবনের স্তর থেকে আর্টের স্তরে নিয়ে যেতে। পরিবর্তনের মাত্রাটা আরো অধিক, আমাদের উঠতে হয় আরো এক ধাপ উপরে। শ্রেয়োনীতিক মানুষ স্বার্থপ্রণোদিত না হলেও কর্মলিপ্ত। কিন্তু শিল্পী মানুষ কর্মভার থেকে এবং অন্যকে কর্মে উদ্বোধিত করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্তব্য অবশ্য শিল্পী এড়াতে পারেন না; কারণ, শিল্পজীবনের বাইরেও তাঁর একটা জীবন আছে। কিন্তু শিল্পীরূপে তিনি কর্মজীবনের দায়-দায়িত্বের এবং তার মানসিক পটভূমির ঊর্ধ্বে। দরজায় দাঁড়ানো মানুষ, গলির কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে কিংবা নেড়ি কুত্তা সবই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ

করবে; কিন্তু এসবের পিছনে কোনো বৃহত্তর সত্যের ইঙ্গিত, সর্বমানবিক এবং মানবোত্তর কোনো রহস্যের কম্পমান যবনিকা যদি দেখতে না পান তাহলে তো তিনি কবি নন, সাংবাদিক মাত্র।

বিশেষত, দুঃখ ও পাপের চেতনা কর্মী এবং কবির একই প্রকার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কর্মীকে শুধু খোলা চোখে নয়, উত্তল কাঁচের ভিতর দিয়ে একটু বড় ক'রে দেখতে হয় অমঙ্গলের চেহারাটা, দৃষ্টিকে একাগ্র করতে হয় সেই স্থানে যেখানে মানুষ দুঃখ পাচ্ছে— যে-দুঃখের প্রতিকার সম্ভব, যেখানে অন্যায় ঘটছে— যে-অন্যায়ের প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক। কর্মীর অমঙ্গলবোধ মাত্রাতিরিক্ত হলে লাভ বই ক্ষতি নেই। কিন্তু কবির পক্ষে এই অতিরেক শুধু অনাবশ্যক নয়, অযথার্থ, সুতরাং অনর্থকারী। একটি ছোট ছেলের ছোট দুঃখকেও সমগ্র মানবজাতির ভূত-ভবিষ্যতের এমনকি অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই তাঁর দেখাটা সত্য হয়। অথচ সেভাবে দেখতে গেলে কাছেই এবং এই মুহূর্তেই যে-দুঃখ বা পাপ উপস্থিত তা ছোট হয়ে দেখা দেয়, সুতরাং প্রতিরোধশক্তি এবং সংগ্রামস্পৃহা জাগাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু তাতে কি কবিতার খুব ক্ষতি হবে? কবি তো সমাজ-সংস্কারক নন; তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের,— স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ও সংগ্রামলিপ্ত মানুষের— দৃষ্টির, অনুভূতির এবং কল্পনার ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়ে সব-কিছুকে তার যথার্থ, অর্থাৎ খণ্ডের নয় পূর্ণের, পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করতে শেখাবেন, এর চেয়ে বেশি কোনো প্রত্যাশা রাখি না তাঁর কাছ থেকে। তার মানে এক ধরনের সংস্কার অবশ্য চাই আমরা, কিন্তু সে-সংস্কার বাইরের নয়, অন্তরের। কবির কাছে আমরা চাই হৃদয়ের সেই পরিশুদ্ধি যাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ বলেছিলেন রেক্‌টিফিকেশন অফ হিউম্যান ইমোশন্‌স্‌।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই উক্তির মধ্যে উহ্য রয়েছে আর-একটি মূল্যবান কথা : অনুভূতিও ঠিক কিংবা বেঠিক হতে পারে। জানি না ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ নিজে 'রাইট ইমোশন' বলতে সেইসব হৃদয়াবেগই বুঝেছিলেন কিনা যা শ্রেয়োনীতিক জীবন-যাত্রার অধিকতর উপযোগী ক'রে তোলে আমাদের। আমি কিন্তু কথাটাকে একটু ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছি। আমার মতে কবির হৃদয়াবেগ সত্য হওয়া চাই— শুধু এই অর্থে নয় যে হৃদয়াবেগটি বানানো বা কাল্পনিক হবে না (কাল্পনিক হলেও কি কবিতার কিছু এসে যায় ?); সত্য হওয়া চাই মানে যথার্থ (যথা + অর্থ, অর্থের— অব্‌জেক্টের— অনুগামী) হওয়া চাই ; বহির্জগতের যে-অবস্থা বা ঘটনার সঙ্গে সেই হৃদয়াবেগটি যুক্ত, তার সঙ্গে শুধু কার্যকারণিক সংযোগ নয়, নান্দনিক সামঞ্জস্য থাকা চাই। ধরুন কোনো তরুণী মহাভারত বা ম্যাক্‌বেথ পাঠ ক'রে ব'লে উঠলেন— 'কী মিষ্টি ! ঐ তরুণীর মনে সত্যি মিষ্টত্ববোধ জেগে থাকলেও বলব, অনুভূতিটা সত্য নয়, কারণ বিষয়ের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। যে-হৃদয়াবেগ একটি গোলাপ ফুল দেখে বা কোকিলের ডাক শুনে জেগে থাকলে যথোপযুক্ত হ'ত, সেই হৃদয়াবেগ হিমালয় পর্বত বা মহাসমুদ্রের তরঙ্গগর্জনের সামনে অত্যন্ত বেখাপ, অযথার্থ।

বোদলেয়রের কাব্য বিষয়ে ইতিপূর্বে নালিশ জানিয়েছি। সে-নালিশের মূল কথা ছিল যে তাঁর কবিতায় প্রকাশিত অনুভূতির বাদী সুরটি সত্য নয়। বোদলেয়রের অনুভূতি সত্যি ঐ সুরে বাঁধা ছিল কিনা প্রশ্নটা অবান্তর। উপরন্তু, এ-বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই যে বোদলেয়র যেমন অনিবার্য ভঙ্গি ও অনবদ্য ভাষায় তাঁর বাস্তবিক কিংবা কাল্পনিক অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করেছেন, তেমন প্রকাশের উৎকর্ষ খুব কম কবির কবিতায় পাই আমরা। কিন্তু তাঁর অনুভূতির তো একটা বিষয়

ছিল, সে-বিষয়ের সঙ্গে অনুভূতির সামঞ্জস্য (আমাদের আলংকারিকদের ভাষায় 'ঔচিত্য') আমি খুঁজে পাই না। মানবজীবন অথবা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুর্বোধ্য হতে পারে, দুঃখ, নৈরাশ্য বা ত্রাস জন্মাতে পারে, কিন্তু তার সম্বন্ধে তুচ্ছতা বা একঘেয়েমির ('monotone et petit') বোধকে বলব অনুভূতির অযথার্থতা, অসত্যতা। বস্তু বা অবস্থাবিশেষ সংগত-ভাবেই আমাদের বিরক্তিকর, ন্যক্কারজনক বা কদর্য লাগতে পারে; কিন্তু সমগ্র জীবন ও অনন্ত জগৎ তাই নয়। অবশ্য শারীরিক কিংবা মানসিক বৈগুণ্যে কখনো কখনো এক সার্বিক বিতৃষ্ণার ভাব জাগতে পারে যে-কোনো লোকের মনে। বোদলেয়রের প্রতিভা এই বিকারকে স্বাস্থ্য জ্ঞান করতে শিখিয়েছে, এই অসংগত ভাববৈকল্যকে শ্রদ্ধেয় ও সযত্নে পালনীয় ক'রে তুলেছে অত্যাধুনিক কবি ও সমালোচকদের কাছে।

কেউ যদি বলেন— জগৎটা না হয় ভালোই হ'ল, মানুষ মোটের উপর সুখী, এবং মানবজীবন আত্মস্ফুরণের বিচিত্র সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল— কিন্তু তবু যদি আমার কিছুই ভালো না লাগে, জগতের দিকে তাকালেই বমি আসে, তবে আমি আমার সেই স্বকীয় বিবমিষা কবিতায় প্রকাশ করব না কেন? এবং প্রকাশ যদি সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ হয় তাহলে সে কবিতা উঁচুদরের কবিতা ব'লে গণ্য হবে না কেন? প্রশ্নটা একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে এর মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে, হয় পরের নয় নিজের চোখে ধুলো দেওয়া হচ্ছে। যদি আমার জাগতিক অনুভূতি আর জগতের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে এমনতর মৌলিক গরমিল সত্যিই থাকে, তবে আমার সে-অনুভূতি হয় ঘোরতর চিত্তবিকারের লক্ষণ নয় তো নিছক ফাজলামি ব'লে ধার্য হবে। তার প্রকাশে কলানৈপুণ্য থাকলে রচনাটি উপাদেয় হতে পারে, প্রশংসনীয় হতে

পারে, কিন্তু কিছুতেই মহৎ ব'লে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। আধুনিক কবিতার দাবি কি শুধু এই কালোয়াতির জন্য বাহবার দাবি? আমার তা মনে হয় না; কোনো সিরিয়স কবির দাবিই এত অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না।

কীট্‌স্‌ সুন্দরের উপাসক ছিলেন এবং সুন্দরকে সত্যের সঙ্গে এক ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই সমীকরণে আস্থা রাখার জন্যে তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন সত্যের (অর্থাৎ বাস্তব সত্তার) সীমানাকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে ফেলার, তাঁর সৌন্দর্যের ধ্যানমূর্তিকে খণ্ডিত করতে পারে এমন যাবতীয় তথ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা ছিল ভিন্ন ছাঁচে ঢালাই করা; তিনি কিছুই বাদ দিতে চান না, দৃষ্টিকে সংকুচিত নয়, সম্প্রসারিত করতেই উদ্যোগী। কারণ তাঁর বিশ্বাস জগৎকে টুকরো টুকরো ক'রে, এক-একটি টুকরোকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলেই আমরা দেখব কোথাও সুন্দর (ছোট, সীমিত অর্থে—মনোহর বা প্রীতিকর অর্থে—সুন্দর) কোথাও বা অসুন্দর। কিন্তু উপস্থিত দেশকালের ক্ষুদ্র সীমানায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে, কিসে আমাদের স্বার্থ রক্ষিত হয় আর কিসে ব্যাহত এসব গণনা পরিহার ক'রে, যদি খণ্ডকে সমগ্রের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করি, তবে তার যে-রূপটি আমাদের চোখে ধরা দেবে তাকে খুব বড় অর্থে সুন্দর বলতেই হয়।

একটা গাছকে যদি খুব নিকটে দাঁড়িয়ে তন্নতন্ন ক'রে দেখি তবে দেখব তাতে কত ফোকর, তার বাকল কত জায়গায় শুকিয়ে কুঁকড়ে বাঁকাচোরা এলোমেলো রেখায় বিকৃত, কত অংশ তার পচা, পূতিগন্ধময়। কিন্তু একটু দূরে দাঁড়ালে সমগ্র গাছের এবং আরো দূরে স'রে এলে সমগ্র বনভূমির সৌন্দর্য সহজেই উপলব্ধ হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে এহেন নান্দনিক দূরত্ব রক্ষা

করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু মানুষের বেলা নিজেকে দূরে সরিয়ে সমস্ত মনুষ্যজাতির বিরাট নাট্যলীলাকে নিরাসক্ত নান্দনিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করার মতো মন তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন। নাটকের অভিনেতা যেমন অভিনয়কালে তার নিজ ভূমিকার সঠিক রূপায়ণে এতই নিবিষ্টচিত্ত থাকে যে সমস্ত নাটকের রসরূপটি তার চোখে ধরা দেয় না, তেমনি আমরা যখন জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের ইষ্টানিষ্ট, সমাজের হিতাহিত বিচার ও সাধনে অত্যন্ত ব্যাপৃত, তখন মানবজীবন-নাট্যের মহান— ট্র্যাজিক হলেও মহান— রসরূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। উৎসর্গ-এর ৩৭-সংখ্যক কবিতায় ('আলোকে আসিয়া এরা লীলা ক'রে যায়') এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত এক অভিভাষণে আরও বিস্তারিত ক'রে বলেছেন : 'মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে তার সমস্ত ছোটকে আমরা বড় ক'রে দেখি···আমরা মানবসংসারের ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড় ক'রে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি, দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য, হানাহানি, কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারিদিকে চলছে···সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই সমস্তকেই আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না।'[১]

এই সামঞ্জস্য, এই সৌন্দর্য, সাহিত্যনীতিক দৃষ্টিতেই প্রতিভাত, শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টিতে নয়। যদি কর্মীর চোখেও সব-কিছু সুসম্বদ্ধ ও সুসংগত এবং সুমহান কোনো পূর্ণ সত্তার অঙ্গ রূপে প্রতিপন্ন হ'ত তবে কর্তব্যের কোনো মানে থাকত না, কর্তব্য-পালনের কোনো প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যেত না। শ্রেয়োনীতির বিচারে

সামঞ্জস্য সিদ্ধ নয়, সাধ্য ; আমাদেরই হিতৈষণা ও হিতকর্মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শিল্পীর দূরে-সরিয়ে-নেওয়া চোখ এবং দূরে-মেলে-দেওয়া দৃষ্টি দিয়ে আমরা কেবল প্রাকৃতিক নয়, মানবিক জগৎকেও দেখতে পারি। তেমন ক'রে দেখলেই সত্যকে সুন্দর ব'লে জানা সম্ভব।

এই কথাটা গভীর দুঃখের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একটি স্মরণীয় কিন্তু বিস্মৃতপ্রায় কবিতায়। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর যখন সমস্ত জীবন তাঁর চোখে একেবারে অন্ধকার দেখাচ্ছিল, কোথাও লেশমাত্র সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি নিজের দুঃখকে পৃথিবীর দুঃখের প্রতীক ঠাউরে নিজেরই কবি-সত্তাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন— আমরা সাধারণ মানুষেরা তো চারিদিককার দুর্দৈবের চাপে জরজর, কিন্তু তুমি তো আমাদের মতো উপস্থিত দেশকালের ছোট গণ্ডির ভিতরে বন্দী নও, তুমি তো সকল মেঘের ঊর্ধ্বে উঠে দেখতে পাও অনাগত ঊষার প্রথম আলো। সেই বার্তা আমাদের শোনাও, সেই চোখ আমাদের ফুটিয়ে তোলো।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে—
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া—
'নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি' কহো আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান আমরা খাঁচার পাখি।

(উৎসর্গ—৩১)

সকলের এবং সর্বক্ষণ না হলেও বহুলোকের জীবনের একটা বড় অংশ দুঃখের মধ্যেই অতিবাহিত হয় এটা অস্বীকার করবার জো নেই। রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন না। কিন্তু আধুনিকেরা এই তথ্যটাকে স্বীকার করেন প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে; রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি অনেকটা প্রশান্ত। অমঙ্গলের প্রতি কর্মীর ক্রোধ ও ধিক্কার স্বাভাবিক; শুধু স্বাভাবিক নয়, আবশ্যক। কিন্তু কবি কেন এত ক্রোধ ও ধিক্কার পোষণ করবেন—তাও জগতের যতটুকু অংশে অমঙ্গলের অধিষ্ঠান শুধু তার প্রতি নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি? এই বিশ্বজাগতিক ধিক্কারের ভাবটা যদি প্রবল হয়ে ওঠে তবে কবির মধ্যে কর্মী-মানুষটা কি বেঁচে থাকবে? আর বোদলেয়রের মতো শক্তিমান কবিরা যদি তাঁদের সার্বিক বিবমিষাকে সমাজময় ছড়িয়ে দিতে থাকেন তা হলে কি তাঁরা সমস্ত সমাজের কর্মশক্তিকে, শুধু কর্মশক্তি কেন, জীবনীশক্তিকেও পঙ্গু ক'রে দেবেন না? ন্যক্কার রসের কবিদের একবার ভেবে দেখা উচিত—যা তাঁরা সৃষ্টি করছেন এবং যা ধ্বংস করছেন, দুটো কি তুল্যমূল্য।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন : 'একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব এ খবরটা দেবার মতো বটে কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্ট্ এলো, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখল— মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য তা হলে সন্দেহ করব তারও মেজাজে পোকা পড়েছে।'[২]

এ নিয়ে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে— ভালো লাগা যেমন সত্য, খারাপ লাগাও তেমনি সত্য, মুক্তোর মতো দন্তপঙ্‌ক্তির সৌন্দর্য নিয়ে যদি কবিতা লেখা যায় তবে পোকা-পড়া দাঁতের কুশ্রীতাও কবিতার বিষয় হবে না কেন ? কখনোই হবে না তা নয়, কবি নিরাসক্ত চোখে দুটোকেই দেখবেন এবং দুটোর কথাই তাঁর কাব্যে ঘোষণা করবেন, এতে কারো আপত্তি হতে পারে না। আপত্তি ওঠে যখন দেখি যে এ-যুগের কবি— অধিকাংশ কবি— চারিদিকে কেবল পোকা-পড়া দাঁতই দেখতে পাচ্ছেন, কারো সুন্দর হাসি আর তাঁদের চোখে পড়ছে না। আধুনিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা অভিযোগ এই ছিল যে, আধুনিকেরা নৈর্ব্যক্তিকতার দাবি করেন অথচ তাঁদের দৃষ্টি মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, কুৎসিতের প্রতি রীতিমতো আসক্ত তাঁরা, এবং 'বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।'

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রোম্যান্টিক কবিদের যেমন সুন্দরের প্রতি পক্ষপাত ছিল, কাউন্টর-রোম্যান্টিকদের তেমনি কদর্যের প্রতি পক্ষপাত জন্মেছে; সেই সঙ্গে এটাও তর্কাতীত যে জগতে যেমন সব-কিছু সুন্দর নয়, তেমনি সব-কিছু কদর্যও নয়।

তবে কাব্য-রচনার বেলা বেছে বেছে কেবল সুন্দরকে অথবা কেবল কদর্যকে ধ্যানদৃষ্টির সামনে রাখার মূলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত রয়েছে। সেটাই বিচার্য।

যে-বিষয়টিকে নিয়েকোনো গীতিকবিতা গ'ড়ে ওঠে সে-বিষয়টি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, তার একটি সাংকেতিক বা প্রতীকী ভূমিকা থাকে কবিতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানাচ্ছেন যে কবি যখন কোনো সুন্দর বস্তুকে নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তার সৌন্দর্যে 'আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি ; মধুর গান সমস্ত জলস্থল আকাশকে, অস্তিত্বমাত্রকেই মর্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্য-বীর তাঁহারা অস্তিত্বমাত্রের গৌরব ঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন।'[৩] পক্ষান্তরে, যাঁদের মনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কদর্যতার প্রত্যয় বদ্ধমূল, যাঁরা অস্তিত্বমাত্রের অগৌরবই ঘোষণা করবার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে 'নর্দমার ক্লেদাক্ত ফেনা', 'স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর', 'বজ্রনখ পেচক' ইত্যাদিই প্রতীক হিসাবে অনেক বেশি গ্রাহ্য হবে, ভালোমন্দে-মেশা বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বেছে নেবেন কুৎসিত এবং ক্লেদাক্তকেই। খোলা চোখে অপক্ষ-পাত নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক মন নিয়ে মানুষের জীবনধারার দিকে তাকিয়ে আধুনিকেরা দেখলেন যে, দুঃখ ও পাপের সংখ্যা তিন-চল্লিশ নয়, সাতান্ন নয়, একেবারে নিরানব্বই (তুল্য : 'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য / মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন')— এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। রোম্যান্টিকদের বিপরীত সত্য বিশ্বের মহান রহস্যময়তাও তাঁদের খণ্ড অভিজ্ঞতায় শুভ ও সুন্দরের প্রাচুর্য থেকে লব্ধ নয়। সারাজীবনের পরিব্যাপ্ত অভিজ্ঞতায় আমরা ভালোমন্দ দুই-ই পাই, তাদের আনুপাতিক সংখ্যা বা মাত্রা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

সুন্দর-কুৎসিত, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু নিয়ে সমগ্র বিশ্বজগৎটা আমাদের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যময় সাব্‌লাইম দৃশ্য রচনা করবে কিংবা তুচ্ছ, কদর্য, ন্যক্কারজনক ও বীভৎস দৃশ্য— এটা একেবারে গোড়ার কথা, মৌলিক প্রত্যয়ের, হার্দ্যোপলব্ধির বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা ; এরই উপর রচিত হয় আমাদের সমগ্র জীবনবোধ ও জগৎদর্শন, আধুনিকরা যদি ভাবেন যে তাঁরা রোম্যান্টিকদের রঙিন চশমা খুলে ফেলেছেন তবে তাঁরা ভুল ভাবছেন। দুই রঙের চশমার মধ্যে তাঁরা ধূসরটাকে পছন্দ ক'রে চোখে লাগিয়েছেন— এই পর্যন্ত। তর্কের দ্বারা বোঝানো যাবে না যে তাঁদের ধূসর দৃষ্টি মিথ্যা, কিন্তু মূল্যবোধের নিরিখে সে-দৃষ্টির অসারতা, নান্দনিক ও শ্রেয়োনীতিক অনৌচিত্য, ধরা পড়ে। ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টি আমাদের সমস্ত জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেয়, এবং আমার মতে সাহিত্যকেও। আগ্রহ ও উদ্দীপনার দৃষ্টি জীবনে সার্থকতার অবকাশ সৃষ্টি করে, এবং সাহিত্যে মহত্ত্বের। কোনো সাহিত্য মহৎ কিনা তা কেবলমাত্র সাহিত্যিক বিচারে নিষ্পত্তি করা যায় না, যদিও সে-রচনা সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা তার বিচার সাহিত্যের ঘরোয়া ব্যাপার— এলিয়টের এই উক্তিটির সারবত্তা বর্তমান প্রসঙ্গে বিচার্য। ঘৃণার সাহিত্যে উৎকর্ষের প্রমাণ পেয়েছি আমরা ; মহত্ত্বের স্বাক্ষর কি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ?

দুঃখের কারণ যতদিন থাকবে দুঃখও থাকবে ততদিন। কতকগুলো কারণ চিরদিন থাকবে না অবশ্য। দারিদ্র্য, জীবিকার অনিশ্চয়তা, ব্যাধি, প্রবলের অত্যাচার, প্রতাপশালীর খামখেয়াল —দুঃখের এই কারণগুলি অনতিদূর ভবিষ্যতে বিদূরিত হবে ভরসা করা যায়। অন্তত হওয়াটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে নয় ; আমাদেরই একক ও সম্মিলিত চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। জগৎ ও

জীবনের প্রতি যে-মনোপ্রতিন্যাস থেকে এই চেষ্টার উদ্ভব, সেই প্রতিন্যাসকে বাঁচিয়ে রাখার গভীর প্রয়োজন আশা করি কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু দুঃখের সব কারণ অপনেয় নয়। প্রকৃতির উপর আমাদের আধিপত্য বাড়বে, কিন্তু মানুষ কোনোদিন সৌরজগতের অধিপতি হবে না। যাকে আমরা বলি অ্যাক্সিডেন্ট তার সংখ্যা কমবে বটে, কিন্তু দুর্দৈবের হাত থেকে বিজ্ঞান আমাদের একেবারে মুক্ত ক'রে দেবে এ-আশা বাতুলতা। ব্যাধি না থাকলেও জরা তো থাকবে; যৌবনের পর থেকে আমরা দিনে দিনে ক্ষয় হবই; এবং মৃত্যু তো জীবনেরই একটি পর্যায়ের নাম। তার চেয়েও দারুণতর ব্যাপার প্রিয়জনের মৃত্যু। এসব অপ্রতিরোধ্য দুঃখকে জীবন-সঙ্গী ব'লে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তাদের সঙ্গে সহজ মনে ঘর-সংসার করতে শিখতে হবে আমাদের। মানুষের এই অসহায় দশা, যাকে জোসেফ নীড্‌হ্যাম বলেছেন তার 'ক্রীচারলিনেস', কোনো সমাজ-বিপ্লবের বা পাঁচ কি পঞ্চাশ সালা পরিকল্পনার দ্বারা প্রতিকার্য নয়। কিন্তু তা নিয়ে গদ্যে পদ্যে নাটকে চিত্রে কান্নাকাটি করা, ভগবানকে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গাল পাড়া অশোভন। শোভন প্রতিক্রিয়া হবে চির-হতাশ প্রেমিক য়েট্সের প্রতিক্রিয়া—

I could recover if I shrieked
My heart's agony
To passing bird, but I am
Dumb from human dignity.

মানুষের মর্যাদাবোধ এবং আত্মসম্ভ্রম সাহিত্য থেকে হারিয়ে গেলে জীবন থেকেও হারিয়ে যাবে। তখন আমরা কী নিয়ে বাঁচব, নর্মান মেলারের নায়কের মতন কি সবাই হিপ্স্টর হয়ে যাব?

শাস্ত্রমানা ধার্মিকদের মধ্যে অনেকের ধ্রুব বিশ্বাস যে ঈশ্বর যখন একাধারে পরম মঙ্গলময় এবং অনন্ত শক্তিমান তখন তাঁর সৃষ্ট জগৎ সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকেই পরিপূর্ণ ও পরোৎকৃষ্ট, দোষ-ত্রুটির লেশমাত্র তাকে স্পর্শ করে নি। কোথাও কোনো দোষ যদি আমাদের চোখে পড়ে তবে সেটা আমাদের চোখেরই দোষ; যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন তাঁরা সর্বত্রই কেবল মঙ্গল আর আনন্দই দেখতে পান। রবীন্দ্রনাথের মনও এক সময়ে এই ধর্ম-মতেই সায় দিত :

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

তরুণ বয়সের ব্রাহ্মসংগীতে এমনতরো ভাব একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এটি রবীন্দ্র-মানসের স্থায়ীভাব নয়, পরিণত বয়সের মেজাজের সঙ্গে এর মিল নেই। জাগতিক অমঙ্গল ও অপূর্ণতার চেতনা তাঁর শেষপর্বের কাব্যে খুবই প্রকট, কিন্তু গীতাঞ্জলি পর্বেও সে-চেতনার উপস্থিতি লক্ষণীয়, বিশেষত ঐ সময়কার গদ্য রচনায়। 'দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টি যে অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাই বা কেন ? এটা একেবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে-কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য-কারণে আবদ্ধ হইবে না এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না। অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া।'[৪] পূর্ণের প্রকাশ যে একদিন হবেই সে-বিষয়ে রবীন্দ্র-নাথের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না গীতাঞ্জলি পর্বের গদ্যে ও পদ্যে। পরে সন্দেহের ঘনায়মান ছায়া দেখা যায়। বলাকায় সে-ছায়া অত্যন্ত ক্ষীণ এবং প্রায় অলক্ষ্য, কিন্তু নবজাতক-এ এতই ঘনকৃষ্ণ যে ধ্রুবের আলো খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না।

দেখতে হলে চোখকে অভ্যস্ত করতে হয় ঐ কাব্যের নাক্ষত্রিক তিমিরে।

আকারহীন বাষ্পপুঞ্জ থেকে ইতস্তত ছড়ানো নীহারিকা, নীহারিকা থেকে নক্ষত্ররাশি, কয়েকটি নক্ষত্রে গ্রহচন্দ্র, কয়েকটি গ্রহে (হয়তো বা একটিতেই) প্রাথমিক জীবাণু, সেই অণুবীক্ষণীয় জীবাণু থেকে বহু কোটি বৎসরের বহুমুখী এবং মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট বা অবরুদ্ধ বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণাম মানুষ। মানুষের জন্মকাল ধার্য করা হয় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। কিন্তু আজো সে আপনার জান্তব পূর্বপুরুষের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন ক'রে উঠতে পারে নি। হয়তো মানুষ হতে আরো দশ লক্ষ বৎসর লাগবে তার— অর্থাৎ অনাবিল বুদ্ধিচালিত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ হতে। ইতিমধ্যে দুঃখের ও পাপের প্রাচুর্য না দেখলেই আশ্চর্য হবার কথা। বরঞ্চ এই অপ্রতিহত-প্রায় জড়ের ও জড়বুদ্ধির আধিরাজ্যে অকস্মাৎ বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শোয়াইৎসর বা গান্ধীর মতো মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে আমাদের বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ের আনন্দে গান গেয়ে উঠি :

> কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
> জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
> সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
> পাগল ওগো, ধরায় আস।
> এই অকূল সংসারে,
> দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।

বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আরও প্রগাঢ় হয় যখন দেখি যে শুধু কয়েকজন মহাপুরুষ নয়, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষও বার বার প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ঠেকিয়েছে পশুশক্তির স্পর্ধিত পুনরভ্যুদয়কে। হিটলারী দানবিকতার ভাবী কথক কাফ্‌কা বীভৎস রসের

সাহিত্য রচনা করলেন ; প'ড়ে আমরা তারিফ করেছি, ভেবেছি এমনি ক'রে লিখতে হয় যুগোপযোগী উপন্যাস। অথচ এই দানবিক শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলো ইংলণ্ড, মার্কিন ও রুশ দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, প্রাণের মূল্যে তাকে পরাজিত করল। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে এত বড় অভিশাপ পৃথিবীর বুকের উপর থেকে উঠে যাবে মাত্র পাঁচ বছরের সংগ্রামে? অথচ এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অমিত বীর্যের কাছে শক্তিমদমত্ত ফ্যাশিজ্‌মের সমূহ বিপর্যয় তো তেমন কোনো সাড়া জাগাল না আধুনিক সাহিত্যে। কেন এই পক্ষপাত? জীবনে যখন শুভ ও সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে তখন কেন আজকের সাহিত্যিকেরা নীরব থাকেন? একালের বীণার তার কি কেবল অশুভের আঘাতেই ঝংকার তুলবে?

দুঃখ ও পাপের চিত্র তাঁর কাব্যে যথোপযুক্তরূপে পরিস্ফুট নয়—এ-কথা স্বীকার ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমি যে 'রসতীর্থ-পথের পথিক', 'আমি রোম্যান্টিক', জগতের সমস্ত কালিমার যথাযথ চিত্রণ তো আমার কাজ নয়। তবে তোমরা যদি ভাবো বাস্তব জগতের নিরতিশয় পীড়িত এবং বীভৎস চেহারাটা আমার চেনা নয়, তা হলে ভুল করছ; কিন্তু সে-পরিচয়ের যথার্থ প্রকাশের ক্ষেত্র কাব্য নয়, কর্ম।[৫]

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেখাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।

দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;

(নবজাতক—"রোম্যাণ্টিক")

দুঃখ ও পাপের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত হয়েও জীবনের ঐ কঠোর তথ্যগুলিকে তাঁর কাব্যে খুব বড় ক'রে দেখান নি কেন— উপরের পঙ্‌ক্তিগুলি তারই কৈফিয়ত।

দুঃখ ও পাপের অতি বাস্তব সত্তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তাতে সাড়া না দিয়েও পারি না। সে-সাড়া নান্দনিকও হবে, শ্রেয়োনীতিকও হবে। কিন্তু আগেই বলেছি যে, দুই প্রকার সাড়াতে অমঙ্গল-চেতনার প্রকৃতি হবে ভিন্ন। যথোপযুক্ত শ্রেয়োনীতিক প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন দুঃখ ও পাপের কালো দাগগুলিকে বড় ক'রে দেখা। নান্দনিক দৃষ্টি কিন্তু পড়বে দিগন্তব্যাপী সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের উপর ; তার মাঝ-খানকার কয়েকটি বিশেষ ছাপকে বাড়িয়ে দেখলে জগৎচিত্রে বর্ণসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমস্ত চিত্রটা বিকৃত হয়ে যায়। আধুনিক সাহিত্যবীররা শ্রেয়োনীতিক ক্রোধ আর ঘৃণা এবং তজ্জনিত অতিরঞ্জিত বর্ণপ্রলেপনকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের ঠিক এই বিকৃতিই ঘটাচ্ছেন। তাতে শুধু সাহিত্যই বিকৃত হচ্ছে না, সাহিত্যিক এবং পাঠক উভয়েরই কর্মজীবনও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। শ্রেয়োনীতির মেজাজকে সাহিত্যনীতিতে টেনে আনলে মর‍্যালিটি এবং আর্ট উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

যা সংগতভাবে আমাদের ক্রোধ বা ঘৃণা জাগাতে পারে এমন অনেক কিছু ঘটে এই অপূর্ণ (ইম্পারফেক্ট্) জগৎ-সংসারে ; ঘটবারই কথা। ঈশ্বর কেন এমনটা ঘটতে দিলেন ব'লে অভিমান

ক'রে, রাগ ক'রে, সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে গাল পাড়তে থাকাটা ছেলেমানুষি; ইচ্ছাকৃত ছেলেমানুষি তাঁদের বেলা যাঁরা ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাস করেন না অথচ গতায়ু ঈশ্বরকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে হাজির করেন তাঁদের কাব্যে— উষ্মা প্রকাশ আর দুর্বাক্য প্রয়োগের লক্ষ্য রূপে। অলংকার হিসাবে ঈশ্বরের স্থান হতে পারে কাব্যে; তাতে দোষ নেই। কিন্তু আলংকারিক (অর্থাৎ কাল্পনিক) ঈশ্বরের উপর তো আর সত্যিকার রাগ হয় না। তবে সত্যিকার রাগ কার উপর,— জড়প্রকৃতির উপর, ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ইকুয়েশন কিংবা কেমিক্যাল ফর্মুলার উপর? তাও তো সম্ভব নয়। তবে কি মানুষের উপরই? সেটা সম্ভব বটে। কিন্তু মনুষ্যকৃত অন্যায় অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু রাগের বা ঘৃণার কবিতা লেখা অসংগত। সেখানে কবিকে হতে হবে কর্মী, অন্তত তাঁর পাঠকের কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে সাহিত্য হবে ফলিত সাহিত্য, মার্ক্সিস্ট সাহিত্য। অতিশয় মূল্যবান জিনিস, তবে তা বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্য-রচয়িতা কর্মের দায় থেকে মুক্ত। কিন্তু আর-একটি অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব বর্তায় তাঁর উপর— সত্যের দায়িত্ব, নান্দনিক যাথার্থ্যের দায়িত্ব।

একজন তরুণ কবি সম্প্রতি লিখেছেন:

একদা স্বপ্নের সঙ্গে ছিল লুকোচুরি
অহরহ কবিতার চোর-চোর বুড়ি-বুড়ি খেলা।
এখন শব্দের সঙ্গে খেলা
এখন শব্দই স্বপ্ন,
চৌমাথার ভিড় থেকে ফুসলিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে
একটি শব্দকে ধরে কোনোভাবে ঘরে নিয়ে আসা।*

নিছক স্বপ্নের সঙ্গে খেলা চুকে-বুকে গেছে, ভালোই হয়েছে।

কিন্তু কাব্যের পূর্ণ ভাণ্ডার থেকে স্বপ্ন বাদ দিলে কি হাতে থাকে শুধু শব্দ, আর কিছুই না? ভয়ে ভয়ে তরুণ কবিদের বলি, একটু ভালো ক'রে হাতড়ে দেখুন, আরো কিছু পাবেন। এত বড় ভাণ্ডার, কত কাল ধ'রে কত দেশ জুড়ে নন্দিত তার গৌরব; তাতে কি স্বপ্নের ফাঁকি আর শব্দের কারচুপি ছাড়া আর কিছুই ছিল না? ছিল। দেশ-কালের সীমায় ধরে না এমন মহীয়ান, বিজ্ঞানের সন্ধানী আলো পৌঁছয় না এমন গুহাহিত সত্য ছিল, তার ভয়ংকর-মধুর রূপের আভাস ছিল, সত্যদৃষ্টি লাভ করার জন্য আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ছিল, হর্ষবিহ্বল ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের উদ্বেলতা ছিল। কোথায় গেল সে-সব? শুধু চোর-চোর বুড়ি-বুড়ি খেলা ক'রে এত বড় দায়িত্ব তাঁরা এড়িয়ে যাবেন—এটা তো ভালো ঠেকছে না। মুজতবা আলীর মুখে শুনেছি কলকাতার কোনো এক ছাত্রদল শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে। মুজতবারা গেলেন অধ্যাপক তুক্‌চির কাছে ম্যাচ দেখার ছুটি চাইতে। তুক্‌চি বললেন, তোমরা বড় হয়েছ, কলেজে পড়ছ, খেলা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? বালঃ ক্রীড়তি। আধুনিক কবিদের কাছে আমারও সেই একই নিবেদন—শব্দের খেলা নিয়ে এত মাতামাতি করবেন না; বালঃ ক্রীড়তি। হালফ্যাশনের কবিতা লিখতে বা পড়তে অনেক বিদ্যাবুদ্ধি লাগে, তদুপরি অনেক পরিশ্রম। তাই খেলাটা যে উঁচুদরের এবং বিদগ্ধজনোচিত সেকথা কবুল করতেই হবে। তবু খেলা। পক্ষান্তরে, আমি কাব্যরসাস্বাদনকে জীবনের মহত্তম উপলব্ধির অন্যতম জ্ঞান করি। এরূপ জ্ঞান করাটা হয়তো সেকেলে। হোক তা। একেলে হবার জন্য সর্বস্বান্ত হতে 'আমার মন নয় রাজী'। কবিতা থেকে কী পেলাম আর কী পাই নি তার হিসাব আমার মতো অকবি কাব্যরসিককে মেলাতেই হয়।

সত্যমিথ্যার ধার ধারে না কবিতা একথা যদি আধুনিকেরা বলতে চান তবে বলুন, মানতে না পারলেও শুনতে প্রস্তুত আছি। ক্রিকেট কিংবা শব্দের খেলা স্থায়ী আনন্দ না দিলেও সাময়িক আমোদ তো দিতেই পারে। কিন্তু যখন দেখি তাঁরা সত্যের ধার ধারেন না ব'লেই ছোটেন মিথ্যার কাছে বড় অঙ্কের ঋণে নিজেকে আদ্যোপান্ত জড়াতে, তখন প্রতিবাদ না ক'রে পারি না। সমস্ত জগৎকে এবং মানুষমাত্রকে শুভ ও সুন্দর ব'লে জানাটা যদি হয় স্বপ্নবিলাস, তবে সমস্ত জগৎকে এবং মানুষমাত্রকে ঘৃণ্য ও বীভৎস ব'লে জানানোটা দুঃস্বপ্নবিলাস। পাখির গান, চাঁদের আলো, সুন্দরীর হাসি নিয়ে কাব্যে বাড়াবাড়ি করা যদি ন্যাকামি ব'লে নিন্দিত হয়, তবে মানুষের দুঃখ ও পাপ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কঠোরতর ভাষায় ধিক্কৃত হওয়া উচিত, কারণ সে-বাড়াবাড়ির ফল হবে দারুণতর। দারুণতর হবে বিশেষত এই জন্য যে অধুনাতম সাহিত্যিক অমঙ্গলবিলাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দেখি মধ্যযুগের আদি-পাপ সংক্রান্ত উন্মূলিতপ্রায় ডগ্‌মার বা তার বিকৃততর সংস্করণের পুনরুজ্জীবন। মানুষের স্বভাবে এমন এক চিরজন্মগত দোষ অবশ্যতই বিদ্যমান যাতে ক'রে কোনো কালেই সে মানুষ হয়ে উঠবে না, আত্মরতিতে, পরশ্রীকাতরতায়, কপটতায়, হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে থাকবে দূরতম ভবিষ্যতেও, এক পাপ ছাড়লে অন্য ঘৃণ্যতর পাপে লিপ্ত হবে—নবযুগের এই কুসংস্কারকে সুশিক্ষিত মানুষের মনে বদ্ধমূল ক'রে তার কর্মপ্রেরণাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট ক'রে দেওয়াটা আধুনিক সাহিত্যের এক দুরপনেয় কীর্তি।

খ্রীষ্টানরা তবু গ্রেস্‌-এ বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ বিশ্বাস করতেন—ঈশ্বরের অপার করুণা একদিন দেখা দেবেই, এবং তখন সব-কিছু শুদ্ধ নির্মল নিষ্পাপ হয়ে যাবে। কিন্তু নিরীশ্বর-

বাদের সঙ্গে আদি-পাপের ডগ্‌মা যুক্ত হলে যোগফলটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাটার ও মোমেণ্টাম্‌ যেমন রূপ বদলায় কিন্তু পরিমাণে একটুও কমে-বাড়ে না, দুঃখ ও পাপও যদি তেমনি শুধু নব নব রূপ পরিগ্রহ ক'রে চলে কিন্তু অনন্ত কালের মধ্যে তার মাত্রা বিন্দুমাত্রও না কমে, এবং পদার্থবিজ্ঞানের পূর্বোক্ত মূলনীতির মতো এই চারিত্র্য-বৈজ্ঞানিক আপ্তবাক্যটিকেও যদি আমরা অকাট্য সত্য ব'লে মানি, তবে কিসের জন্য প্রাণপাত করব, কোনো হিতকর্ম করতে গিয়ে কেনই বা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ধনপ্রাণ বিপন্ন করব? এই অতি ঘৃণ্য ভূতলে শ্রেয় যদি শুধু দুঃসাধ্য নয়, একেবারে অসাধ্য হয়, তা হলে ঋণং কৃত্বা হুইস্কিং পিবেৎ কিংবা সনাতন দড়ি কলসীর সন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না ভূতল-বাসীদের। এমনতর চূড়ান্ত নীতিবাক্য আধুনিক সাহিত্যিকেরা প্রচার করতে চান বা না চান, এটাই কি বোদলেয়ার-পরবর্তী এবং তদনুপ্রাণিত সাহিত্যের ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায় না? বলা বাহুল্য, আমি সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের কথা বলছি না এখানে, তার একটি মূল ধারার— বিতৃষ্ণা এবং বিবমিষার ধারার— কথাই আলোচনা করছি।

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— শান্তিনিকেতন, ২, পৃ ২৩১, ২৩৩, ২৩৫

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্যের পথে, পৃ ১৪৮

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাহিত্য, পৃ ৭৯

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ধর্ম, পৃ ৯৮

৫ কবিপুরুষ ও কর্মীপুরুষের দ্বৈধ এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিস্বরূপের

ক্রমপরিণতিতে কবিসত্তা যেমন বিকশিত কর্মীসত্তা তেমন প্রস্ফুটিত নয় এই বেদনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বারে বারে অভিব্যক্ত হয়েছে। তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পত্রপুট-এর বারো সংখ্যক কবিতা।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ;
যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলে নি তার।
দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলীতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।

... ...

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

৬ তারাপদ রায়—"স্বপ্নের কবিতা", দেশ, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৭

কবিতার ভাষা

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ তার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন— যা মনের সঙ্গে বিশ্বের 'সাহিত্য' অর্থাৎ মিলন ঘটায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, আর মিলনের সেতু নয়, বিচ্ছেদের প্রাচীর হয়ে উঠেছে ইদানীং। কবিতার বাহন অবশ্য ভাষা, কিন্তু ভাষার দ্বারা যোগ এবং বিয়োগ দুইই সাধ্য। ভাষা যদি হয় কাচের মতো দৃষ্টিভেদ্য, তবেই ওপারের আলো নিয়ে আসতে পারে মনের কক্ষে, মনকে প্রসারিত করতে পারে বিশ্বের প্রাঙ্গণে। 'বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্ব-কালের সর্বজনের অধিকারভুক্ত করতে।' এই ইচ্ছার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিকর্মকে যুক্ত করেছিলেন। আধুনিক কাব্যস্রষ্টা ও কাব্যতাত্ত্বিকদের চোখে কবিকর্মের লক্ষ্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় আশী বছর আগে মালার্মে দেগাসকে যে-উপদেশ দিয়ে-ছিলেন— "one makes poetry with words, not with ideas" (শব্দ দিয়ে কাব্য রচনা করতে হয়, ভাব দিয়ে নয়)— তারই মধ্যে এই লক্ষ্যান্তরের পথনির্দেশ ছিল বোধ করি। শব্দকেই কবিতার মূল তন্মাত্র এবং ভাবকে ভেজাল মনে করার ফল হ'ল এই যে, কাব্যসৃষ্টিতে শব্দযোজনা কেবল ধ্বনির দিক লক্ষ্য রেখে হতে লাগল, কবিতার ভাষারও যে-একটা বোধগম্য, অন্তত হৃদয়গ্রাহ্য, অর্থ থাকা আবশ্যক এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে কবিদের বিদ্রোহ ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠল।

আলংকারিকদের ভাষায় কাব্যের অর্থ দুই প্রকার— বাচ্যার্থ

ও ব্যঙ্গ্যার্থ। বাচ্যার্থ সাদাসিদেভাবে অর্থ বলতে যা বোঝায় তাই। ব্যঙ্গ্যার্থ বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা স্পষ্ট ক'রে বলা খুব সহজ নয়, তবে এই ব্যঙ্গ্যার্থেই কাব্যের প্রাণ। সেকেলে অর্থাৎ মালার্মে-পূর্ববর্তী কাব্যে বাচ্যার্থ তো থাকতই, তদুপরি থাকত ব্যঙ্গ্যার্থ; গদ্যের চেয়ে অর্থসম্বল বেশি বই কম ছিল না কবিতার। আজ শুনছি অর্থের বোঝা পারাপার করতে আছে গদ্যরূপী গাধাবোট; কবিতার ময়ূরপঙ্খী নায়ে যে-শৌখিন ভাষা ভেসে বেড়ায় তার সঙ্গে অর্থের মালপত্র থাকলে নৌকাসুদ্ধ ভরাডুবি হবার আশঙ্কা। এলিয়ট বলেছিলেন, কাব্যের বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ ছেঁটে ফেললে ক্ষতি নেই কারণ তার কাজ সামান্যই, পাঠকের প্রহরীচিত্তের সামনে ফেলে-দেওয়া এক টুকরো মাংসের চেয়ে বেশি নয়। ঐ প্রহরীটিকে একটা-কিছু দিয়ে ভুলিয়ে তবেই কবিতা ঢুকতে পারে অন্তঃপুরে।

এটা প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। বছর কুড়ি আগে আধুনিক সাহিত্যের আর-একজন কর্ণধার, জ্যঁ পোল সার্ত্র[১] ঘোষণা করলেন যে কাব্যের পক্ষে অর্থমাত্রই অনর্থকারী। গদ্যের ভাষা স্বচ্ছ কাচের মতো, নিজেকে দৃষ্টিগোচর না ক'রে আমাদের দৃষ্টিকে এগিয়ে দেয় ওপারের বস্তুগুলির দিকে। কবিতার ভাষা কিন্তু নিজেকেই চোখের সামনে তুলে ধরে, দৃষ্টিকে আটকে রাখে ঐ কারুকার্য-খচিত কাচের মধ্যে, কাচেতর কিছু দেখতে দেওয়া তার পক্ষে আত্মাবমাননার সামিল। আমরা কখনো কখনো ফুলকেও তো ভাষার মতো ব্যবহার করি, গোলাপকে প্রেমের সংকেত বানিয়ে তুলি, পদ্মকে পূজার, ইত্যাদি। কিন্তু তখন ফুলের গন্ধ বর্ণ কোমলতা মসৃণতাকে আর গ্রাহ্য করি না, আমাদের লক্ষ্য ফুলের বাস্তবিকতাকে স্বচ্ছন্দে ভেদ ক'রে (অর্থাৎ তাকে সংকেতরূপে গণ্য— বা নগণ্য— ক'রে) চ'লে যায়

সংকেতিত বস্তুর দিকে। সেটা কিন্তু ফুলের পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি, ফুলের দ্রষ্টার দিক থেকে তার প্রতি অবিচার। তেমনি কবিতার ভাষাকে যদি অর্থবাহী ক'রে ফেলি, অন্য কোনো বিষয় বা বস্তুর সংকেতরূপে ব্যবহার করি, তবে তারও মর্যাদাহানি হয়, পাঠকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তার একান্ত স্বকীয়, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ সত্তা। কাব্যপদসমূহের ধ্বনিময়তা ও চিত্রলতাই সার্ত্র্-এর মতে তার সবটুকু, তার প্রথম ও শেষ সার্থকতা। গদ্যলেখকদের মতো কবি ভাষাকে কোনো কাজে লাগান না; তিনি শব্দগুচ্ছ পাঠকের চোখের সামনে বা কানের কাছে একটি মহামূল্য উপহারস্বরূপ তুলে ধরেন।[২] কবিতা কান দিয়ে শোনবার জিনিস, শোনো, চোখ দিয়ে, কল্পনার চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস, দেখো; বুঝতে চেষ্টা কোরো না। এলিয়ট যাঁকে বলেছেন বর্তমান কালের কাব্যসাহিত্যের অবিসংবাদিত প্রতীক, সেই ভালেরী স্বয়ং বিশ্বাস করতেন যে কবিতায় অর্থ কেন, শব্দও তেমন গুরুতর নয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের বারণ করেছেন শব্দ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে— 'যখন কবিতা লিখতে বসেছ তখন তোমার সামনে শব্দ নেই, আছে সিলেব্‌ল্ আর ছন্দের বৈচিত্র্য!' এর পরে পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন না যে, ফরাসী দেশে এমন কবিও রয়েছেন যাঁরা বাক্য বা শব্দের ধার ধারেন না, কেবলমাত্র স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের অপূর্ব সমাবেশে বাক্যরচনা ক'রে খ্যাতিমান হয়েছেন।[৩]

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পাশ্চাত্ত্যে, বিশেষত ইঙ্গ-মার্কিন দেশের বিদ্বৎসমাজে একটি দার্শনিক চিন্তাধারা বা স্কুল হঠাৎ আবির্ভূত হ'ল এবং অল্পকালের মধ্যেই বেশ আসর জেঁকে বসল। স্কুলটি লজিকাল পজিটিভিজ্‌ম্ নামে পরিচিত। এঁদের কয়েকটি প্রধান প্রতিপাদ্যের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে চমকপ্রদ

এবং সোচ্চার ছিল এই যে, এ-যাবৎকাল দর্শনশাস্ত্রের সেই শ্রদ্ধেয় বিভাগটা যাকে মেটাফিজিক্স্ বলা হয়, আপন মূল বক্তব্য-গুলি যে-ভাষায় ব্যক্ত করে তার আদৌ কোনো অর্থ হয় না। অবশ্য এই রায় দেওয়ার সময়ে 'অর্থ' বলতে কী বোঝায়—ভাষান্তরে অর্থের অর্থ কী—তা নিয়ে অনেক চুলচেরা বিচার ও বাদানুবাদ করতে হয়েছিল তাঁদের। মোটকথা, যখন তাঁরা ঘোষণা করলেন যে পরাবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি অর্থহীন, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এ-ফরমানটাও জারি করলেন যে অতঃপর ভূয়োদর্শনশাস্ত্র একদম ভুয়ো এবং বাতিল ব'লে গণ্য হবে, ঐ জঞ্জালটাকে শেল্ফ্ থেকে নামিয়ে ওয়েস্ট্‌পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া দরকার। কিন্তু সার্ত্র্ এবং তাঁর সহধুরীরা যখন ঘোষণা করলেন যে কবিতার ভাষার কোনো মানে নেই, তখন তাঁরা একথা মোটেই বললেন না যে, অতএব কবিতা ডাস্ট্‌বিনে ফেলে দেওয়ার মতো রদ্দি মাল। বরঞ্চ বললেন—অর্থভারমুক্ত কাব্য হ'ল শুদ্ধতম শিল্প-সামগ্রী, সুতরাং বড় সমাদরের বস্তু। সংগীতের ধ্বনিবিস্তারের তো কোনো অর্থ নেই, অথচ তার মূল্য অর্থযুক্ত শব্দবিন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি।

তরুণ বয়সে ভালেরী* এবং তাঁর কবিবন্ধুরা ছিলেন ভীষণ সংগীতপ্রিয়। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটাতেন কনসার্ট শুনে, ফিরে আসতেন উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও ঈর্ষ্যান্বিত অভিমান বুকে নিয়ে।

* ভালেরীর মতটি একটু তলিয়ে দেখা দরকার। তিনি শুধু বিংশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় ফরাসী কবি ব'লে স্বীকৃতই নন, বর্তমান কালের কবি ও সমালোচকদের উপর তাঁর প্রভাব অপরিমেয়। তা ছাড়া কাব্যের তত্ত্ব ও আঙ্গিক বিষয়ক তাঁর ফরাসী প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হওয়াতে আলোচনার সুবিধে হয়ে গেছে। (**Paul Valéry**—***The Art of Poetry***, **Routledge & Kegan Paul, 1958**)

শিল্পকলার যে-তুষারশুভ্র শিখরে সংগীত বিরাজমান, সেখানে কি তাঁরা কখনো তাঁদের একান্ত প্রিয় শিল্পকর্ম কবিতাকে নিয়ে যেতে পারবেন ? তাঁদের কাব্যসাধনায় একটি সংকল্প দানা বেঁধে উঠল : কবিতাকেও সংগীতের মতো অত্যন্ত শুদ্ধ নির্মল ক'রে তুলতে হবে। যা-কিছু কবিতা নয় অথচ কবিতার মধ্যে নানা দিক থেকে ঢুকে প'ড়ে বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি ও রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তার কলুষ-স্পর্শ থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে হবে। সুতরাং কাঁকর বাছার মতন ক'রে কবিতার থালা থেকে বেছে বেছে ফেলে দেওয়া হ'ল তত্ত্বকথা, ধর্মকথা, নীতিকথা, সমাজচেতনা, বাস্তবের বর্ণনা, ইত্যাদি। সংগীত তো এ-সমস্ত বাদ দিয়েও, বা দিয়েই, শিল্পসৃষ্টির চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছতে পেরেছে; কবিতাই বা পারবে না কেন ? ভালেরী বলেছেন প্রতীকী আন্দোলনের গোড়ার কথা এই। সিম্বলিস্ট কবিগোষ্ঠীর শব্দচয়নের খেয়ালি-পনা, ব্যাকরণের স্বৈরাচার, ছন্দের অনিয়ম, ভাষার অনধিগম্যতা —এ-সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ঐ সংগীতের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায়।

এহেন উচ্চাভিলাষী অসমসাহসিক সংকল্প নিয়ে তো তাঁরা নামলেন কাজে; কিন্তু মুশকিল বাধল গোড়াতেই। প্রথম পদক্ষেপটা ছিল নেতিবাচক, তাতে অবশ্য কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় নি। ভাষার গৌরব তার অর্থব্যঞ্জনায়, সেদিকটা নির্মমভাবে ছেঁটেছুঁটে ভাষাকে প্রায় সা রে গা মা-র মতো রিক্ত ক'রে ফেলা গেল সহজেই। কিন্তু তারপর রইল কী ? সংগীতে আছে সাতটি সুর, একাধিক স্বরগ্রাম, ধ্বনির তারতম্য এবং গুণগত বিস্তার, মীড়, মূর্ছনা, গমক, তাল-মান-লয়ের বিচিত্র খেলা, আর পাশ্চাত্ত্য সংগীতের পলিফনি, সিম্ফনি, কাউণ্টার-পয়েণ্ট— সবসুদ্ধ এলাহি ব্যাপার। শুধু ছন্দ আর মিল আর অনুপ্রাসের তহবিল নিয়ে

সংগীতের বিপুল ধ্বনিভাণ্ডারের সঙ্গে কবিতা টেক্কা দেবে কোন্ ভরসায়?

অবশ্য কবিতার মাধ্যম কথা। সেই কথার বারো আনা ভাগ— যেটাকে আমরা বলতে পারি তার গদ্যভাগ— ছাঁটাই ক'রে ফেললেও কিছু অর্থ তো তার অবশিষ্ট থাকে, তার বিশুদ্ধ কাব্যিক অর্থ। কবিতার ধ্বনির দিকটা যদিও সংগীতের তুলনায় দীনদরিদ্র এবং অর্থের দিকটা গদ্যের তুলনায় সাদামাটা, তবু দুটোতে মিলে সে মোটেই নিঃসম্বল নয়, কারও কাছে মাথা হেঁট করবার দরকার নেই তার।

কিন্তু দুটোকে কি সহজে মেলানো যায়? শব্দসমূহের অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে কোনো স্বভাবজ, সার্বজনীন সম্বন্ধ না থাকার দরুন কবিকে বড় অসুবিধায় পড়তে হয়। ভালেরী উদাহরণ-স্বরূপ পেশ করেছেন ইংরেজি হর্স, গ্রীক হিপ্পস, লাতিন একুয়স, ফরাসী শেভাল্— আমরা আরো যোগ করতে পারি বাংলা ঘোড়া, সংস্কৃত অশ্ব, পার্সী অস্প্— এ-সবের তো অর্থ একই, অথচ ধ্বনি কত বিচিত্র! সংগীতকারকে এই দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েন বিধ্বস্ত করে না, অর্থের ঝামেলা পোহাতে হয় না তাঁকে। অন্য কিছুর দিকে মন না দিয়ে কেবল ধ্বনির একটি অত্যাশ্চর্য রূপকল্প তৈরি করেন তিনি। সেই বিশেষ ধ্বনিরূপটি তাঁর তৎসাময়িক সৃজনী-প্রেরণার রূপায়ণে চরিতার্থ হলেই তাঁর শিল্পকর্ম সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু কবি যদি ধ্বনির কথা ভেবে কতকগুলো শব্দ চয়ন করেন, তবে অর্থের দিক দিয়েও সেই শব্দপরম্পরা কি তাঁর রূপকারী অভীষ্টসিদ্ধির সবচেয়ে সহায়ক হবে? অথবা উলটো ক'রে দেখলে,— যে-শব্দবিন্যাস অর্থপ্রকাশের দিক দিয়ে তাঁর উপলব্ধির অনুগামী হ'ল, ঠিক সেই শব্দগুলির ধ্বনিসংগঠনও কি তাঁর রূপকল্পনার অনুকূল হবে? কাজেই কাব্যরচনা মানে একই

সঙ্গে কুল আর শ্যাম রাখার দুঃসাধ্য অঙ্গীকার। শেষপর্যন্ত কুলের মায়া ত্যাগ করতে হয়েছিল রাধিকাকে, শ্যামের বাঁশি তাকে এমনি উতলা করেছিল। তেমনি শব্দের স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির মোহিনী মায়ার টানে আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই শব্দার্থের দিকে পিঠ ফেরাতে উদ্যত হয়েছেন।

ভালেরীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁকে বোঝালো যে কবি সিদ্ধকাম হবেন তখনই যখন তিনি অর্থ ও ধ্বনিকে মেলাতে পারবেন, একেবারে হরিহরাত্মা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন দুটোর মধ্যে। কিন্তু এটা তো একরকম অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রায় যে-কোনো শব্দের বেলাতেই দেখা যায় তার অর্থ ও ধ্বনি একত্রিত হয়েছে নিতান্ত বাহ্য কারণে, পরস্পরের স্বাভাবিক টানে নয়। যাদের স্বভাবে মিল নেই, কবি তাদের মেলাবেন কেমন ক'রে? এ-সমস্যার সমাধান করেছেন ভালেরী একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকথা ব'লে। কবিতার সার্থকতা নির্ভর করবে ভাষা ব্যবহারের রীতি, নীতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর উপর। সাধারণ ভাষার, অর্থাৎ গদ্যভাষার, নিয়মই এই যে যখন আমি তাতে কিছু প্রকাশ করি তখন আমার বক্তব্যটি শ্রোতা বা পাঠক বুঝে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে-ভাষা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার অর্থ রয়ে গেল শ্রোতা বা পাঠকের মনে, উদ্দিষ্ট কর্ম বা ভাবনার পথে তাদের চালিত করল; কিন্তু সেই অর্থের বাহন ছিল যে-ধ্বনিপুঞ্জ তা এখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং তা পাঠকের মন থেকে একেবারে অন্তর্হিত। যেন বক্তার তীর থেকে নদীর ওপারে শ্রোতার তীরে একটি রেলগাড়িকে পার ক'রে দেওয়ার দরকার পড়েছিল ব'লে আলাদিনের জিন মুহূর্তের মধ্যে ঠিক মাপের একটা সাঁকো তৈরি ক'রে ফেলল; তারপর রেলগাড়িটি যেই ওপারে নির্বিঘ্নে

পৌঁছে গেল, অমনি সাঁকোটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভালেরী এই উপমা প্রয়োগ করেন নি, কিন্তু অনায়াসে করতে পারতেন।

পক্ষান্তরে, কবিতার ভাষা পাঠককে যা বলতে চায় তা ব'লে ফেলার শেষে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। যে-পরিমাণে তা অর্থব্যঞ্জনার মাধ্যম সে-পরিমাণে তার স্বকীয় সত্তা নেই। কিন্তু অর্থ বোঝানোর পরও সে যেন আর-এক বার নতুন জন্ম লাভ করে শ্রোতা বা পাঠকের চৈতন্যে, অর্থ থেকে আবার শ্রোতার মনোযোগ ফিরে আসে ভাষার ধ্বনিরূপের দিকে। গদ্যভাষার বক্তব্য বিষয়টাই সব-কিছু, বলার ভঙ্গিটা কিছুই না। কবিতার ভাষার বিষয় এবং ভঙ্গি, অর্থ এবং ধ্বনি, উভয়ই সমমর্যাদাসম্পন্ন; সমান মূল্যের দাবি রাখে তারা। ফলে পাঠকের মন পেণ্ডুলামের দোলকের মতো একবার ফর্ম থেকে কণ্টেণ্টের দিকে দুলে যায়, আবার সেখান থেকে ফর্মের দিকে ফিরে আসে। কাব্যপাঠের রসানুভব যতক্ষণ স্থায়ী হয়, এ-দোলা থামে না ততক্ষণ।

এমনি এক দোদুল্যমান অভিজ্ঞতার কথা তুলেছিলেন রোজার ফ্রাই চিত্রকলা প্রসঙ্গে। প্রকৃত সমঝদার যখন তন্ময় হয়ে কোনো রূপদক্ষ চিত্রকরের আঁকা ছবি দেখেন তখন সে-ছবির বর্ণসংস্থানের সুষমা আর রেখার সৌষ্ঠব এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি জাগায় তাঁর মনে, রোজার ফ্রাই এবং ক্লাইভ বেল যার নাম দিয়েছেন নান্দনিক অনুভূতি (aesthetic emotion)। এই অনুভূতিটি বিশেষরূপে শিল্পজগতেরই অনুভূতি ; প্রাকৃত বস্তু (কোনো ল্যাণ্ডস্কেপ বা একটি ফল, ফুল কিংবা মনুষ্যদেহ) থেকেও পাওয়া যেতে পারে সে-অনুভূতি, যদি আমরা ঐ বস্তুকে শিল্পীর শুদ্ধ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু অধিকাংশ চিত্র—রেনেসাঁস থেকে সেজান পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় য়ুরোপীয় চিত্র—জীবনের প্রতিবিম্বও বটে। মনে করুন ছবিটি একটি শোকার্ত

মাতার কিংবা কুষ্ঠ রোগীর সেবারত কোনো সাধুপুরুষের। ছবির এই প্রতিবিম্বিত বিষয়টি আমাদের মনে আর-এক ধরনের অনুভূতি জাগাবে। সে-অনুভূতিকে উক্ত চিত্র সমালোচকদ্বয় লৌকিক অনুভূতি (life emotion) ব'লে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বাস্তব জীবনে কোনো শোকার্ত মাতাকে দেখলে আমরা যা অনুভব করি তার সঙ্গে এই চিত্র-দর্শন-সঞ্জাত অনুভূতির পার্থক্য আছে— যে-পার্থক্য বোঝাবার জন্য এদেশের আলংকারিকেরা দুটি ভিন্ন শব্দ, 'ভাব' ও 'রস', ব্যবহার করেছিলেন এবং বলে-ছিলেন যে, ভাবকে রসে রূপান্তরিত করাই শিল্পীর কাজ। তবু এই অনুভূতিটি জীবন-সংক্রান্তই এবং বাস্তব জীবনের অনুভূতির খুব কাছাকাছি। পক্ষান্তরে, আমরা যদি চিত্রের বিষয় থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে একাগ্র হয়ে নিজেকে নিবিষ্ট করি তার রঙ ও রেখার সূক্ষ্ম কারুকর্মে, তা হলে যে-শুদ্ধ— বলতে গেলে পারলৌকিক— অনুভূতি লাভ করব তার জাতই আলাদা।

এ দুই অনুভূতি যে ভিন্ন জাতের শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সহযোগিতা নেই, বরঞ্চ তারা অনেক ক্ষেত্রেই অসমঞ্জস। ফ্রাই কয়েকটি বিখ্যাত য়ুরোপীয় চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন কোথায় এবং ঠিক কীভাবে এই অসামঞ্জস্য ঘটেছে। অন্য অসংগতি যদি না-ও থাকে, তবু দুই ভিন্ন জাতের অনুভূতিকে আমরা কেমন ক'রে একই সময়ে যথাযথ-ভাবে মনে স্থান দিতে পারি? একদিকে গভীর মনোযোগ ঘটলে অন্য দিক থেকে মন আপনিই আলগা হয়ে যাবে না কি? ফ্রাই বলছেন, চিত্র যদি একাধারে জীবনের প্রতিবিম্বরূপে কৃতকার্য হয় এবং রঙ ও রেখার সুদক্ষ বিন্যাসের অর্থাৎ ফর্মের দিক থেকেও চরিতার্থ, তা হলে এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমরা এড়াতে পারি না।

এই মানসিক দ্বন্দ্ব বা দোদুল্যমানতা যেহেতু শিল্পানুভূতির

অখণ্ড একাগ্রতা নষ্ট করে, তাই ফ্রাই এবং বেল চেয়েছিলেন চিত্রকলা থেকে অনুকারিতার বা প্রতিবিম্বকারিতার নির্বাসন, চিত্রকে করতে চেয়েছিলেন বিশুদ্ধ ও বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ। বোঝাই যাচ্ছে যে এঁদের পক্ষপাত ছিল নির্বস্তুক চিত্রকলার, অ্যাব্‌-স্ট্রাক্‌ট পেন্টিং-এর, দিকে। সংগীতভক্ত ভালেরীও ছিলেন বক্তব্য-রহিত বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষপাতী। পরে তাঁর শিষ্য সার্ত্র এই মতটাকেই সৎসাহসপূর্বক দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

স্বীকার করছি বিশুদ্ধ ধ্বনির শক্তিও কম নয়, তা দিয়েও মহৎ শিল্পরচনা সম্ভব। কিন্তু সে-শিল্প কবিতা নয়, সংগীত। সংগীতেই ধ্বনি আপন পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। প্রতিতুলনায়, ধ্বনির প্রকাশ-শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র ব্যবহৃত হয় কবিতায়। বিশেষজ্ঞ মহলে শোনা যায়, ধ্বনির অত্যাশ্চর্য রূপায়ণে সবচেয়ে সার্থক কবি মালার্মে আর ভালেরী। মালার্মের একটি বিখ্যাত কবিতা 'ফনের দিবাস্বপ্ন' অবলম্বন ক'রে প্রেলিউড্‌ রচনা করেছেন দেবুসী। একান্ত ধ্বনিরই বিচারে কি দেবুসীর সংগীতের সঙ্গে মালার্মের কবিতার কোনো তুলনা সম্ভব? ছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অভিনবত্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সুচতুর বিন্যাস ইত্যাদি, অর্থ-ব্যঞ্জনায় যতই সহায়তা করুক (সেদিক থেকে এসবের মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য), কবিতার ধ্বনিরূপকে স্বতন্ত্র ক'রে, স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ওটাকেই বড় ক'রে দেখানোর যে-পরিশ্রমী দক্ষতা পাওয়া যায় অতি আধুনিক সমালোচনায়, তার একমাত্র ফল কবিতাকেই ছোট করা। সমালোচকরা যখন ভাবেন এ-যুগের কাব্যসমালোচনার প্রধান কাজ হচ্ছে খুঁটে খুঁটে দেখানো, তাঁদের আলোচ্য কবিতার কোন্‌ পঙ্‌ক্তিতে তিনটে 'শ' ধ্বনি পাওয়া যায় আর কোন্‌টাতে দুটো বা চারটে 'ক' ধ্বনি, কোথায়

ক'টা হ্রস্ব স্বরের পর একটি দীর্ঘ স্বর পড়ছে আর কোথায় তার বিপরীত (বাংলা ভাষায় আবার হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের ভেদ প্রায় লুপ্ত, অতি কষ্টে বাঙালী কবিরা তার অল্পস্বল্প সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন), তখন তাঁরা একটি মহৎ শিল্পরচনাকে প্রশংসনীয় কারুকার্যে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই করছেন না।

এ তো গেল কবিতার ধ্বনির দিক, তার সাংগীতিক মূল্যের দিক। কবিতার চিত্রের দিকটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সক্ষম। কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা মনুষ্যদেহের এমন সার্থক বর্ণনা কবির ভাষায় সম্ভব যা শিল্পীর আঁকা চিত্রের তুলনায় নগণ্য নয়। কিন্তু ঠিক তুলনীয়ও কখনো হয় না। আমরা বলি ছবির মতো উজ্জ্বল ইমেজরি; কিন্তু ইমেজরির মতো উজ্জ্বল কিংবা প্রাণবন্ত ছবি বলার কি কোনো মানে হয়? তুলির আঁকা ছবির পাশে কলমে আঁকা ছবি রাখলেই দেখা যাবে (পরীক্ষাটা অবশ্য কল্পনা-নির্ভর) দ্বিতীয় ছবিটি কত ফিকে এবং দুর্বলরেখ। আঁকার তারতম্য তো আছেই, তদুপরি দেখার প্রভেদও অপরিমেয়। প্রথমটি আমরা চোখে দেখি, দ্বিতীয়টি দেখি মনশ্চক্ষে। মনশ্চক্ষে আমরা ক'টি রঙ দেখতে পারি? অনেকে সাদা, কালো ও ধূসর ছাড়া আর কোনো বর্ণই কল্পনা করতে পারেন না। এবং কতক্ষণ ধ'রে একটি রেখাকে স্থির রাখতে পারি মানসপটে? সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র।

দ্বিতীয়ত, এবং স্বভাবতই, কাব্যের চিত্র উপেয় নয়, ভাব-প্রকাশের উপায় মাত্র; তার সার্থকতা বাহন বা মাধ্যম রূপেই। চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি তাঁর উপলব্ধিকে মূর্ত ও সুস্পষ্ট ক'রে তোলেন, মানব-জীবনের বা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো অন্তর্গূঢ় স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্য'—ঘটান। ক্যান্‌ভাসে আঁকা প্রতিবিম্বকারী চিত্রও তাই করে অবশ্য। তবে

সে-চিত্রের আর একটা দিক থাকে, তার বিশুদ্ধ ফর্মের দিক, বর্ণ-সংস্থান ও রেখাসন্নিপাতের দিক। আগেই বলেছি যে ফ্রাই প্রভৃতির মতে এই দিকটাই চিত্রকলার আসল দিক, তার অনাবিল নান্দনিক দিক। কিন্তু কবিতায় যে-চিত্রকল্প পাই তার মধ্যে এই বিশুদ্ধ চিত্রলতা, রঙ ও রেখার কাজ প্রায় অনুপস্থিত। কোনো সাম্প্রতিক কবির উদ্ভাবিত চিত্রকল্প যতই অভিনব চমক-প্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হোক, তার আঙ্গিকগত নৈপুণ্য বিষয়ে কোনো পারদর্শী আলোচনা আধুনিকতম কাব্যকলাবিদ সমালোচক-মণ্ডলীর লেখায় পড়েছি ব'লে তো মনে করতে পারছি না।

তাই আমি এ-কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না যে দুটি মহৎ শিল্পসৃষ্টির—সংগীত আর চিত্রকলার—ঈর্ষ্যান্বিত অক্ষম অনুকরণ বা অত্যল্প ভাগমাত্র পরিগ্রহণ ক'রে তৃতীয় এক শিল্পকর্ম কবিতা কেমন ক'রে উত্তমর্ণদের ছাড়িয়ে যাবে বা তাদের সমকক্ষ হবে। অথচ ঠিক এই কথাই কি আজ বলছেন না সেই সমালোচকেরা যাঁরা কবিতার ধ্বনিগত এবং চিত্রগত উপাদানের মূল্যকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যকে বিভ্রান্ত করছেন? কবিতার মাধ্যম ভাষা—আমার মতে সংগীতের মাধ্যম ধ্বনি এবং চিত্রের মাধ্যম রঙ ও রেখার তুলনায় অনেক বেশি শক্তি-শালী। কিন্তু এই বিপুল শক্তির বারো আনাই নির্ভর করে তার সাংকেতিক বৃত্তি অর্থাৎ অর্থব্যঞ্জনা-বৃত্তির উপর, সাত্র্ যাকে বলেছেন ভাষার বস্তুধর্ম, তার উপর নয়। বুঝতে পারি না এ কোন্ জাতীয় মর্ষকাম যার আওতায় প'ড়ে আধুনিক কবি তাঁর প্রকৃষ্ট মাধ্যমের সিকি ভাগ মাত্র ব্যবহার ক'রে সংগীতকার ও চিত্রকরের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। কবে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন স্বমহিমায়?

কবিতায় কবির যে-সামগ্রিক উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে (পুনরুক্তি

নিষ্প্রয়োজন যে এ-উপলব্ধি স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রুতিমধুরতার বা চিত্রকল্পের বর্ণসুষমার উপলব্ধি নয়, এ-উপলব্ধি মানবজীবন ও বিশ্বজগতেরই কোনো গহ্বরেষ্ঠ গুহাহিত সত্যের) সেই উপলব্ধিকে সম্যক প্রকাশ করতে কবিতার ছন্দ মিল অনুপ্রাস এবং চিত্রকল্প যতখানি সহায়তা করে ততখানিই তারা মূল্যবান, তার চেয়ে একতিল পরিমাণ বেশি নয়। প্রকাশিত উপলব্ধির মূল্যেই কবিতার মূল্য। বলা বাহুল্য প্রকাশই যদি না হ'ল, অর্থাৎ শিল্পরূপে যদি প্রকাশ না হ'ল, তবে সে-উপলব্ধির মূল্যের কথা ওঠে না। তুচ্ছতম উপলব্ধির প্রকাশও একটি কবিতা। কিন্তু সে-কবিতা মহৎ কি তুচ্ছ তা নির্ভর করে উপলব্ধির মহত্ত্ব বা তুচ্ছতার উপর।

এখানে অবশ্য প্রতিমান-দ্বৈতের, ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ডের, কথা তোলা যেতে পারে। উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে যেমন তারতম্য থাকা সম্ভব, প্রকাশেরও উৎকর্ষভেদ ঘটতে পাবে। উপলব্ধি যত গভীর ও বৈচিত্র্যগ্রাহী হবে এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ যত পূর্ণ হবে, কবিতা ততই উঁচু দরের হবে। কোনো কোনো সমালোচক মূল্যায়নের এই দুটি স্বতন্ত্র মানদণ্ড অনুযায়ী কাব্যালোচনায় গ্রেট এবং এক্সেলেন্ট এই দুই ভিন্ন বিশেষণ প্রয়োগ করেন : উপলব্ধি গভীর হলে কবিতা হবে মহৎ, এবং প্রকাশ যথাযথ হলে কবিতা হবে উৎকৃষ্ট। গদ্যের চেয়ে কবিতা কিছু বেশি প্রকাশ করে ব'লে কিছু বাহুল্য উপকরণের প্রয়োজন আছে তার, কিন্তু ঐ কাব্যোপকরণগুলিই কবিতা নয়, কাব্যিক মূল্যের আধারও নয়।

আমাদের দেশের একজন আলংকারিকও ভালেরীর মতো কাব্যরসের মধ্যে এমনি এক পেণ্ডুলামের দোলা দেখতে পেয়েছিলেন। কুন্তক বলেছিলেন : কবিতা হচ্ছে সেই শিল্পকর্ম যাতে

বাক্য ও অর্থ পরস্পরস্পর্ধী, তারা পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারে না। যেন খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়, এ বলে আমায় দেখো, ও বলে আমায় দেখো। কিন্তু রসগ্রাহী চিত্ত কি এ দাঁও-কষাকষির দৃশ্যে সেই শান্তরস খুঁজে পাবে, যা সব রসের মূল রস? কবিতায় বাক্যকে, অর্থাৎ তার ধ্বনিরূপকে হার মানতে হয় বাক্যার্থের কাছে, সংগীতে অর্থকে ধ্বনির কাছে; নইলে কোনো রসেরই যথার্থ আস্বাদন হয় না। দুই সমান পাল্লার মল্লবীরের পরস্পর-স্পর্ধা আখড়ায়ই উপভোগ্য, রসের ক্ষেত্রে নয়। সেখানে চাই বিনয় এবং সর্বোপরি সমন্বয়।

রসের ক্ষেত্রে সমানে সমানে মোকাবিলা—ভালেরীর ভাষায় 'an equality of value and power'—কি কোথাও নেই? আমার মতে সংগীতে যেমন একটি মূল্য সর্বেসর্বা, তেমনি কবিতায় অন্য মূল্যটি স্বরাট। তবে অর্থ ও ধ্বনির সাযুজ্য ঘটেছে হয়তো সেই ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় কবিতা আর সংগীতের দ্বৈরাজ্য—গানের ক্ষেত্রে। সেখানেও কিন্তু নির্বিশেষিতভাবে সমাধিকারের কথা বলা সংগত নয়। কালোয়াতী গানের বেলা সুরের আধিপত্য অবিসংবাদিত, কথা সেখানে নিতান্তই গৌণ, তাঁবেদারি আর তল্পাবরদারি করা ছাড়া তার উপায় নেই। প্রথমত, অধিকাংশ কালোয়াতী গান কবিতা হিসেবে অশ্রদ্ধেয়, গান শোনার সময়ে সে-গানের কাব্যিক মূল্য সম্বন্ধে যদি আমরা সচেতন হয়ে উঠি, তা হলে রসের ব্যাঘাত ঘটে। ফৈয়াজ খাঁর জৌনপুরী অতি চমৎকার গান, কিন্তু তার কথাগুলির দিকে—ফুলবনকি গেঁদন মৈকা না মারো রে—মনোনিবেশ না থাকাই ভালো। সমস্ত গানটা এবং অধিকাংশ মার্গ সংগীতের গান—কেবল সরগমে গাওয়া হলেও বিশেষ ক্ষতি হ'ত ব'লে তো মনে হয় না।

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্র-সংগীতে আমরা দেখি কথাই রাজাধিরাজ।

প্রথম বয়সের ধ্রুপদাঙ্গ এবং গোটা কতক টপ্পা শ্রেণীর গান বাদ দিলে কথার মহিমার কাছে সুরের গৌরব সর্বত্রই নতিস্বীকার করেছে। বোধ হয়, এমন হাজারখানেক গান দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা যায় যার কথা বাদ দিয়ে গুনগুন ক'রে শুধু সুর ভাঁজলে (বা ওস্তাদী গানের কায়দায় সরগমে সারলে— পঙ্কজ মল্লিক যেমন ক'রে মাঝে মাঝে রেডিয়োতে গেয়ে দেখান), তাদের সমগ্র মূল্যের যৎসামান্যই পাব আমরা; অথচ সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতা হিসেবে পাঠ করলেও ঐ গানগুলির কাব্যিক উৎকর্ষে অভিভূত হতে হয়। বুদ্ধদেব বসু বলেন, গীতাঞ্জলি পর্বের গান তিনি পড়তেই ভালোবাসেন, কেউ এস্রাজ ও তবলা সহযোগে গেয়ে শোনালে তাঁর মনে হয়, গোলাপ ফুলের উপর রঙ লাগানো হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত নই। 'আরো আঘাত সইবে আমার', 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে', 'এসো শরতের অমল মহিমা', 'কোথা যে উধাও হ'ল মোর প্রাণ উদাসী'— কবিতা হিসেবে অতীব সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন আর দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে শোনার পর ঐ গানগুলির মূল্য আমার কাছে বহুগুণীকৃত হ'ল, অন্তরের আরো গভীরে প্রবেশ করল। তবু বলব, রবীন্দ্রনাথের অত্যধিক সংখ্যক গানে আমাদের রসোপলব্ধি প্রধানত কথার উপর নির্ভরশীল; সুর মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু তার ভূমিকা সহকারীরূপে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নয়।

গান শোনার অভিজ্ঞতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা পরস্পর-স্পর্ধা যে আমি নিজে কখনো লক্ষ্য করি নি, তা নয়। মীরার ভজন শুভলক্ষ্মী যে-ভাবে গেয়েছেন, তাতে কথা আর সুরের মধ্যে কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। ছুটোই আমাকে সমান মুগ্ধ করে। মহাজন-পদাবলি সুগায়কের কণ্ঠে শুনেও ছুটি রসের ভারসাম্য

অনুভব করেছি আমি। আমার এক বন্ধু, যিনি একাধারে কাব্য-রসিক এবং সুরের সমঝদার, রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি গানের উল্লেখ করলেন (বিশেষত, 'বাজে করুণ সুরে হায় দূরে', আর 'নীলাঞ্জন ছায়া'), যাতে তাঁর মন বারে বারে কথা থেকে সুরে চ'লে যায়, আবার ফিরে আসে কথায়, তুটোর কোনোটাই একাধিপত্য বিস্তার করতে পারে না তাঁর রসাস্বাদনে।

এগুলিকে আমি বলব যুগ্ম শিল্পসৃষ্টি ; তুটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম ও শিল্পমূল্য একত্রিত হয়েছে তাতে, কিন্তু এক হয়ে যায় নি। পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটিকে অন্যটির বশ্যতা এবং খানিকটা আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ফ্রাই-এর মতে প্রতিবিম্বকারী চিত্রও এমনিতর যুগ্ম শিল্প, তাতে সাহিত্য ও চিত্রকলা আপন স্বাতন্ত্র্য না হারিয়ে সহবাস করছে মাত্র। এ-সব যুগ্ম শিল্প-সৃষ্টির রসাস্বাদনে আমাদের মন সত্যিই একটা থেকে অন্যটাতে দোলা খেতে থাকে, কোনো-একটাতে স্থিতিলাভ করতে পারে না। কোনো কোনো বিখ্যাত চিত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য তুটো শিল্প-কর্ম পরস্পরের সহায়ক হয়ে আমাদের সমগ্র রসানুভূতিকে ঘনীভূত করে। কিন্তু সেটা প্রত্যাশিত নয়, দৈবাৎ ঘ'টে যায়। রোজার ফ্রাই-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমিও সাধারণভাবে শিল্পে শুদ্ধতার পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে লেখা "সংগীত ও কবিতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সংগীত ও কবিতা উভয়কেই ভাবপ্রকাশের উপায় বলে-ছিলেন। এ-কথা সত্যি যে, সুরের দ্বারা মেজাজ বা মুড (যথা করুণ, বিষণ্ণ, উৎফুল্ল, উদ্দীপ্ত, ইত্যাদি) উদ্রেক করা যায়। কোনো গানের সুর যদি বিশেষ একটি মেজাজ তৈরী করে এবং গানের কথা সেই মেজাজেরই বিশেষীকৃত, স্পষ্টীকৃত ও বিস্তৃত কোনো ভাব প্রকাশ করে, তবে কথা আর সুর হয় হরিহরাত্মা,

ছুটোর বৃত্তি (function) খানিকটা স্বতন্ত্র হয়েও অনেকটা পরস্পর-সম্পূরক ও -পরিবর্ধক হবে। সুর ভাবকে গভীরতা, প্রগাঢ়তা ও তীব্রতা দান করবে ; কথা ভাবকে আমাদের মননে ও সংবেদনে কতকটা (কতকটার উপর জোর দিতে চাই) স্পষ্ট ক'রে তুলবে ; এবং ভাব যে-কালে নিরালম্ব নয়, বহির্জগতের উপলব্ধিবিশেষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত, তাই ভাবের সেই বিষয়গত দিকটাও কখনো আভাসে ইঙ্গিতে, কখনো-বা নাতি-পরোক্ষ বর্ণনার দ্বারা জানিয়ে দেবে। রবীন্দ্র-সংগীতে কথা ও সুরের ভূমিকা মোটের উপর এই প্রকারের।

কিন্তু তার মানে রবীন্দ্র-সংগীতে সুর আপন পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত নয়, সুরের একটা দিক মাত্র, অর্থাৎ কেবল ভাবোদ্রেক বা মেজাজ-সৃষ্টির শক্তিটাকেই কাজে লাগানো হয়েছে শব্দবাহিত ভাবকে প্রগাঢ়তর ক'রে তুলবার জন্য। কিন্তু সুরের আর-একটা দিক আছে— তার শৈলীগত বিস্তারের দিক, তার রূপকল্পের অত্যাশ্চর্য বৈভবের দিক। এই দিকটার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা মার্গ সংগীতে। যখন কোনো রাগিণীর জটিল এবং মহদৈশ্বর্যবান রূপ ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হতে থাকে আব্দুল করিম খাঁ বা গঙ্গুবাঈয়ের মতো গাইয়ের কণ্ঠে, তখন তা আমাদের মনকে সম্পূর্ণ টেনে নেয়। গানের কথা, অর্থাৎ কথার অর্থ, তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। এমনকি, সুরকে আর হর্ষবিষাদাদি ভাবপ্রকাশের বাহনও মনে হয় না ; তেমন একটা ভাব মনে জাগলেও সেটাকেই সুরসৃষ্টির শেষ কথা ব'লে ভাবতে পারি না। রাগিণীর পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ ঠিকমতো প্রকাশ পেলে এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়, আগেই যার কথা বলেছি এবং যাকে ক্লাইভ বেলের ভাষায় বিশুদ্ধ নান্দনিক অনুভূতি আখ্যা দিয়েছি। সংগীতের এই সূক্ষ্ম ও বহুলাঙ্গ রূপকল্প বা ফর্মের যথোপযুক্ত রসসম্ভোগে যিনি অধিকারী, তিনি

সংগীতের অন্য বৃত্তিগুলিকে গৌণ এবং সহকারী না মনে ক'রে পারেন না।

কবিতারও যে-একটা ধ্বনিময় রূপ আছে, তা আমি অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু সে-ধ্বনিরূপকে বিশুদ্ধ সংগীতের পর্যায়ে তুলবার চেষ্টা বৃথা। এমনকি, গানের সঙ্গেও তুলনা হয় না কবিতার শ্রুতিগত প্রকাশ-শক্তির। কোনো কবিতাতে ধ্বনির কৌশল যত পরিশীলিতই হোক, মূল্যের পরিমাপে তা ঐ কবিতায় অধিব্যক্ত ও আধো-ব্যক্ত অর্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না, যেমন কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর গানে সুর হতে পারে কথার প্রতিদ্বন্দ্বী। উচ্চারিত শব্দপরম্পরা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে অন্তর্নিহিত অর্থের দ্বারা, শুধু তার আওয়াজটুকু শুনবার জন্য কে কান বা মন পাতবে? যে-ভাষা আমরা একটুও বুঝি না, সে-ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্যপাঠ দু-মিনিট শুনবার পরই বিরক্তি জাগে। আর যদি-বা কোনো কবি বহু যত্নে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে একটি সূক্ষ্ম সুন্দর ধ্বনিরূপ আপন মনে রচনা করতে সক্ষম হন, সেটাকে তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন কোন্ উপায়ে? তিনি কি সংগীতের নোটেশনের অনুরূপ কোনো অভিনব সাংকেতিক চিহ্ন উদ্ভাবন করবেন? ছাপার অক্ষর তো ধ্বনির সমস্ত সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও মাধুর্য বর্জন ক'রে তার স্থূলতম সর্বসাধারণীকৃত রূপ মাত্র বহন করে।

কাজেই, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, কবিতার বেলায় অন্তত ধ্বনির ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ, সহকর্মী বা সহধুরীর নয়, পরিচারকের মাত্র। কোনো আধুনিক কবি যদি ভালেরীর ফরমুলা অনুযায়ী পাঠকের চিত্তকে কবিতার ধ্বনি থেকে অর্থে এবং অর্থ থেকে ধ্বনিতে দোদুল্যমান করতে প্রয়াসী হন, তা হলে এই তুচ্ছ থেকে মহৎ এবং মহৎ থেকে তুচ্ছে দ্রুত ওঠা-নামার

ফলে সে-পাঠকের রসোপলব্ধি নিশ্চয়ই গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। ভালেরী সুকবি হতে পারেন, সদ্‌গুরু মোটেই নন।

কিন্তু কেন মালার্মে আর ভালেরীর মতো শক্তিমান কবিরা কাব্যের অর্থব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবিতার ভাষাকে প্রধানত অর্থের বাহন জ্ঞান না ক'রে রূপের আধার ব'লেই গণ্য করলেন? ভালেরী তো সোজাসুজি ব'লেই ফেললেন যে তাঁর জাগতিক উপলব্ধিতে এমন কোনো অপূর্বতা নেই যার উপযুক্ত বাহন হবার গৌরব অর্জন করতে পারে তাঁর কবিতার ভাষা। 'আমি একজন এন্‌জিনীয়র মাত্র, আমার কাজ শব্দের ইট-পাথর দিয়ে একটা সুরম্য ইমারত খাড়া করা।' কবিদের মধ্যে শব্দের প্রতি এই অত্যুৎসাহ যখন লক্ষণীয় হয়ে উঠল তার কিছু আগেই দেখা দিয়েছিল মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে উৎসাহের অতিশয় অভাব, শুধু অভাব নয়, বিপরীত ভাব। এই পারম্পর্যটাকে কাকতালীয় মনে করবার কারণ নেই।

রেনেসাঁসের সময়ে সবাই না হলেও বিদগ্ধজনেরা প্রকৃতি ও ও মানুষ সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল, উৎসাহ ও অনুরাগ বোধ করতে আরম্ভ করেন। বলা উচিত পুনরায় আরম্ভ করেন, তাই ঐ যুগের নাম 'রেনেসাঁস' বা পুনরুজ্জীবনের যুগ। দু-হাজার বছর আগে পেরিক্লিয়ান এথেন্‌সেও এমনি বা আরো প্রবল চিত্তের উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। তারপর (গ্রেকো-রোমান সভ্যতার পতনের পর) য়োরোপীয় মানস রইল তমসাচ্ছন্ন, বিমূঢ়, নিঃঝুম হয়ে কয়েক শতাব্দী। দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ নামে অভিহিত। তখনও একপ্রকার

চিত্তজাগরণ অবশ্যই ঘটেছিল, কিন্তু যাঁরা জাগলেন, তাঁরা মানুষ বা প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে চাইলেন না, মনকে একান্তভাবে নিবিষ্ট করলেন জগতোত্তীর্ণ ঈশ্বরের চিন্তায় ও ঈশ্বর-প্রেরিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়। রেনেসাঁসের সময় থেকে ঈশ্বরের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করল মানুষ এবং প্রকৃতি। অল্পবিস্তর জোয়ার-ভাঁটা সত্ত্বেও এই মানবমুখিনতা ও প্রকৃতিপ্রিয়তা হয়ে দাঁড়াল য়োরোপীয় চিত্তের স্থায়ী মেজাজ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই মনোভঙ্গিই রোম্যান্টিক রিভাইভালের নামে নতুন ক'রে এবং বলিষ্ঠতর হয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তবে রোম্যান্টিকদের মনে মানুষ সম্বন্ধে যত উচ্ছ্বাসই থাক, তাঁরা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, স্বার্থপরতা, পরস্পর বিদ্বেষ ইত্যাদি বিষয়ে অনবহিত মোটেই ছিলেন না। কিন্তু সর্ব-ব্যাপী দুঃখ ও পাপের চেতনা তাঁদের মানববিমুখ ক'রে তোলে নি। কীটস্-এর মতো কেউ ভাবতেন জীবনের নিষ্করুণ পরীক্ষায় মানবাত্মা শুদ্ধ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; শেলির মতো কেউ এক অনাগত সুষ্ঠু সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যাতে মানুষমাত্রেই দৈহিক ও মানসিক সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করতে পারবে; কেউ বা এক অতীত স্বর্ণযুগের কল্পস্মৃতিচারণে মশগুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মানুষকে, দুঃখী ও পাপী মানুষকেও, ভালোবাসতেন তাঁরা সবাই, আর মানবীকৃত প্রকৃতিকে।

বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যে-কবিদের মনোভাব এতখানি ইতি-বাচক ও রসগ্রাহী, তাঁরা স্বভাবতই কবিতার ভাষাকে স্বচ্ছ রাখতে চাইবেন, সেই ভাষার কাচের ভিতর দিয়ে দেখাতে চাইবেন মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের অশেষ রূপবৈচিত্র্য বা সেই রূপবৈচিত্র্যে আভাসিত কোনো অন্তর্গূঢ় সত্য যা সংসারের শত কর্মে লিপ্ত মানুষের দিনানুদৈনিক দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

কবিতার ভাষা একাধারে প্রকাশ করবে শিল্পী মনের অনন্য ভঙ্গিকে, এবং সেই মনোভঙ্গির বিশিষ্ট দর্পণে বিশ্বজগতের স্বরূপটি যেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তাকে। কবির মন ও কবির দেখা জগৎ মিলিত হয়ে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করবে তাঁর কাব্য-রচনায়। সে-রচনা সব-কিছুকে আড়াল ক'রে নিজের অতিদক্ষ চারুকর্মকেই সর্বাপেক্ষা দৃশ্যমান ও মূল্যবান ক'রে পাঠকের দৃষ্টিকে ঐখানে আটকে রাখবে—এমন কথা তাঁরা কখনো ভাবতেই পারতেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং তার অনুকূল শিল্পভাবনায় বেশ বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। পরিবর্তনের কারণ বহুবিস্তৃত। সে ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার মতো বিদ্যেও আমার নেই, এখানে স্থানেরও অভাব। প্রাসঙ্গিক দু-কথা খুব সংক্ষেপে বলতে গেলেও নাম করতে হয় ডারুইন এবং মার্ক্সের। বহু কষ্টসাধ্য গবেষণার পর ডারুইন প্রতিপন্ন করলেন যে, মানুষ পতিত দেবদূত নয়, দেবতার প্রতিচ্ছবি নয়, বৃহৎকায় বানরজাতীয় কোনো জন্তুরই বংশধর। এর ফলে স্বভাবতই মানুষের দিব্য-গুণাবলী অপেক্ষা তার জান্তব বৃত্তিগুলিই অধিকতর প্রকট ও প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠল জ্ঞানী এবং শিল্পীর চেতনায়। অন্য দিকে, শ্রমশিল্পবিপ্লবের প্রথম ধাক্কা লেগে এবং ধনিকতন্ত্র গ'ড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে (বলা যেতে পারে তার প্রসব-বেদনায়) সমস্ত সমাজজীবনে যে-চারিত্র্যনৈতিক দুর্গতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে-অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে দেখা দিয়েছিল, তার মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকলেন ঐতিহাসিক কার্ল মার্ক্স। দার্শনিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী মার্ক্স বোঝালেন যে, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম—এক কথায় গোটা সাংস্কৃতিক হর্ম্যপ্রাসাদের ভিত্তিমূলে রয়েছে সত্য-শিব-সুন্দরের কোনো মহান আদর্শ বা

ঐশী প্রেরণা নয়, নিতান্ত স্থূল অর্থনৈতিক স্বার্থ ও তজ্জনিত শ্রেণী-সংঘর্ষ। মানুষের এই উভয়বিধ জান্তব কদর্য রূপ দেখে অনেক কবির স্পর্শকাতর চিত্ত মানববিমুখ হয়ে উঠল।

প্রকৃতি সম্বন্ধে উৎসাহেও ভাঁটা পড়ল ঐ সময়ে, কিন্তু স্বভাবতই ভিন্ন কারণে— প্রাকৃত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী উন্নতির ফলে। প্রকৃতির রহস্যাবরণ একে একে ছিন্ন হতে লাগল। যে-সব প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনা বুদ্ধিকে প্রতিহত করত ব'লে বিস্ময়ের রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলত, একপ্রকার অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বা মরমীয়াভাবে কবিচিত্ত ভ'রে দিত, সে-সব যাবতীয় ব্যাপার দেখা দিল জড় ও বৈদ্যুতিক শক্তির গোটাকতক গাণিতিক সূত্র রূপে। এই সূত্রগুলিকে হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে যার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে, সেই প্রকৃতিকে নিয়ে কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো মিস্টিক ভাবে বিভোর হওয়া যায়? কোল্‌রিজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, যেহেতু কবির দেখা জগৎ বিজ্ঞানীর মাপজোখ-করা জগতের সঙ্গে আদৌ মিলছে না, তাই কবির জগৎ তাঁর মনেরই ব্যাপার, বিজ্ঞানীর জগতের তুলনায় নিতান্ত অলীক :

We in ourselves rejoice ;
And thence flow all that charms or ear or sight,
All melodies the echoes of that voice
All colours a suffusion from that light.

যে-প্রকৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় এবং যে-প্রকৃতি কবির আনন্দ ও বিস্ময়ের উৎস, এ দুই প্রকৃতি যে একাধারে— যদিও ভিন্ন অর্থে— সত্য হতে পারে, এ-কথাটা উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকের কাছে স্পষ্ট হয় নি। আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন ক'রে এই কথাটা বুঝেছিলেন তাঁর পরিণত বয়সের

কবিতায়, আর কোনো কবি তেমন ক'রে বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, বিজ্ঞানের জয়তোরণ যতই চোখে ধাঁধা লাগাক, তাই ব'লে বিজ্ঞানের সত্যের কাছে কবিতার সত্য নতিস্বীকার ক'রে পিছু হ'টে যাবে, এবং সমগ্র বাস্তব সত্তার উপর বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য মেনে নিয়ে কবিতা রিচার্ডস্-এর উপদেশ অনুযায়ী নিজেকে অলীক কল্পনার জাল-বোনায় বা সাত্র্-এর পূর্বোক্ত কথামতো অর্থহীন শব্দের ভোজবাজিতে পরিণত ক'রে সন্তুষ্ট থাকবে, এটা কবিতার পক্ষে অসহনীয় আত্মাবমাননা।

যাই হোক, মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে যখন কবিদের উদ্দীপনা নিভু-নিভু, এমন সময়ে দেখা দিলেন আধুনিক কাব্যের মন্ত্রগুরু বোদলেয়র। বললেন, মানুষের সামনে দুটিমাত্র পথ খোলা আছে—জীবনকে আর জগৎকে ভালোবাসলে আমরা যাব শয়তানের দিকে ; ঘৃণায় সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে হয়তো বা ভগবানের ঠিকানা খুঁজে পাব। তাঁর কথা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, তাঁর শিষ্য-অনুশিষ্যরা—র‍্যাবো, মালার্মে, ভালেরীরা—উত্তরাধিকার-সূত্রে পেলেন ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের মনোভঙ্গি। অথচ তাঁদের মনে বোদলেয়রের ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস আদৌ বদ্ধমূল ছিল না। বিশ্বজগৎকে, প্রকৃতিকে, মানুষকে যদি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়, অথচ ভগবানের দিকে মনের জানালা বন্ধই থাকে, তা হলে কী নিয়ে মানুষ বাঁচবে? কবিতা নিয়ে। মালার্মে থেকে (প্রকৃতপক্ষে বোদলেয়র থেকে) য়েট্স পর্যন্ত প্রায় সব প্রতিভা-বান কবির মুখে এই একই বার্তা ঘোষিত হ'ল—কবিতাই একমাত্র সত্য, আর-সব কিছু মিথ্যা, তুচ্ছ, পরিত্যাজ্য।[৪] রবীন্দ্র-নাথের সমস্ত জীবন, মনন, হৃদয়ানুভূতি ও কাব্যসৃষ্টি এ-বার্তার তীব্রতম প্রতিবাদ।

কবি যদি জগতের সব-কিছু প্রত্যাখ্যান করেনও, তবু তাঁর অন্তরের গোপন রহস্য তো রইলই, সেখানেই তাঁর কাব্যসৃষ্টির উৎসের সন্ধান করবেন তিনি, সেখান থেকেই পাবেন সঞ্জীবনী শক্তি। শিল্পসৃষ্টি বহির্জগতের প্রতিবিম্ব নয়, অভিব্যঞ্জনা—রোম্যান্টিক যুগে এই মতটি ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথেরও সায় আছে এতে। কিন্তু অন্তরকে বাহির থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রবীন্দ্রনাথ দেখেন নি কখনো। বলছেন, 'জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে-পরিমাণে আমার অতীত সেই পরিমাণে আমিই ছোটো।'[৫] আরো স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন, 'আমার বাইরে যদি কিছু অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয়, অন্তরের সত্তাবোধ তত জোর পায়।'[৬] মানুষের অন্তর তো স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাশ্রয়ী সত্তা নয়, বিশ্বজাগতিক সত্তার আধার মাত্র। সে-আধারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, তবু তা আধার—অর্থাৎ ভ'রে না দিলে শূন্যই থাকবে।[৭] মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের প্রতি কবি যদি অবজ্ঞাবশত তাঁর মনের দরজা-জানালাগুলি বন্ধ ক'রে রাখেন, তবে সেই অন্ধকার ঘরের শূন্যতা ('void') ছাড়া আর কী উপলব্ধি করবেন? কাজেই বোদলেয়রের পরে আসেন র‍্যাঁবো এবং অনিবার্যত মালার্মে।

আধুনিক কবিরা একেবারেই শূন্যবাদী হতে পারতেন, শূন্যের মহিমা-কীর্তন করতে পারতেন মালার্মের মতো সাদা কাগজের শুচিতা কালি দিয়ে কলঙ্কিত না ক'রে। কিন্তু ভালেরী তাঁদের বাঁচালেন: দিগ্‌ব্যাপী শূন্যতায় তিনি দেখতে পেলেন একটি জ্যোতির্ময় রূপ। সে-রূপ শব্দের। ঐ শব্দ স্বভাবতই হবে অনচ্ছ, এবং ঐ অনচ্ছ শব্দযোজনায় কবি রচনা করবেন একটি

আক্ষরিক অর্থে সৃষ্টিছাড়া ইমারত। কবিতাই যখন একমাত্র সত্য, কবিতায়া ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ, তখন কবিতার ভাষা নিজেকে ছাড়া আর কাকে প্রকাশ করবে, কার রহস্য উন্মোচন করবে, কার ইঙ্গিত বহন করবে? পরমকে তো আর অপরমের, উত্তমকে তো আর অধমের সংকেত বা বাহন করা যায় না। কাজেই কবিতা আর সব-কিছুর অকিঞ্চিৎকরতা ঘোষণা ক'রে নিজেই হবে স্বয়ম্ভূ ও বিভূ। সেকালের তান্ত্রিকদের যেমন ছিল শব-সাধনা, আজকের কবিদের তেমনি আছে শব্দ-সাধনা; এটাই তাঁদের আদি, অকৃত্রিম এবং অন্তিম সাধনা। কবিতার ঐন্দ্রজালিক শব্দ সম্বন্ধে সার্ত্র্ বলছেন: 'its sonority, its masculine endings, its visual aspect compose for him a face of flesh.' ঐ সুন্দর মুখের প্রেমে পড়েছেন আধুনিক কবিরা, আর কিছুই ভালোবাসতে পারছেন না তাঁরা; এ-বিশ্বজগতে ভালোবাসার যোগ্য অন্য কিছুও হতে পারে এমন কথা তাঁদের ধারণার মধ্যেই আসে না। এই শব্দপ্রেমিক অভিনবত্বের সাধক কবিদের পক্ষে বিশ্বপ্রেমিক মহাকালের মন্ত্র-শিষ্য রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা সহজ নয়।

বলা বাহুল্য, উপরের মন্তব্যগুলি যাবতীয় আধুনিক কবি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আধুনিক কবিতার দুটি প্রধান ধারার আলোচনাই আমার অভিপ্রেত ছিল। প্রথমটির মূলভাব— জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা; দ্বিতীয়টির গোড়ার কথা— কবিতাকে বহির্জগতের কবিহৃদয়ানুরঞ্জিত উপলব্ধির বাহন জ্ঞান না ক'রে দুর্ভেদ্য (আক্ষরিক অর্থে

করা। বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য কবিদের উপর এই দুটি প্রবণতার অল্পবিস্তর ছায়া পড়েছে, যেমন পড়েছে

১৯৩০-এর পর থেকে অধিকাংশ বাঙালী কবিদের উপর। হালের শক্তিমান কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম অবশ্যই পাওয়া যাবে, পাশ্চাত্ত্যে (যথা রবার্ট ফ্রস্ট্‌) এবং বাংলা দেশেও (যথা অমিয় চক্রবর্তী)। সম্মানিত ব্যতিক্রম মার্ক্স্‌বাদী কবিরাও; তবে কবিতাকে সমাজগঠনের মহৎ কাজে উৎসর্গ করার আদর্শ অন্য নিরিখে বিচার্য। আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা দিতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ; এক হিসেবে যাঁরাই আধুনিক কালে কবি রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রতিভা ও সাধনার যুগ্ম-অধিকারে, তাঁরাই আধুনিক কবি— যুগলক্ষণ-অধিকৃত না হলেও। তবু কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার দুটি প্রধান দুর্লক্ষণ আমার চোখে যেমন প্রতিভাত হয়েছে, তারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি এ-বইয়ের প্রথম ও বর্তমান অধ্যায়ে। আধুনিক কবিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে তার সুলক্ষণগুলির কথাও বলতে হয়; কিন্তু তা আমার সীমিত প্রসঙ্গের বহির্ভূত ছিল, তার সুযোগ এখানে ঘটে নি।

১ Jean Paul Sartre—*What is Literature*, pp 4-5. (Methuen, 1950)

২ এর উদাহরণস্বরূপ মালার্মের বিখ্যাত সনেটের সুদক্ষ অনুবাদখানি তুলে দেওয়া যায়:

Her pure nails very high dedicating their onyx,
Anguish, this midnight, upholds, the lamp-bearer,
Many vesperal dreams by the Phenix burnt
That are not gathered up in the funeral urn

On the credences, in the empty room : no ptyx,
Abolished bibelot of sounding inanity
(For the Master is gone to draw tears from the Styx
With this sole object which Nothingness honours.)

But near the window void Northwards, a gold
Dies down composing perhaps a decor
Of unicorns kicking sparks at a nixey,

She, nude and defunct in the mirror, while yet,
In the oblivion closed by the frame there appears
Of scintillations at once the septet.

ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক শার্ল মোর্‌ বলছেন— এই সনেটের মূল্য নির্ভর করছে ফরাসী ভাষায় তরল ও কঠিন ব্যঞ্জনবর্ণের এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের অত্যাশ্চর্য ধ্বনিবিন্যাসের উপর। এত সব কালোয়াতি করতে গিয়ে কবিতার অর্থটাকে বেশ নির্মম হস্তে দুমড়ে মুচড়ে নাকালের একশেষ করা হয়েছে বটে, তবে 'the words themselves, rare and chiselled, suffice to give the poem the air of a jewel in gold and agate'। সমালোচক মহোদয় মালার্মে-ভক্ত না হলে ভাবতাম জড়োয়া গয়নার সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি কবিতাটির তুচ্ছতার দিকেই ইঙ্গিত করছেন। কারণ গয়নাগাঁটির চেয়ে তুচ্ছ জিনিস আর কী আছে এ সুন্দর ভুবনে।

৩ ইংরেজি ভাষায় এই আদর্শে রচিত হার্বার্ট রীডের কয়েকটি ছোট কবিতা মার্চ ১৯৫৯-এর এন্‌কাউণ্টার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তার একটি :

hot rod

vellum list fell dole
packed pendulum red roar
esteem wet spindle
auriculur thy lung
scut thews cold selvage
out angular out out odd
yet not.

সুখের বিষয় বাঙালী কবিরা এদিক দিয়ে এখনো পেছিয়ে আছেন। তবে কতদিন পশ্চাৎপদ থাকবেন বলা যায় না।

৪ Exclude, if you begin,
The real which is cheap
Its too sharp sense rubs thin
Your vague literature.

(Stephane Mallarmé)

And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium

....

Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing.

(W. B. Yeats— "Sailing to Byzantium")

৫ সাহিত্য, পৃ ৫

৬ সাহিত্যের পথে, পৃ ৪০

৭ 'The poet remains empty to himself if he does not fill himself with the universe, the poet knows himself only on the condition that things resound in him, and that in him, at a single awakening, they and he come forth together out of sleep.'
কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের মতো শোনায়, কিন্তু বলেছেন আধুনিক কালের প্রথিতযশা দার্শনিক ও শিল্পসমালোচক জাক্ মারিতাঁ।

অন্তিম পর্বের দুটি কবিতা

'বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার, কবিতা কেবল প্রাণিত করতে জানে'— বলেছেন শঙ্খ ঘোষ,* রবীন্দ্রনাথের দোহাই পেড়ে। কবিতার সঙ্গে গদ্যের প্রভেদ একটা আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু, প্রথমত, সে-প্রভেদ এই নয় যে কবিতা কিছু না বুঝিয়েই প্রাণিত করে, আর গদ্য বোঝায় কিন্তু প্রাণিত করে না কখনো। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের এই দুই বিভাগের মাঝখানে কোনো অলঙ্ঘ্য কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয় নি সর্বকালের মতো, সর্বাবস্থার জন্য, সর্বসম্মতিক্রমে। আনাগোনা, সীমানা-সরহদ্দের রদ্‌বদল চলছে হামেশাই। গদ্য দরকার পড়লে কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে— যেমন উপনিষদে, প্লেটো আর বের্গসঁর দর্শনে, গিবন আর মম্‌সনের ইতিহাসে, তুর্গেনেব্‌, লরেন্স আর জয়েসের উপন্যাসে, মোপাসাঁ আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। কবিতা আপন অন্তরের তাগিদেই গদ্যকে বুকে টেনে নেয়— তার উদাহরণ হোমর, ভার্জিল, ব্যাস, দান্তে, শেক্সপীয়র, গ্যেটে, এলিয়ট এবং রবীন্দ্রনাথে অজস্র ছড়ানো রয়েছে।

বোঝানোর একটি অর্থ একজনের মনের কথা আর-একজনের মনের দেউড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কথার শুধু হৃৎস্পন্দনটুকু নয়, বহির্জগতের যে-বস্তু বা অবস্থার অভিঘাতে সে-হৃদয়াবেগের জন্ম এবং যার বহমান চেতনার সঙ্গে তার পরিপুষ্টি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত সেই সমগ্র উপলব্ধির মন থেকে মনান্তরে সঞ্চার— এই অর্থে বোঝানোর দায়িত্ব কবি না নিলে আর কে নিতে পারে?

* ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

অনুভূতি বাদ দিয়ে বিষয়ের যে নিরঞ্জন সত্তা তার যথাযথ সংবাদ-বহন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-সদৃশ গদ্যের কাজ; বিষয়টাকে উপেক্ষা ক'রে শুধুমাত্র তার অনুভূতিটুকু ছেঁকে নিয়ে সে-অনুভূতির বিস্তারিত অভিব্যঞ্জনা সংগীতে পাই আমরা। এ-দুয়ের মাঝখানে পড়েন কবি। এক দিককার দায়িত্ব এড়াতে গেলে তিনি বৈজ্ঞানিক (বা দার্শনিক কিংবা ঐতিহাসিক) হয়ে পড়বেন, পদ্য ছেড়ে গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন; অন্য দিককার দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইলে তাঁকে হতে হবে সংগীতকার, কলম ছেড়ে আঙুলে পরতে হবে মেজরাব।

কবিতার গভীর তলে যে-অর্থ লুকানো থাকে তার সন্ধানে ডুব দিতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম; আজ শুনছি তার উপরিতলে যে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির মোহিনী মায়া বিস্তৃত সেখানেই কবিতার সারাৎসার খুঁজতে হবে। আমরা ভুলতে বসেছি যে অর্থের গরবেই কথা গরবিনী। অবশ্য উঁচু দরের গাইয়েরা সে-গরব উপেক্ষা ক'রে যে-ক'টি কথার উপর রাগ-রাগিণীর বিস্তার করেন তার অর্থ যৎসামান্যই হয়, অনেক সময়ে কালোয়াতী গানের কথা ঠিকমতো বোঝাই যায় না। কিন্তু অর্থের দৈন্য ঘোচাবার জন্য থাকে কণ্ঠের ঐশ্বর্য আর আজীবন সুরের সাধনা। মালার্মে-ভালেরীর প্রদর্শিত পথে যদি কবিতাকে সংগীতের পর্যায়েই তুলতে চান আধুনিক কবিরা তা হলে সংগীতের বলিষ্ঠ পরিণত আঙ্গিকের চর্চা করতে হবে তাঁদের। শুধু কবিতার বাচ্যার্থের উপর কাঁচি চালালেই সাংগীতিক ব্যঞ্জনার জামা তৈরী হয়ে যাবে ভাবাটা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং পাঠককে বঞ্চিত করা। ইতিমধ্যে শেক্সপীয়র কিংবা রবীন্দ্রনাথ কথার যে-অপরিমেয় শক্তি-উৎসের সন্ধান দিয়ে গেছেন তার ভগ্নাংশমাত্র বেছে নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবাদের মতো বলা কি সাজে— বাকীটা সকৃড়ি, ওতে গদ্যের ছোঁয়া লেগেছে? ধর্ম

হৃদয়ের ব্যাপার, আচারের নয়; কবির ধর্মও— কবির ধর্ম তো বিশেষ ক'রে। গদ্যের ছোঁয়া বাঁচাতে গিয়ে পাঠকের ছোঁয়ার বাইরে চ'লে যাচ্ছেন না কি আধুনিক কবিরা, বুঝিয়ে বলার ভয়ে কি নিজেকে স্ফিঙ্ক্‌স্‌-এর মতো অনধিগম্য ক'রে তুলছেন না? আমি অবশ্য অকবি পাঠকের কথা ভাবছি। কবিরাই পরস্পরের কবিতা পড়বেন এবং তার মর্মোদ্‌ঘাটন করবেন অর্থাৎ কবিতার উপর আর-একটি কবিতা লিখবেন— এটাকেই যদি স্বাভাবিক ঠাওরানো হয়, তা হলে কিছু বলবার নেই।

ভাষার এপারে আছেন লেখক, ওপারে পাঠক। মাঝখানে যদি বোঝাবুঝির সেতুবন্ধন না হয়, তবে বলতেই হবে একপক্ষের বা উভয়পক্ষের দোষ ঘটেছে: পাঠক আনাড়ি বা নির্বোধ হতে পারেন, লেখকও আনাড়ি বা একগুঁয়ে বা অসদ্‌গুরু-চালিত হতে পারেন; অথবা উভয়ত। কবি যখন ভাষাশিল্পী তখন বোঝানোর অর্থাৎ সম্পূর্ণ উপলব্ধিকে কমিউনিকেট করার দায়িত্ব কবিকর্মেরই অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ কখনো এ-দায়িত্ব এড়ান নি। কিন্তু বোঝানো মানে প্রমাণ করা নয়। সে-ঝুঁকি বৈজ্ঞানিকের, ঐতিহাসিকের, দার্শনিকের। কেউ শেষ অবধি কিছুই তর্কাতীত রূপে প্রমাণ করতে পারেন না— প্রমাণ কাকে বলে সে-বিষয়েই অনেক মত। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই এঁদের। অণোরণীয়ান থেকে মহতো-মহীয়ান যাবতীয় বস্তুর মধ্যে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজছেন গহ্বরেষ্ঠ তথ্য, বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী, আরোহী ও অবরোহী যুক্তির সোপান বেয়ে উঠছেন প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, বিশেষ থেকে সামান্যে, বহু থেকে একে। কবি কিন্তু বলেই খালাস। কোনো প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করার গরজ নেই তাঁর, কারণ প্রয়োজন নেই। প্রমাণ না দিয়েই মানিয়ে নেওয়ার অর্থাৎ মনে ধরাবার কৌশল তাঁর জানা আছে। তাকেই বলে কাব্যকৌশল। রবীন্দ্রনাথ যদি

ব'লে থাকেন 'বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার', তবে নিশ্চয়ই এই অর্থেই বলেছিলেন।

নবজাতক-এর "প্রশ্ন" কবিতাটিতে কয়েকটি গদ্যধর্মী পঙ্‌ক্তি আবিষ্কার ক'রে শঙ্খ ঘোষ রায় দিয়েছেন, ওটা কবিতাই নয়, শেষ লেখা-র ১৩ সংখ্যক কবিতার প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য। একদিন ছিল যখন অকবিজনোচিত শব্দ কবিতায় স্থান দেওয়ার কথা ভাবলে আঁতকে উঠতেন কবিরা। আজ শুধু অকবিজনোচিত নয়, রীতিমতো অভদ্রজনোচিত শব্দের উপর পক্ষপাত জন্মে গেছে কবিদের। কিন্তু কবিতার মধ্যে অকবিজনোচিত পঙ্‌ক্তি, এমন পঙ্‌ক্তি যা গদ্য ব'লে ভুল হতে পারে? সর্বনাশ, জাত যাবে যে!

*বড় দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, শঙ্খ রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতাকে এই কারণে প্রায় জাতিচ্যুত ব'লে বিচার দিয়েছেন। এমনি এক বিচার প্রত্যাসন্ন জেনে কি রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই বলেছিলেন, 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন'? শেষ দশ বছরের রচনায় রবীন্দ্রপ্রতিভা এমন অমোঘ, এমন দুঃসাহসিক যে, কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ, আচারের বাধা, গণ্ডির বেড়া মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি; পদ্যে এনেছেন গদ্যের ঋজুতা, গদ্যে জাগিয়েছেন পদ্যের স্পন্দন, বোধিকে করেছেন বেদনাময়, তত্ত্বকে করেছেন প্রাণস্পন্দিত। বেদ-উপনিষদের, বাইবেলের, রুমীর মস্‌নবীর, হাফিজের গজলের শ্রেষ্ঠ অংশ যেমন শুদ্ধ কবিতা হয়েও শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনার শ্রেষ্ঠ ভাগও তেমনি কবিতার চেয়ে বেশী হয়েও কবিতার চেয়ে কম নয়। শুধু বৈদিক গাথা বা উপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভুল হবে। নিতান্ত মানুষী প্রেমের কবিতাও রবীন্দ্রনাথের সত্তর থেকে আশি বছর বয়সের রচনাতে গুণে ও

গণনায় বিস্ময়কর, অন্য কোনো দশকের সঞ্চিত ভাণ্ডার তাকে সহজে হার মানাতে পারবে ব'লে আমার মনে হয় না।*

'It seems, as one becomes older, that the past has another pattern and ceases to be a mere sequence or even development: the latter a partial fallacy encouraged by superficial notions of evolution, which becomes, in the popular mind, a means of disowning the past.'

উদ্ধৃত বাক্যটি কোনো জনপ্রিয় দার্শনিকের সুলিখিত প্রবন্ধ-সংকলনে পাওয়া যাবে না। গেলে একটুও বেমানান ঠেকত না, তবে পাঠকের চোখে তার গভীর কাব্যিক তাৎপর্য ধরা পড়ত না। টি. এস. এলিয়ট এই জটিল দীর্ঘ গদ্য বাক্যটিকে পাঁচটি পঙ্‌ক্তিতে ভাগ ক'রে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির গোড়ায় বড় অক্ষর বসিয়ে *Four Quartets*-এর ২৮ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত করেছেন। সেখানেও বেসুর বাজে নি। এমনি আরও গোটা পনেরো গদ্য বাক্য ছড়ানো রয়েছে ঐ নীতিদীর্ঘ কাব্যে। কোনো সুধী পাঠক বা কবিসমালোচক এই 'অকবিতার অংশগুলিকে নির্মম ভাবে বাদ দিয়ে' কাব্যখানিকে 'শুদ্ধ' করার প্রস্তাব তুলেছেন ব'লে তো শুনি নি।

'তুমি যাকে বলো সুন্দর, তা বহুরূপী পঞ্চভূতে, চিত্রল উদ্ভিদে কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে নেই, আছে শুধু আমারই অহমিকায়'—এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী দার্শনিক গদ্য বাক্যে কয়েকটি শব্দের স্থান অদলবদল ক'রে বুদ্ধদেব বসু তাকে পদ্য করেছেন। সেটা কিছু নয়, যে-কোনো গদ্য বাক্যকে সামান্য বদলে দিলে তা পদ্য হতে পারে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই (কিন্তু কেনই বা আশ্চর্য হব?) যখন লক্ষ্য করি যে এই তত্ত্ববাক্য এবং এমনি আরো কয়েকটি বাক্য একটি সুন্দর কবিতা "মরত্ব-সংগীত"-এর অঙ্গীভূত। যা

গদ্যে বলা যায়, যা ছন্দোবদ্ধ গদ্যেই বলা হয়েছে, এমন সমস্ত কথা কবিতা থেকে বাদ না দিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা জাতিচ্যুত ব'লে ধার্য হবে—সে অশুভ দিন আশা করি সাহিত্যে কখনো আসবে না। কোনো কবিতায় কয়েকটি গদ্য বা গদ্যধর্মী পঙ্‌ক্তি থাকলেই তার মূল্যহানি ঘটে না। পঙ্‌ক্তিগুলি কবির অক্ষমতাপ্রসূত, না বিশেষ অনুষঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আনা হয়েছে, তারা কবিতাকে পূর্ণতা দান করছে না খণ্ডিত করছে— এটাই বিচার্য। পঙ্‌ক্তিবিচার কাব্যবিচার নয়।

যে-পঙ্‌ক্তিগুলিতে শঙ্খ 'ছন্দ আর মিল ছাড়া' আর কিছুই খুঁজে পান নি 'যা কবিতা হিসাবে গ্রাহ্য, অনিবার্য, যা কেবলই গদ্য নয়', পূর্বানুষঙ্গসহ "প্রশ্ন" কবিতার সেই অংশটা উদ্ধৃত করছি :

বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে-রূপান্তরে
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া—
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।

এই ক'টি পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বহু দার্শনিক মত ও জিজ্ঞাসা সংহৃত করেছেন; সে-সব কথা গদ্যে বুঝিয়ে বলতে গেলে (যেভাবে বুঝিয়ে বলা গদ্যে সংগত ও প্রত্যাশিত) শতাধিক পৃষ্ঠার একটি

নিবন্ধ রচনা করতে হয়। 'আমি'র রহস্য সম্পর্কে উপনিষদকার এবং সক্রেটিসের সময় থেকে জিজ্ঞাসা ও গবেষণার শেষ নেই; কত মতবাদ গ'ড়ে উঠেছে ও ভেঙে গেছে বা ঈষৎ ভগ্ন দশায় এখনও টিকে আছে, মনের কত দিক, কত গ্রন্থি, কত স্তর উদ্ঘাটিত হয়েছে, অথচ কোনো সন্দেহ নেই যে অনুদ্ঘাটিত সত্যের তা ভগ্নাংশমাত্র। জানা ও আধোজানা সব কথা বলার পরও আমাদের প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয় যে কিছুই বলা হয় নি; সবচেয়ে সত্য যে-আমি, জ্ঞাতা বা সাক্ষী, 'মনেরও মন', তার সম্বন্ধে যে বলার মতো কিছু বলা হয় নি শুধু তাই নয়, কিছু বলা সম্ভবই নয়; সে-আমি আক্ষরিক অর্থে অনির্বচনীয়। আরও একটা কথা এবং এ-কবিতাটি বুঝতে হলে সেটাই বড় কথা। মনের অনেক কিছু জানা নেই যেমন, তেমনি অণুপরমাণুর, নক্ষত্র-নীহারিকারও অনেক কিছু জানা নেই। কিন্তু মস্ত প্রভেদ এই যে আত্মা সম্বন্ধে যখন কিছু বলি বা ভাবি তখন অজানা অংশ একেবারে বাদ যায় না: 'আমি' যে আমিই, তার চেয়ে নিকট, তার চেয়ে অন্তরঙ্গ, তার চেয়ে সত্য তো আর কিছু নেই। সুতরাং যা বলতে বা ভাবতেও পারি না, 'আমি'র সেই বিরাট অব্যক্ত অর্থ যেন ছায়ার ছায়া হয়ে আমাদের ব্যঞ্জনা ও ভাবনার সঙ্গে লেগে থাকে। আমার তো মনে হয় '"আমি" উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র মাঝে অসংখ্য বৎসরে' কিংবা 'যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া'—এমন অর্থঘন পঙ্‌ক্তি ফোর কোয়ার্টেট্‌স-এর মতো কবিতায়ও দুর্লভ। আর যা-ই হোক, এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়, কারণ বিশুদ্ধ গদ্যে ঐ বক্তব্য একটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত করা যায় না।

অবশ্য এগুলি বিশুদ্ধ কবিতার পঙ্‌ক্তিও নয়—সেই অর্থে যে-অর্থে খেয়া বা গীতাঞ্জলির পঙ্‌ক্তি বিশুদ্ধ কবিতা। সে-রকম

কবিতা তো রবীন্দ্রনাথ কম লেখেন নি। শেষের কয়েকটি কাব্য-গ্রন্থে তিনি অন্য পথ কাটতে চেয়েছেন, কেটেছেন। একই মান-দণ্ডে দুই বিভিন্ন কাব্যমার্গের বিচার সংগত নয়। এটাও ভেবে দেখা দরকার যে এই আপাত গদ্য বাক্যগুলিকে আরও আবছা ক'রে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ঢেকে দিয়ে বলা কি রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে একটুও শক্ত ছিল? বরঞ্চ সেই অভ্যাস ও প্রলোভন ত্যাগ করতে হয়েছে কষ্ট ক'রে, বহু যত্নে গদ্যের ঋজুতা ও অপরোক্ষতা তিনি এনেছেন শেষ পর্বের অনেক কবিতায়, কারণ এ-কবিতাগুলি ভিন্ন জাতের, ভিন্ন উপলব্ধি-সঞ্জাত।

নবজাতক-এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভিতর থেকে মনন-জাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' এই 'মননজাত অভিজ্ঞতা' আধুনিক বিজ্ঞান— পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান —থেকে লব্ধ। এমনতর বৈজ্ঞানিক মনন যে-হৃদয়াবেগ জাগিয়ে-ছিল তাকে নিয়েই কবিতা। কিন্তু সে-কবিতা থেকে মননকে তো একেবারে ছাঁটাই করা যাবে না। আর মননকে ঠাঁই দিতে গেলে তার বাহন সেই ভাষা যা গদ্যের খুব কাছাকাছি তাকে খিড়কি দরজার ফাঁক দিয়ে কখনো ছন্দে সজ্জিত ক'রে কখনো বা বিনা সাজে ঘরে ঢুকতে দিতে হবে। অথচ সেই গদ্যপ্রতিম পঙ্‌ক্তিগুলিকে ধারণ ক'রে আছে একটি নিঃসন্দিগ্ধ কাব্যানুভূতি, সমগ্র কবিতায় যা অভিব্যক্ত।

নবজাতক-এ রবীন্দ্রনাথ কবিতার পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন, পা বাড়িয়েছেন বিজ্ঞানের খাসমহলে। এ-ধরনের মননজাত অভিজ্ঞতায় যাঁদের অরুচি, রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব তাঁদের কাছে স্বভাবতই অপাঙ্‌ক্তেয় ঠেকবে। তা নিয়ে কোনো পক্ষের নালিশ না থাকাই ভালো। ভিন্ন কারণে সোনার তরী ও চিত্রার অভিজ্ঞতাও একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো সুকবির কাছে অনধিগম্য

ছিল, কাজেই ঐ কাব্যগুলি হয়েছিল তাঁর শাণিত বিদ্রূপের লক্ষ্য।

২

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

(শেষ লেখা)

উদ্ধৃত কবিতার প্রশ্ন ('কে তুমি') কার উদ্দেশে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন করেছিল 'প্রথম দিনের সূর্য'। সূর্যকে জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের প্রতীক ধরা যেতে পারে, ধরা হয়েই থাকে; সব দেশেই জ্ঞানের উপমান আলো। প্রশ্ন করা হয়েছিল পরম সত্তাকেই, কবিতাটি যদি এইভাবে বুঝি তা হলে নূতন আবির্ভাবের মানে করতে হয়—যখন পরম সত্তা প্রথম আবির্ভূত হ'ল মানবচৈতন্যে। প্রশ্নের কি কোনো উত্তর নেই? কয়েকটি উত্তর তো কবিতার

মধ্যেই দেওয়া হ'ল। পরম সত্তার আবির্ভাব ঘটে এবং অনাবিভূর্ত বা আমাদের অজ্ঞাত রূপেও তা সত্য; বারে বারে আবির্ভাব ঘটে, নইলে 'নূতন আবির্ভাব' বলা হ'ল কেন? মানবচৈতন্য নির্বাপিত হলেও ('দিবসের শেষ সূর্য') পরম সত্তার বিনাশ নেই। এতগুলি উত্তর পাওয়ার পরও 'মেলে নি উত্তর' বলা এবং তার পুনরুক্তি 'পেল না উত্তর' কি সংগত? এর চেয়ে বেশী আর কী উত্তর প্রত্যাশিত ছিল, আর কী উত্তর দেওয়া হয়েছে উপনিষদে —পরম সত্তা ও সূর্যপ্রতিম চৈতন্যের ধারণা যেখান থেকে গৃহীত? আর-একটি উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় সেখানে। পরম সত্তা উপনিষদের ভাষাতেই উত্তর করতে পারতেন— আমি তোমার মধ্যেও সত্য, অতএব নিজেকে জানো, (যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি, আত্মানং বিদ্ধি, ইত্যাদি)। এই উত্তরকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন সর্বান্তঃকরণে সত্য ব'লে জেনেছেন, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হঠাৎ তার প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এমন অনুমানের সমর্থন পাই না তাঁর শেষ বয়সের কাব্যে। না, কবিতাটিতে ব্রহ্ম-সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রত্যাখ্যান নেই —এ-বিষয়ে আমি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে একমত।

তবে কি প্রশ্ন করা হ'ল নূতন আবির্ভাবকেই— 'আবির্ভাবে' অর্থ আবির্ভাব-কালে নয়, আবির্ভাবকে? সত্তা এবং আবির্ভাব, reality এবং appearance, এই দ্বৈতের কথা তোলা হয়েছে তা হলে। নামরূপময় জড় ও শক্তির লীলাস্বরূপ প্রত্যক্ষ জগৎকেই (এবং তার অঙ্গীভূত মানবজীবনকে) কবি জিজ্ঞাসা করছেন— কে তুমি। প্রতীয়মান জগতের অনেকটা পরিচয় পাই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সাধারণ মানুষের অনুমানে; সুষ্ঠুতর, পূর্ণতর পরিচয় পাই বিজ্ঞানে— জড়, জীব ও মনঃ বিজ্ঞানে। এ-পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নয়, অভ্রান্ত নয়, সংশোধনীয়, আপন

পরিধি ও গভীরতা যুগে যুগে বাড়িয়ে চললেও কোনোদিন সম্পূর্ণ বা সংশয়রহিত হবে না—এসব তো বিজ্ঞানের এবং দর্শনের জীর্ণতম উক্তি। রবীন্দ্রনাথ কি তারই পুনরুক্তি করতে চেয়েছেন, 'মেলে নি উত্তর' ব'লে? এই স্ফুলিঙ্গের মতো দীপ্তিমান কবিতার এমন চর্বিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমার মন সায় দেয় না।

একটি কথা এ-কবিতার ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে অনেকে লক্ষ্য করেন নি বোধহয়। আলোচ্য প্রশ্ন 'কী তুমি' বা 'কেন তুমি' নয়, 'কে তুমি'। 'কী তুমি' প্রশ্নটাতে জানতে চাওয়া হয় তোমার যাবতীয় গুণ ও ধর্ম, হেতু ও নিমিত্ত, আকার ও আয়তন, গঠনের উপাদান ও প্রণালী, ইত্যাদি। এ-প্রশ্ন সমগ্র বিশ্বজগতের উদ্দেশ্যে তোলা যায়, দার্শনিকেরা তুলেই থাকেন, কবির মনেও উঠতে পারে অনায়াসে। কিন্তু কবিতায় এ-প্রশ্ন কেউ কাউকে করে নি। কবিতার প্রশ্নটি হ'ল 'কে তুমি'। প্রশ্নটি সনাক্তের, আইডেন্টিটির —এতগুলো লোকের মধ্যে কোন্ বিশেষ লোকটি তুমি, এমন কী পরিচয় আছে তোমার যাতে অন্য দশজনের মধ্যে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই চেনা যায়? এ-প্রশ্ন সমগ্র বিশ্বসত্তাকে করার কোনো মানে হয় না। করা যায় ব্যক্তিবিশেষকে; ব্যক্তিবিশেষকেই করা হয়েছে কবিতাটিতে। সে-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছয়-সাত বছরের বালক খুব ভোরে উঠে জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাগানে গিয়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় ব'সে থাকত। সত্তার নূতন আবির্ভাব তখন বালকের মধ্যে, তার নবোন্মেষিত, উৎসুক, পিপাসিত চৈতন্যের মধ্যে। ব'সে ব'সে সে আনমনা হয়ে কত কী ভাবত, হঠাৎ এক সময়ে টের পেত নারকেল গাছের সারির উপর থেকে প্রথম দিনের সূর্য (চিত্তোন্মেষের দিক থেকে এই

দিনগুলি তার জীবনে প্রথম) তার বালক মিতাটিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কে তুমি ? দেখে এসেছি লক্ষ লক্ষ ছেলে মায়ের পাশে ঘুমিয়ে আছে, দাওয়ায় ব'সে গল্প করছে, উঠোনে ছুটোছুটি করছে। তোমার মধ্যে এমন কী আছে যাতে ক'রে এই লক্ষ ছেলের মধ্যে তোমাকে আলাদা ক'রে তুমি ব'লে চিনব ? বালক রবি নিরুত্তর। কী তার আছে যে তার মিতা তাকে চিনে রাখবে ?[১]

তার পরে পঁচাত্তর বছর কেটে গেল। কবির জীবনে অস্ত-গোধূলি। ডুবতে ডুবতে সেই প্রথম দিনের সূর্য আবার শেষ বারের মতো প্রশ্ন শুধালো, 'কে তুমি ?' এই দীর্ঘ জীবনের অবিরাম অক্লান্ত সাধনায় হয়তো কিছু কাজের মতো কাজ করেছে সেই বালক, কিছু দিয়েছে পৃথিবীকে, চল্‌তি কালের এমন কোনো বদল ঘটিয়েছে যা তাকে মহাকালের দরবারে (এবং মহাকালের প্রতীক নিত্য নব উদীয়মান ও অস্তমান রবির কাছে) চিনিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কোন্ ভরসায় এ-কথা নিজের মুখে উচ্চারণ করবে সে ; তার এই কীর্তিস্তম্ভ আজ যত উঁচুই দেখাক, তা কি সত্যি মহাকালে গণ্য হবার, সযত্নে রক্ষিত হবার, যোগ্য ? চুপ ক'রে রইল বৃদ্ধবয়সে উপনীত সেই বালক। জীবনান্তের অন্তিম সূর্য 'পেল না উত্তর'।

প্রশ্ন

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন

পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে
আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া—
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।
তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষকথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।

বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

(নবজাতক)

"প্রথম দিনের সূর্য" কবিতাটিতে সৃষ্টি বা স্রষ্টা বিষয়ে কোনো অজ্ঞাবাদ ব্যক্ত হয় নি, ব্যক্ত হয়েছে একজন ব্যক্তির অসম্পূর্ণ পরিচয়ের, অসমাপ্ত আত্মস্বরূপ-প্রতিষ্ঠার বেদনা। অবশ্য সেই একজনকে সর্বজনের প্রতিভূ মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তেমন সার্বজনীনতার আভাস তো শিল্পমাত্রের পশ্চাৎপটে কম্পমান। কবিতাটি ব্যক্তিবিশেষের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। পক্ষান্তরে, নবজাতক-এর "প্রশ্ন" কবিতার পরিপ্রেক্ষিত আক্ষরিক এবং প্রত্যক্ষভাবে সার্বভৌম; একটি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক চিন্তাকে কেন্দ্র ক'রেই তার ভাবলোক গ'ড়ে উঠেছে। দুটি কবিতার কেন্দ্রে আছে একটি প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তা ও প্রশ্নের বিষয় ভিন্ন। দ্বিতীয় কবিতায় প্রশ্ন 'কে' নয়, 'কেন'। প্রশ্নকর্তা স্বয়ং কবি এবং আমরা সবাই। প্রশ্নের বিষয় নক্ষত্রজগৎ প্রথম স্তবকে, দ্বিতীয় স্তবকে মানবাত্মা। 'কেন' শব্দটি অবশ্য ব্যবহার করা হয় নি, ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিশব্দ 'কোন্ কাজে', দ্বিতীয় স্তবকের উপান্তে। প্রথম স্তবকের শেষে প্রশ্নটি অনুচ্চারিত রয়েছে। পরের স্তবকটি এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর বহন করে, এবং সেই সঙ্গে অন্য প্রশ্নটি জাগিয়ে তোলে।

কেন এই তারাপুঞ্জ শূন্যাকাশে মহাকালচক্রপথে যুগের পর যুগ ঘুরছে; এত বেগ, এত তাপ, এত আলো কিসের জন্য? তার উত্তর— কোটি কোটি বৎসরের অসংখ্য ব্যর্থ প্রয়াস, ভুল-ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির পর মানবাত্মাকে জন্ম দেবে ব'লেই এত আয়োজন ছিল। কিন্তু মানুষের ভিতর দিয়েও তো চলার শেষ নেই, তার শারীরিক ও মানসিক উপাদানগুলিও অবিরত 'ধাক্কা

পায়, হয় আবর্তিত, পুঞ্জিত, নর্তিত'। প্রশ্নের উত্তর যে এখনো অসমাপ্ত। মানুষ তার পূর্ববর্তী জান্তব স্তর থেকে সামান্যই উপরে উঠেছে, আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে হবে তাকে, হয়তো দেবতার সঙ্গে একাসনে বসবে সে একদিন। কিন্তু মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণায়ু, তার আত্মার বার্তা শেষ না হতেই, বলতে গেলে শুরু না হতেই, সে জলবিম্বের মতো লুপ্ত হয়ে যায়। তবে কেন এই নক্ষত্রলোক এবং তার ভিতর থেকে মানবাত্মার জন্ম ? এই আর্ত প্রশ্নের 'ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর'।

একটি উত্তর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভালোই জানা আছে, মানুষের ধর্ম-এ তার উল্লেখ রয়েছে। মানুষ অপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে অতি ধীর পদক্ষেপে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে সে জন্তুর যত কাছাকাছি ছিল আজও সেখানেই আছে—একথা সত্য নয়। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পরে দেবত্ব লাভ না করলেও দেবতার আরও কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে ভরসা করা যায়। তবে জীবজগতে বিবর্তন যেমন আপনিই ঘটে মানুষের বিবর্তন তেমন স্বতঃস্ফূর্ত বা অবধারিত নয়; তার জন্য তাকে অজস্র বিঘ্নের মধ্যে অবিরাম তপস্যা করতে হবে হাজার হাজার বছর ধ'রে, তবেই সে কয়েক ধাপ উপরে উঠতে পারবে। যদি শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে বরণ করে তা হলে সে মনুষ্যত্বের প্রকৃত অর্থ থেকে পতিত হবে। মানুষের উন্নতির পথ বিপদ-সংকুল, ক্ষুরধার। কিন্তু এই বিপদের সম্মুখীন না হলে তার আত্মার বার্তা অভিব্যক্ত হবে কী ক'রে ? ইত্যাদি।

এই উত্তর আজ আর রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দিচ্ছে না। মহামানবের হয়তো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই; কিন্তু যে-কোটি কোটি ব্যক্তিমানুষ ইতিহাসের বন্ধুর পথে তাদের আত্মার বার্তা সামান্যতম উদ্বোধিত করতে না করতে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল,

মানবিক অস্তিত্বের কতটুকু মূল্য তাদের কাছে সত্য হ'ল? বিবর্তনের রথ কি তাদের প্রত্যেকের বুকের উপর দিয়ে চ'লে গেল না? এই অসংখ্য, অপূর্ণ, চিরতরে বিভ্রংশ ব্যক্তিস্বরূপের বেদনাই কবিকে ব্যথিত করেছে এ-কবিতায়। যে-উত্তরে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (শুধু ভবিষ্যৎ নয়) প্রত্যেকটি মানবাত্মার সার্থকতার বার্তা শোনা যাবে, এই মহাশূন্যে তেমন উত্তর কোনোদিক থেকে উচ্চারিত হবে না।

প্রথম স্তবকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী পরিপ্রেক্ষিত অকস্মাৎ বদলে যায় দ্বিতীয় স্তবকে। এই পটপরিবর্তনের আকস্মিকতা দেখানো হয়েছে একটি অপ্রত্যাশিত ছোট সরল বাক্যে— 'আপনার পানে চাই'। দ্বিতীয় স্তবকে চলল একটি তুলনা দুই অজানার নিত্য গতির মধ্যে— বহ্নিবাষ্প ঘনীভূত হয়ে তারাপুঞ্জের উদ্ভব ঘটে যেমন, ইতিহাসের বাষ্প-পরিবেশ থেকে 'আমি'-পুঞ্জ তেমনি ঘনিয়ে ওঠে। তার পরে এই 'আমি'র রহস্য নিয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি; জটিল তার তত্ত্ব ধ্বনিগম্ভীর ভাষায় আভাসিত। আর একবার আমরা চম্‌কে উঠি একটি অত্যন্ত আটপৌরে বাক্যে এসে, একটি বিষণ্ণ ক্লান্ত নিরুত্তর প্রশ্নে—'কিছুই জানি না কোন্ কাজে'। দ্রুত উচ্চারিত যুক্তাক্ষরবহুল পঙ্‌ক্তিগুলির পরে এই অন্তরঙ্গ পঙ্‌ক্তিটি দীর্ঘলয়ে খাটো গলায় পড়া দরকার। 'তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত'-এর একটি অব্যয়পদ 'তখনো'-র উপর সমস্ত কবিতার ভার এসে পড়েছে। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞান নাক্ষত্র-জগতের যে অত্যাশ্চর্য আলোকচিত্রটি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছে তা সবই কালো হয়ে যায় যখন ভাবি যে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিলীলার মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা, কোনো ভরসা নেই, এই অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি'কে তার 'মুহূর্তের নিরর্থকতা' থেকে বাঁচাবার।

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলাকার ১৯ সংখ্যক কবিতার গদ্য-ব্যাখ্যায় বলেছিলেন : 'অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্যফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে? এই সৌন্দর্যের এম্‌ফ্যাসিসের মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্বগ্রাসী অ্যাবিস্ নয়।' কিন্তু নবজাতক-এ দেখি পূর্বের ভরসা তাঁর ভেঙে গেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের তো কোনো ক্ষয় হয় নি, অথচ সেই সৌন্দর্যকে আজ আর মানুষের অবশ্যম্ভাবী সার্থকতার গ্যারান্টি মনে করতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। উলটো প্রশ্ন করছেন : মানুষই যদি মুহূর্তের নিরর্থকতায় লুপ্ত হয় তবে নিখিলের এত আলো— 'অসংখ্য তার পরমাণুর বিদ্যুৎ'— কোন্ কাজে লাগবে?

কয়েক বছর আগে লেখা শেষ সপ্তক-এও মানবাত্মার চূড়ান্ত বিনাশ রবীন্দ্রনাথের চোখে অবিশ্বাস্য ঠেকেছে; মনে সন্দেহ উপস্থিত হলেও সে-সন্দেহকে তিনি শক্ত হাতে উন্মূলিত করেছেন এই ব'লে যে সৃষ্টির তলে তলে এত বড় ছেলেমানুষির অস্তিত্ব ভাবাই যায় না।

> এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি—
> এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
> যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
> বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
> পৌঁছল না যা বাণীতে,
> তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার তলে—
> সইবে না সৃষ্টির এ ছেলেমানুষি।

কিন্তু নবজাতক-এর কবি নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইছেন, প্রস্তুত করতে পেরেছেন, সৃষ্টির এই নির্দয় ছেলেমানুষিকে মেনে নেওয়ার জন্য; যা 'সইবে না', তাও যে সইতে হবে। "প্রশ্ন" কবিতাটির প্রশ্নে বেদনা প্রোজ্জ্বল কিন্তু আশার স্ফুলিঙ্গটুকুও

দেখা যাচ্ছে না। যে-নৈরাশ্যের কুয়াশা মানসী থেকে কল্পনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তারই কালিমা আরো গাঢ় আরো নিশ্ছিদ্র হয়েছে অন্তিম পর্বের কাব্যে। তখন তাঁর মনে হয়েছিল: 'এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট / চৌদিকের চির-নীরবতা'। সে রোম্যান্টিক হতাশায় আজ ট্র্যাজিডির সুর লেগেছে, চৌদিকের চির-নীরবতা আরো নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে।

প্রথম পর্বের পরিব্যাপ্ত বিষণ্ণতা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে 'পরানসখা'র অভিসারে বেরিয়ে প'ড়ে। যদিও ঝড়ের রাতে গভীর কোন্ অন্ধকারে আকাশ কেঁদে উঠছিল, বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তবু অন্তরে প্রত্যয় স্থির ছিল, যিনি 'আলোয় আলোকময়' তিনি গহন অরণ্য পার হয়ে আসবেনই, আসছেনই। সে উপশান্ত চিত্তের আলোক-বর্তিকা ঈষৎ কেঁপে উঠেছিল যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বযুদ্ধের পট-ভূমিকায় প্রথম দেখলেন দুঃখের 'অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ'। ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে এ-আলো তাঁর অন্তরের আলো নয়, বাইরে থেকে জ্বালানো হয়েছিল পূজার মন্দিরে।

> শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
> পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
> কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
> তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
> পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
> আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
> কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
>
> (পত্রপুট— "পনেরো")

এই নিভন্ত আলোর দিকে ইঙ্গিত করেই কি ব্রাত্য কবি জীবনের শেষ কবিতায় প্রকৃতিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'মিথ্যা

বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে / সরল জীবনে'? কিন্তু ঐতিহ্যবাহিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের পথ অন্ধকার হয়ে গেলেও নক্ষত্রখচিত আকাশ তাঁকে 'আপন আলোকে ধৌত' অন্তরের যে-পথ দেখাল 'সে যে চিরস্বচ্ছ'।[২] সেই পথ বেয়ে তিনি চ'লে গেলেন আট দিন পর, বাইশে শ্রাবণে।

১ 'কে তুমি' প্রশ্ন অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি কবিতা লিখেছেন—শেষ সপ্তক-এর শেষ কবিতা (৪৬ সংখ্যক)। কবিতাটি খুব রসোত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু 'কে তুমি' প্রশ্নটি যে রবীন্দ্রনাথের মনে বহু দিন থেকে আন্দোলিত ছিল এবং ঠিক কী অর্থ বহন করত তা এখান থেকে বোঝা যাবে।

২ 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে-ধর্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটি অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না-পাই, আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।'—আত্মপরিচয়

———